ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ
আল-গাযালি (র)-এর অমর রচনা

ইহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন

১৫

সবর ও শোকর

ভাষান্তর

মাওলানা মোহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সবর ও শোকর

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজ : ১৫

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ
ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)
(১০৫৮ - ১১১১ খ্রি.)

নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
লেখক ও সম্পাদক, দারুত তাকবীর

ভাষান্তর
মাওলানা শফীকুল ইসলাম
সাবেক শিক্ষাসচিব, কদম রসূলপুর মাহমুদুল উলূম মাদরাসা
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
লেখক ও সম্পাদক, দারুত তাকবীর

দারুত তাকবীর

সবর ও শোকর

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজ : ১৫

ISBN No : 978-984-558-030-4

প্রকাশক
প্রকৌ. মেহেদী হাসান
দারুত তাকবীর
৩০/এ, সাত্তারা সেন্টার (১৪ তলা)
ভি আই পি রোড, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ডক্টর এম. শরীফ উল আলম

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
জিলহজ ১৪৪১ হিজরি
শ্রাবণ ১৪২৭ বাংলা

প্রচ্ছদ ডিজাইন
দারুত তাকবীর ডিজাইন সেকশন

রচনা
ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে
মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)
(১০৫৮-১১১১ খ্রি.)

ভাষান্তর
মাওলানা শফীকুল ইসলাম
শিক্ষাসচিব, কদম রসূলপুর মাহমুদুল উলূম মাদরাসা

নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
লেখক ও সম্পাদক, দারুত তাকবীর

স্বত্ব : সংরক্ষিত

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ২৬০.০০ (দুইশত ষাট টাকা মাত্র)

সতর্কীকরণ

প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের যেকোনো অংশ
পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো সম্পূর্ণ বেআইনি

SOBOR O SHUKOR (Ihyau Ulumiddeen Series-15), Written by Emam Gazali (R), Translated by Mawlana Shofiqul Islam, Published by Eng. Mehedi Hasan. Darut Takbeer, Corporate Office : 30/A Sattara center (14th Floor), V.I.P Road, Naya Paltan, Dhaka-1000, Phone : +8809610666006, 01938-855992,01938-855979, 01991-181204, E-mail : info@daruttakbeer.com, Website : www.daruttakbeer.com, Publishing Date : August 2019, **Price : 260.00** Taka Only.

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানুষকে সর্বোত্তমরূপে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দরূদ ও সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। মানবজাতির মাঝে যিনি আগমন করেছিলেন চিরমুক্তি ও সফলতার বার্তা নিয়ে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর তাঁর আনীত সুমহান দীনকে সমুন্নত রাখতে প্রতি হিজরি শতকেই আল্লাহ তাআলা কিছু ক্ষণজন্মা মনীষী ও সংস্কারককে প্রেরণ করেন।

পঞ্চমশতকে আবির্ভূত এমনই একজন যুগশ্রেষ্ঠ ও ক্ষণজন্মা মনীষী হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল গাযালি (র)। ৪৫০ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দার্শনিক হিসেবে তিনি শুধু যুগশ্রেষ্ঠ নয়; বরং জগৎশ্রেষ্ঠ। মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর কলমের ছোঁয়ায় মুহাম্মদি দীন ও শরিয়ত শুধু নবজীবনই লাভ করেনি, পৃথিবীর তাবৎ মনীষী, জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণকে এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে বাধ্য করেছে। অজস্র মানুষকে বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত করেছে। আর বিশ্বাসীদের মাঝে আস্থার দ্যুতি ছড়িয়েছে।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' নামে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাঁর একটি অমর কীর্তি। বহু শতাব্দী ধরে এটি মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রাণস্পন্দন এবং প্রেরণার স্ফুরণ ঘটিয়ে আসছে।

মূল আরবি গ্রন্থটি চার খণ্ডে রচিত। কিন্তু পাঠকের ক্রয়ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় অংশটি সংগ্রহ ও বহনের সুবিধার্থে আমরা বইটি সিরিজ আকারে প্রকাশ করছি।

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজের পনেরোতম খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা শফীকুল ইসলাম। চলমান সিরিজের এই পনেরোতম খণ্ডটি বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে তুলে দিতে পেরে দারুত তাকবীর আনন্দিত ও গর্বিত। যদিও বাজারে এর অনেকগুলো অনুবাদ রয়েছে। নতুন করে আমরা আবার কেন অনুবাদ করলাম, তা মনোযোগী পাঠক পড়েই বুঝবেন।

এর যা কিছু ভালো, সবই মহান আল্লাহর। আর যা কিছু ভুল তা আমাদের অক্ষমতা। আমরা আমাদের ভুলগুলো উত্তরোত্তর সংশোধন ও পরিমার্জনে বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে সুহৃদ পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী মানুষের দুআ-পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা কাম্য।

গ্রন্থটি পড়ে কোনো পাঠক যদি নিজের প্রয়োজনীয় আত্মসংশোধনে ব্রতী হয় এবং দ্বিধাহীনচিত্তে মহান আল্লাহর ইবাদত ও সাধনায় আত্মমগ্ন হয়, তবেই আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের এই শ্রমটুকু কবুল করে নিন এবং গ্রন্থটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

প্রকাশক

১০.০৮.২০২০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

অনুবাদকের কথা

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' গোটাবিশ্বেই ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় একটি পাঠ্য গ্রন্থ। ধর্মীয় বিভিন্ন কিতাবাদিতেও এর উদ্ধৃত অংশ, উক্তি বিশেষ লক্ষণীয়। আসল কথা হলো, মহান আল্লাহ এ অনবদ্য রচনাটিকে সর্বাংশে মাকবুল ও মাতলুব বানিয়ে দিয়েছেন। ফলে গবেষক থেকে সাধারণ পাঠক সবার জন্যই পর্যাপ্ত খোরাক আছে এতে। রচনার পর থেকেই এ গ্রন্থটি সর্বস্তরের মুসলমানের কাছেই ব্যাপকভাবে বরিত ও চর্চিত হয়ে আসছে। মূলগ্রন্থটি আরবি ভাষায় চার-পাঁচ খণ্ডে বিন্যস্ত। বিশ্বের বহু ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে, আজোবধি হয়ে যাচ্ছে।

আবার প্রয়োজন বিবেচনায়ও প্রকাশকগণ এটিকে কোথাও এক ভলিয়মে, কোথাও দু, চার, পাঁচ ভলিয়মও প্রকাশ করেছে। বাংলা ভাষায় এ যাবৎ প্রকাশিত কিতাবগুলোর কিছু দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। সেই থেকে একটা প্রয়োজন তীব্র আকারে হৃদয়ে লালন করে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ! ধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দারুত তাকবীরের সহযোগিতায় সেই স্বপ্ন পূরণের পথে। দারুত তাকবীর 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন'-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছে। এই বৃহৎ রচনাটিকে পাঠক-পাঠিকার সুবিধার কথা ভেবেই ছোটো ছোটো খণ্ডে সিরিজ আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। বক্ষ্যমাণ বইটি এ সিরিজের পনেরোতম খণ্ড।

এ পর্বে বইটিকে যেভাবে সাজানো হয়েছে—

এ সিরিজে সবর ও শোকর অংশের আলোচনা করা হয়েছে।

একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, ইমাম গাযালি (র) শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাই তিনি বিভিন্ন বিষয় ও মাসয়ালা বর্ণনায় শাফেয়ী মতানুসারেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে যেসব প্রয়োজনীয় মাসয়ালায় হানাফি মাযহাবের সঙ্গে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত, সেসব মাসয়ালায় হানাফি মাযহাবের অনুসরণীয় মতটিকে পাদটীকায় উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও এ অনুবাদটি আরও কিছু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে।

- প্রামাণ্য ও বিখ্যাত গ্রন্থাদি থেকে এর প্রতিটি কথার উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।
- উদ্ধৃত গ্রন্থের শুধু নামই নয়; খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।
- হাদিসের ক্ষেত্রে হাদিস গ্রন্থের নাম এবং হাদিস নং উল্লেখ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
- পাঠককে দ্বিধান্বিত করে তুলতে পারে এমন বক্তব্যগুলোর (পাদটীকায়) সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।
- উর্দু থেকে অনুবাদ না করে সরাসরি আরবি মূল গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

বইটি ছাপার উপযোগী হয়ে উঠার পেছনে যাদের নিরলস প্রচেষ্টার কথা স্বীকার না করলেই নয়, তারা হচ্ছেন দারুত তাকবীরের সম্পাদনা পরিষদের একঝাঁক উদীয়মান তরুণ গবেষক আলেম-লেখক। একইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে কম্পিউটার বিভাগে কর্মরত সহকর্মীবৃন্দের আন্তরিক পরিশ্রম। তাদের সবার প্রতি আমার অজস্র শোকর। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার চেষ্টা ও মেহনতকে ইখলাসের নূরে নূরানি করে ইহ ও পরকালের মহাসম্বল বানিয়ে দিন। আমিন!

বইটি নির্ভুল ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করতে আমাদের চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখিনি। এরপরও ভুল থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। তাই পাঠকসমীপে আমাদের আন্তরিক দাবি, কোনো তত্ত্ব-তথ্য-উপাত্তগত ভুল কারও চোখে পড়লে সংশ্লিষ্ট কাউকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইনশাআল্লাহ!

মহান আল্লাহ এই অনুবাদটিকে মূল বইয়ের মতো মাকবূলিয়্যাত দান করুন, এর কল্যাণময়তাকে আরও ব্যাপক করে দিন। এর লেখক, অনুবাদক-প্রকাশকসহ এর সঙ্গে জড়িতদের সবার জীবনকে সতত সুন্দর-সার্থক করে দিন। আমিন!

মাওলানা শফীকুল ইসলাম

১০.০৮.২০২০

সম্পাদকীয়

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের ঈমানের মতো মহান দৌলত দান করেছেন এবং সত্য সহজ সুন্দর দীনের অনুসারী করেছেন। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় রাসূল এবং রাসূলের পরিবারবর্গ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থটি কুরআন সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের বক্তব্যের আলোকে দীন ইসলামের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে লেখা। চার-পাঁচ খণ্ডে রচিত মূল গ্রন্থে শুধু ইবাদত, মুআমালাত, আখলাক, আদব বিষয়ক আলোচনাই স্থান পায়নি, আধ্যাত্মিক এবং আত্মিক বিষয়াদিও আলোচিত হয়েছে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে। ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো বিশ্লেষণের পাশাপাশি কল্যাণ এবং মুক্তির বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী করে।

এতে শরিয়তের মৌলিক ইবাদতগুলোর সারনির্যাস যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি মনোজগতের বিভিন্ন অবস্থার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যাও প্রবল প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। তাই গ্রন্থটি রচনার পর থেকে বিগত নয়শ বছর যাবৎ বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণির মুসলিমদের নিকট ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লাহর পবিত্র কালাম ও রাসূলের পবিত্র হাদিসের পর আর কোনো গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের নিকট ইমাম গাযালি (র)-এর এই গ্রন্থটির মতো সমাদৃত হয়নি। এ গ্রন্থের বিস্ময়কর গ্রহণযোগ্যতাই এর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে।

দারুত তাকবীর এ মূল্যবান গ্রন্থটি সিরিজ আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সিরিজের পনেরোতম খণ্ড অনুবাদ করেছেন মাওলানা শফীকুল ইসলাম।

আলহামদুলিল্লাহ! গ্রন্থটি আমাদের আগাগোড়া সম্পাদনা এবং নিরীক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে। এতে 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ চলে এসেছে। সেই সাথে প্রতিটি কথার উদ্ধৃতিও তুলে ধরা হয়েছে। এদিক থেকে বইটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। তবে মানবসুলভ ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সে ক্ষেত্রে আমরা পাঠক সাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সৃজনশীল ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশন দারুত তাকবীরকে স্বাগত জানাই প্রকাশনা জগতে যাত্রার সূচনাতে এমন বৃহৎ একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উম্মতের সামনে বিশুদ্ধ ও নান্দনিকরূপে গ্রন্থটি পেশ করার জন্য।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটি থেকে আমাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং এর উসিলায় দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব করুন। আমিন।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
১০.০৮.২০২০

সম্পাদনা পরিষদ

- **মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ**
  শিক্ষাসচিব, মারকাযুল কুরআন বাংলাদেশ, ঢাকা

- **মাওলানা শফীকুল ইসলাম**
  শিক্ষাসচিব, কদম রসূলপুর মাহমুদুল উলূম মাদরাসা, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
  সাবেক সহসম্পাদক, মাসিক মদীনা ও সাপ্তাহিক মুসলিমজাহান

- **মুফতি মাহদী হাসান**
  উস্তায, মাদরাসা কাসেমিয়া, জামতলা, ময়মনসিংহ

- **মুফতি নূরে আলম**
  মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া, মিরপুর-১২, ঢাকা

- **মাওলানা ইয়াসিন বিন ইউসুফ**
  উস্তায, মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম, শ্যামলী, ঢাকা

- **মুফতি কাজী মঈনুল হক**
  উস্তায, মাদরাসাতুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, নবীনবাগ, খিলগাঁও, ঢাকা

উত্তর যাত্রাবাড়ী মারকাযুল উলূম মহিলা মাদরাসার সহকারী পরিচালক,
হাফেজ মাওলানা মুফতি আবূ সাঈদ দা.বা.-এর

দুআ ও বাণী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ-

স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দারুত তাকবীর থেকে 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' সিরিজের পনেরোতম খণ্ড প্রকাশিত হতে চলেছে। 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল গাযালি তুসী (র) (মৃত্যু : ৫০৫ হি:) রচিত জগদ্‌বিখ্যাত অমর এক গ্রন্থ। তাঁর রচিত গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে এটি সর্বাধিক সমাদৃত। পঞ্চম হিজরি শতকে তিনি এটি রচনা করেন। প্রকাশকাল থেকেই সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরাম ও আপামর মুসলিম জনসাধারণ গ্রন্থটি সাদরে গ্রহণ করেছেন। আকীদা, ফিকহ, তাসাওউফ, আখলাক ও তারবিয়াত ইত্যাদির চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে রচিত এ গ্রন্থ। চারটি প্রধান বিষয়কে উপজীব্য করে এর বিন্যাস।

১. ইবাদত সংক্রান্ত বিধিবিধান। ২. জীবনাচার সম্বন্ধীয় বিষয়াদি। ৩. মুহলিকাত তথা ধ্বংসকারী বিষয়াবলি। যেমন, আত্মম্ভরিতা, রিপু ও যবানের বিপদাপদ ইত্যাদি। ৪. মুনজিয়াত তথা মুক্তি প্রদানকারী বিষয়। যেমন, তাওবা, সবর, আল্লাহর ভয় ইত্যাদি। সর্বশেষ মৃত্যু ও পরকাল বিষয়ক আলোচনা দিয়ে কিতাব পরিসমাপ্ত হয়।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থটি সিরিজ আকারে বাংলাভাষী মানুষের জন্য নতুন সংস্করণে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। পনেরোতম খণ্ডের অনূদিত পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি। আলহামদুলিল্লাহ! দারুত তাকবীর সহজ-সাবলীল ভাষায় সুখপাঠ্যরূপে উদ্ধৃতিসহকারে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠক সমাজের সামনে নিয়ে এসেছে। দুআ করি, মহান রাব্বুল আলামীন এ পনেরোতম খণ্ডের অনুবাদক বিশিষ্ট আলেমেদীন, বহু গ্রন্থ প্রণেতা লেখক ও সম্পাদক মাওলানা শফীকুল ইসলামের শ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কবুল করুন। সৃজনশীল ইসলামি প্রকাশনা দারুত তাকবীরের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করুন। জগদ্‌জোড়া এর খ্যাতি ও পরিধি সুপ্রশস্ত করুন। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে উভয় জাহানে কামিয়াব করুন। আমীন। আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বাল আলামীন।

(আবু সাঈদ)

সূচিপত্র

বিষয়.....পৃষ্ঠা

সবর ও শোকর

প্রথম পর্ব : সবর [১৬]

সবরের ফযিলত..... ১৭
সবরের ফযিলত সম্পর্কে মনীষীগণের বাণী..... ২১
সবরের মর্ম ও স্বরূপ..... ২২
সবর ঈমানের অর্ধেক..... ৩২
সবরের বিভিন্ন নাম..... ৩৩
সবরের প্রকারভেদ..... ৩৫
সবরের প্রয়োজনীয়তা..... ৪০
সবর অর্জনের উপায়..... ৫৭
তিন পদ্ধতিতে শয়তানি প্রেরণা দুর্বল করা যায়..... ৫৮
অপরপক্ষে দীনি প্রেরণাকে দু'ভাবে শক্তি জোগানো যায়..... ৫৯

দ্বিতীয় পর্ব : শোকর [৭৩]

প্রথম পরিচ্ছেদ

শোকরের ফযিলত, স্বরূপ, প্রকার এবং বিধান [৭৪]

শোকরের ফযিলত..... ৭৪
শোকরের মর্ম ও পরিচয়..... ৭৯
প্রথম বিষয় : ইলম..... ৮০
দ্বিতীয় বিষয় : ইলম দ্বারা অর্জিত হালত..... ৮২
তৃতীয় বিষয় : নিয়ামতদাতার পরিচয় জানার কারণে যে আনন্দ লাভ হয়, সে অনুযায়ী আমল করা..... ৮৫
আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে শোকর..... ৮৮
আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়ের মাঝে পার্থক্য..... ১০০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
শোকরযোগ্য বস্তু [১২৪]

নিয়ামতের স্বরূপ ও প্রকারভেদ ১২৪
হেদায়েতের স্তর তিনটি ১৪৭
আহার ও খাদ্য আল্লাহ তাআলার বড় নিয়ামত ১৫২
ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ১৫৬
শক্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে
আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ১৫৮
যে সমস্ত মৌলিক নিয়ামতের মাধ্যমে আহার লাভ হয় ১৬৮
মানুষ পর্যন্ত খাদ্য পৌঁছানোর মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ১৭৪
খাবার তৈরিতে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ১৭৫
খাবার প্রস্তুতকারীর মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ১৭৭
ফেরেশতা সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ১৭৯
শোকরে উদাসীনতার কারণ ১৮৮
সবর ও শোকর যেখানে একত্র ১৯৯
প্রতিটি বস্তুতেই আল্লাহ তাআলার নিয়ামত রয়েছে ২০২
দুনিয়াপ্রেমীর উদাহরণ ২০৮
মুসিবত হতে নিয়ামত উত্তম ২১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সবর উত্তম না শোকর? [২২১]

◖] পঞ্চদশ খণ্ড সমাপ্ত [◗

সবর ও শোকর

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ.

যে মানুষের শোকর করে না, সে দায়াময় আল্লাহরও শোকর করে না।

(সুনানে আবু দাউদ : ৪৮১১; জামে তিরমিযী : ১৯৫৪)

সবর ও শোকর

ঈমানের অংশ দুটি— একটি সবর, অন্যটি শোকর। 'আসমাউল হুসনা' তথা আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহের মধ্যে সবর ও শোকর দুটোই রয়েছে। তিনি এদুটি মহৎ গুণে গুণান্বিত। কেননা, তিনি নিজেকে صَبُوْرٌ-সাবূর (পরম ধৈর্যশীল) এবং شَكُوْرٌ-শাকূর (পরম প্রতিদানদাতা) নামে আখ্যা দিয়েছেন। অতএব, এ দুটি বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা যেন ঈমানের দুটি অংশ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা কিংবা আল্লাহ তাআলার দুটি গুণ সম্পর্কে উদাসীন থাকারই নামান্তর।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একমাত্র উপায় হচ্ছে ঈমান। কোন বিষয়ের প্রতি এবং কোন ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনতে হবে, তা জেনে নেওয়া ছাড়া ঈমানের পথে চলা অসম্ভব। যে ব্যক্তি এটা জানার ব্যাপারে উদাসীন থাকবে, সে সবর ও শোকরের সম্যক পরিচয় লাভেও ব্যর্থ হবে। অতএব ঈমানের উভয় অংশের যথাযথ আলোচনা একান্ত জরুরি। তাই আমরা এ পর্বটিকে দুটি পর্বে বিভক্ত করে সবর ও শোকর একত্রে বর্ণনা করেছি। কারণ, উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত গভীর মিল ও যোগসূত্র রয়েছে।

প্রথম পর্ব : সবর

এই পর্ব সাতটি বিশেষ শিরোনামে আলোচনা করা হবে—

১. সবরের ফযিলত

২. সবরের মর্ম ও স্বরূপ

৩. সবর ঈমানের অর্ধেক

৪. সবরের বিভিন্ন নাম

৫. সবরের প্রকারভেদ

৬. সবরের প্রয়োজনীয়তা

৭. সবর অর্জনের উপায়

সবরের ফযিলত

সবরকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা অনেক গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে সত্তরেরও বেশি স্থানে সবরের উল্লেখ করেছেন। তিনি অনেক মর্যাদা ও সওয়াবের কাজকে সবরের ফল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا.

আর আমি তাদের মধ্যে এমন কিছু লোককে নেতা মনোনীত করেছিলাম যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতো। (সূরা সিজদাহ : ২৪)

وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۢ بِمَا صَبَرُوْا.

এবং বনি ইসরাঈল সম্পর্কে আপনার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত কল্যাণ সত্যে পরিণত হলো, তাদের ধৈর্য ধারণ করার কারণেই। (সূরা আরাফ : ১৩৭)

وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অবশ্যই আমি ধৈর্যশীলদের দেব তাদের কার্যাবলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। (সূরা নাহল : ৯৬)

أُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا.

তাদেরকে দুবার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছে। (সূরা ক্বাসাস : ৫৪)

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

ধৈর্যশীলদের অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। (সূরা যুমার : ১০)

আলোচ্য আয়াত থেকে বোঝা গেল, সবর ব্যতীত অন্যান্য নেক কাজের সওয়াব তার পরিমাণ ও হিসাব অনুযায়ী প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে সবরের সওয়াব অগণিত দেওয়া হবে। রোযা অর্ধেক সবর হওয়ার কারণে এটি সবরেরই অন্তর্ভুক্ত। (জামে তিরমিযী : ৩৫৯১; সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৭৪৫)

তাই এক হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اَلصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهٖ.

রোযা হলো আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। (সহিহ বুখারী : ১৯০৪; সহিহ মুসলিম : ১১৫১)

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের সাথে থাকার ওয়াদা করেছেন,

وَاصْبِرُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

তোমরা ধৈর্য ধারণ করো; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা আনফাল : ৪৬)

অন্যত্র তিনি স্বীয় সাহায্যকে সবরের সাথে শর্তযুক্ত করে বলেছেন—

بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰۗىِٕكَةِ مُسَوِّمِيْنَ.

অবশ্যই যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং সাবধান হয়ে চলো, তবে তারা দ্রুত গতিতে তোমাদের উপর হামলা চালালে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। (সূরা আলে ইমরান : ১২৫)

কুরআনে সবরকারীদের জন্য এমন সব নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে, যেগুলো অন্যদের জন্য নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

এরাই ওই সকল মানুষ যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয় এবং তারাই সৎপথে পরিচালিত। (সূরা বাকারা : ১৫৭)

এ আয়াতে সৎপথ, অনুগ্রহ ও দুআ সবরকারীদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা, সবরের ফযিলত সম্পর্কে আরও অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে।

এ সম্পর্কে অনেক হাদিসও বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ.

সবর ঈমানের অর্ধেক। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫ : ৩৪; তারীখে বাগদাদ : ১৩ : ২২৭)

হাদিসে রয়েছে, যেসব বিষয় তোমাদেরকে কম দেওয়া হয়েছে, বিশ্বাস ও দৃঢ় ধৈর্যশক্তি সেগুলোর অন্যতম। যে ব্যক্তি এ দুটি বিষয় থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পেয়ে থাকে, সে তাহাজ্জুদ ও নফল রোযা না করলেও পরোয়া করবে না। তোমরা যদি বর্তমান অবস্থার ওপর সবর করো, তাহলে এটা আমার কাছে এক ব্যক্তি তোমাদের সকলের সমপরিমাণ আমল নিয়ে আসার চেয়ে বেশি প্রিয়। কিন্তু আমার ভয় হয়, আমার পর তোমাদের সামনে দুনিয়ার দ্বার খুলে দেওয়া হবে। তখন তোমরা একে অন্যকে খারাপ মনে করবে। ফলে আকাশের অধিবাসীরা তোমাদেরকে খারাপ মনে করবে। যে ব্যাক্তি এ অবস্থায় সওয়াবের নিয়তে সবর করবে, সে তার সওয়াব পুরোপুরি পাবে। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন,

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ، وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

তোমাদের কাছে যা আছে তা একদিন নিঃশেষ হবেই এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী। অবশ্যই আমি ধৈর্যশীলদের দিব তাদের কার্যাবলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। (সূরা নাহল : ৯৬; কূতুল কুলূব : ১ : ১৯৪)

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স)-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে তিনি বললেন, ঈমান হলো সবর ও দানশীলতা। (মুসনাদে আবূ ইয়া'লা : ১৮৪৫; মুসনাদে আহমদ : ৪ : ৩৮৫)

এক হাদিসে আছে—

اَلصَّبْرُ كَنْزٌ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ.

সবর জান্নাতের অন্যতম ভাণ্ডার। (তাহযীবুল আসরার : ১৯৩)

একবার রাসূলুল্লাহ (স) ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে জবাবে বললেন, ঈমান হচ্ছে সবর করা। (মুসনাদুল ফিরদাউস : ৩৮৪০) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, ঈমানের মধ্যে সবরের অবস্থান শরীরের মধ্যে মাথার মতো। অর্থাৎ, ঈমানের বড় রুকন হচ্ছে সবর।

যেমন রাসূলুল্লাহ (স) হজের পরিচয় হিসেবে 'আরাফা' বলেছেন। (সুনানে আবি দাউদ : ১৯৪৯; জামে তিরমিযী : ৮৮৯; সুনানে নাসায়ী : ৫ : ২৫৬)

অন্য হাদিসে এসেছে, উত্তম আমল সেটাই যা করতে নফসকে বাধ্য করা হয়। (কূতুল কুলূব : ১ : ১৯৫) অর্থাৎ নফস আরাম প্রিয়। ইবাদত-বন্দেগিতে তার অনীহা। এক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করে জোরপূর্বক আমল করা উত্তম বলা হচ্ছে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা দাউদ (আ)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করেন যে, আমার চরিত্রের মাধ্যমে তুমিও তোমার চরিত্র গঠন করো। আমার চরিত্র হচ্ছে, আমি সবুর (পরম ধৈর্যশীল)। (আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া : ৩২৭)

আতা (র) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ (স) আনসারদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি ঈমানদার? সকলেই চুপ হয়ে গেল। ওমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, আমরা ঈমানদার। তিনি বললেন, তোমাদের ঈমানের আলামত কী? আনসারগণ বললেন, আমরা সুখে শোকর করি, কষ্টে বিপদে সবর করি এবং আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকি।

রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, কাবার মালিকের কসম! তোমরা ঈমানদার। (মুজামে আওসাত : ৯৪২৩; কূতুল কুলূব : ১ : ১৯৪)

অন্য এক হাদিসে আছে—

فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ.

অপছন্দনীয় বিষয়ে সবর করার মধ্যে অনেক কল্যাণ রয়েছে। (মুসনাদে আহমদ : ১ : ৩০৭)

হযরত ঈসা (আ) বলেন, অপছন্দনীয় জিনিসের ব্যাপারে সবর করলেই তুমি তোমার পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করতে পারবে। (আয-যুহদ : ২৮৬)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সবর বা ধৈর্য যদি মানুষ হতো, তাহলে সে মহৎ মানুষ হতো। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ২৯০)

সবরের ফযিলত সম্পর্কে মনীষীগণের বাণী

খলিফা ওমর (রা) আবু মূসা আশআরী (রা)-কে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে একথাও উল্লেখ ছিল— সবরকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। মনে রেখো, সবর দু'প্রকার এবং একটি অপরটির চেয়ে উত্তম। বিপদে সবর করা উত্তম তবে তার চেয়ে উত্তম আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ বিষয়ে সবর করা। মনে রাখতে হবে, সবর ঈমানের মূল। কারণ, সর্বোত্তম নেকি হচ্ছে তাকওয়া, যা সবরের মাধ্যমে অর্জিত হয়। (আল-ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন : ৬ : ৯; তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম : ৮৮২৭)

আলী (রা) বলেন, চারটি স্তম্ভের উপর ঈমান নির্মিত— ১. বিশ্বাস, ২. সবর, ৩. জিহাদ ও ৪. ইনসাফ। (শুআবুল ঈমান : ৩৮; কূতুল কুলূব : ১ : ১৯৪)

তিনি আরও বলেন, ঈমানের সাথে সবরের সম্পর্ক শরীরের সাথে মাথার সম্পর্কের মতো। কাজেই মাথা ছাড়া যেমন শরীরের চিন্তা করা যায় না, তেমনি যার সবর নেই, তার ঈমান আছে মনে হয় না। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩১০৭৯; কূতুল কুলূব : ১ : ১৯৪)

আবুদ দারদা (রা) বলেন, উচ্চতর ঈমান হলো, আল্লাহর ফয়সালায় সবর করা এবং তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ১ : ২১৬)

ওমর (রা) বলতেন, ধৈর্যশীলদের বদলা দুটি এবং উপরিটি কতই না চমৎকার। বদলা দুটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দয়া এবং অনুগ্রহ। আর উপরিটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হেদায়েত। ওমর (রা)-এর ইঙ্গিত ছিল নিচের আয়াতটির দিকে।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

এরাই ওই সকল মানুষ যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয় এবং তারাই সৎপথে পরিচালিত। [সূরা বাকারা : ১৫৭] (মুস্তাদরাকে হাকেম : ২ : ২৭০)

হাবীব ইবনে আবু হাবীব (র) যখন নিচের আয়াত পড়তেন তখন কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, 'কী চমৎকার বিষয়! তিনিই ধৈর্য দিয়েছেন, আবার তিনিই এর প্রশংসা করেছেন।' আয়তটি হলো,

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ.

আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। কত উত্তম বান্দা সে! আর সে তো ছিল আমার অভিমুখী। [সূরা ছোয়াদ : ৪৪] (সিরাজুল মুলূক : ১ : ৩৯৭)

এতক্ষণ কুরআন-হাদিসের আলোকে সবরের ফযিলত বর্ণনা করা হলো। এখন যুক্তির নিরিখে সবরের শ্রেষ্ঠত্ব জানতে হলে তার স্বরূপ ও মর্ম জানা খুবই জরুরি। সুতরাং এখন সবরের মর্ম ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সবরের মর্ম ও স্বরূপ

জেনে রাখুন, দীনের একটি মাকাম (অবস্থান) এবং আধ্যাত্ম পথের একটি মনযিলের নাম সবর। দীনের সকল মাকাম তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়— ১. মারেফাত তথা তত্ত্বজ্ঞান, ২. হাল এবং ৩. আমল।

মারেফাত সবকিছুর মূল এবং এ থেকেই হালের উদ্ভব হয়। আর হাল থেকে আমলের বিকাশ ঘটে। সুতরাং মারেফাত যেন গাছ, হাল শাখা-প্রশাখা এবং আমল হলো ফলের মতো। এ বিষয়টি সাধকদের সকল মনযিলেই বিদ্যমান।

ঈমান শব্দটি কখনো মারেফাতের অর্থে আবার কখনো এই বিষয়ত্রয়ের সমষ্টির অর্থে প্রয়োগ করা হয়। এমনিভাবে পূর্ণাঙ্গ সবর তখনই হয়,

যখন প্রথমে মারেফাত অর্জিত হয়, এরপর একটি হাল তৈরি হয়। প্রকৃতপক্ষে এ দুটির নামই সবর। আর আমল হলো ফসল, যা এ দুটি বিষয় থেকে প্রকাশ পায়। ফেরেশতা, মানুষ ও পশুর পারস্পরিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জানা ব্যতীত এটা জানা যায় না। কেননা, সবর মানুষের বৈশিষ্ট্য, যা ফেরেশতা ও পশুর মধ্যে থাকতে পারে না; ফেরেশতাদের মধ্যে পূর্ণতার কারণে এবং পশুর মধ্যে অপূর্ণতার কারণে।

অর্থাৎ, পশুদের ওপর প্রবৃত্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে, তারা প্রবৃত্তিরই গোলাম। তাদের চলাফেরা ও নড়াচড়ার কারণ প্রবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়। তাদের মধ্যে এমন কোনো শক্তি নেই, যা প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হয় এবং তাদেরকে এ থেকে নিবৃত রাখে। প্রবৃত্তির বিপরীত শক্তিকে বলা হবে সবর।

পক্ষান্তরে ফেরেশতা সৃজিত হয়েছে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে নিয়োজিত থাকার এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভে সন্তুষ্ট থাকার জন্য। তাদেরকে ইবাদতের আগ্রহ ও নৈকট্য অর্জনে বাধা দিবে এজন্য তাদের মধ্যে কামনা বাসনা সৃষ্টি করা হয়নি।

পক্ষান্তরে মানুষের অবস্থা হলো, সে শৈশবের শুরুতে পশুর ন্যায় অপূর্ণ সৃষ্টি হয়েছে। তখন খাদ্যচাহিদা ছাড়া অন্য কোনো প্রবৃত্তি তার মধ্যে থাকে না। কিছুদিন পর তার মধ্যে খেলাধুলা ও সাজসজ্জার আগ্রহ জেগে উঠে। এরপর বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। এসব ইচ্ছা তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। তার মধ্যে তখন কোনো সবর থাকে না। কেননা, শিশুর মাঝে তখন পশুর ন্যায় প্রবৃত্তি বিরাজ করে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং পশুর ঊর্ধ্বে তার মর্যাদা রেখেছেন। সেজন্য যখন তার অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে এবং সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন তার জন্য দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। তাদের একজন তাকে হেদায়েতের পথ দেখায় আর অন্যজন এ কাজে তাকে সাহায্য করতে থাকে। এ ফেরেশতাদ্বয়ের সাহায্যে মানুষ পশু থেকে পৃথক পরিচয় লাভ করে। এমনকি এই ফেরেশতাদ্বয়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দুটি বিশেষ গুণের প্রকাশ হয়— ১. আল্লাহ ও রাসূলের মারেফাত এবং ২. ভালোমন্দের পরিণামের জ্ঞান। পশু না আল্লাহ ও রাসূলকে চিনে, না

ভালোমন্দের পরিণামের চিন্তা করতে পারে। বরং তারা শুধু তাই চিন্তা করে, যা কার্যত তাদের প্রবৃত্তির অনুকূলে। এ জন্য পছন্দের খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু তারা খোঁজে না। উপকারী কিন্তু তেতো ঔষধ তারা গ্রহণ তো দূরের কথা এ সম্পর্কে তারা জ্ঞানই রাখে না।

অপরদিকে মানুষ হিদায়াতের নূরের মাধ্যমে জানে যে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করার পরিণাম তার জন্য অকল্যাণকর। কিন্তু শুধু এ হিদায়াতই যথেষ্ট নয়, বরং ক্ষতিকর বস্তু ত্যাগ করার সামর্থ্যও তার থাকতে হবে। কারণ, অনেক ক্ষতিকর বস্তু সম্পর্কে মানুষের জানা আছে, কিন্তু সে সেগুলোকে দূর করতে পারে না। সেজন্য প্রবৃত্তিকে দূরিভূত করার জন্য আল্লাহ তাআলা আরও একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। সে মানুষকে কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে, অদৃশ্য বাহিনীর মাধ্যমে তাকে পথ দেখায় এবং শক্তি ও সমর্থন যোগায়। এ বাহিনীকে প্রবৃত্তির বাহিনীর বিরুদ্ধে সদা লড়াই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ যুদ্ধে কখনো সে পরাস্ত আবার কখনো বিজয়ী হয়। এ বিজয় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্যের পরিমাণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। যে গুণের মাধ্যমে মানুষ পশুর স্তর থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে, আমরা তার নাম রাখব ধর্মীয় প্রেরণা। আর কামনার বাহিনীকে বলব শয়তানি প্রেরণা।

একটু ভেবে দেখুন, আলোচ্য উভয় প্রেরণার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে। কখনো ধর্মীয় প্রেরণা শক্তিশালী হয় এবং কখনো শয়তানি প্রেরণা প্রবল হয়। এ যুদ্ধের ময়দান হচ্ছে মানুষের অন্তর। ধর্মীয় প্রেরণা ফেরেশতাদের কাছ থেকে এবং শয়তানি প্রেরণা আল্লাহর শত্রুদের সাহায্যকারী শয়তানদের কাছ থেকে সাহায্য পায়। এ যুদ্ধে শয়তানি প্রেরণার বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রেরণা অটল ও অনড় থাকাই হচ্ছে সবর। অটল থাকার পর যদি সে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করে এবং কামনার বিরোধিতায় সর্বদা প্রস্তুত থাকে, তাহলে আল্লাহর বাহিনী সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং সে সবরকারীদের তালিকায় স্থান পাবে। কিন্তু যদি দুর্বল হয় এবং কামনার কাছে পরাস্ত হয়ে যায়, তবে সে শয়তানের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

এ বিবরণ থেকে জানা গেল যে, প্রবৃত্তিজনিত ক্রিয়াকর্ম বর্জন করা একটি আমল, যা সবর থেকে উৎপন্ন হয়। দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যের দুশমন প্রবৃত্তি। এ বিষয়ের জ্ঞান হচ্ছে ধর্মীয় প্রেরণায় অটল ও অনড়

থাকার মূল উৎপত্তিস্থল। আর এ জ্ঞানকেই বলা হয় ঈমান। যখন এ জ্ঞান সুদৃঢ় হয়, তখন ধর্মীয় প্রেরণাও শক্তিশালী হয়। ফলে মানুষের কাজকর্ম প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করে। আর ধর্মীয় প্রেরণা ব্যতীত প্রবৃত্তি দমন সম্পূর্ণ হয় না। আল্লাহ তাআলা উপরে বর্ণিত দু'জন ফেরেশতাকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা মানুষের ধর্মীয় প্রেরণা ও শয়তানি প্রেরণার প্রতি দৃষ্টি রাখে। তাদেরকে বলা হয় 'কিরামান কাতিবীন'। প্রত্যেক মানুষের জন্যই এই দুজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। যে ফেরেশতা হিদায়াত করে, সে ডানদিকে এবং যে ফেরেশতা শক্তি যোগায়, সে বামদিকে থাকে।

মানুষ যখন অলস বা অমনোযোগী হয়, তখন যেন সে ডানদিকের ফেরেশতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার সাথে অসদাচরণ করে। তাই এ অসদাচরণকে সে পাপ হিসেবে লিখে নেয়। আর যখন মানুষ চিন্তাভাবনা করে এবং সৎকাজে আগ্রহী হয়, তখন যেন সে ডানদিকের ফেরেশতার সাথে সদাচরণ করে। সেজন্যই এ আগ্রহকে সওয়াব হিসেবে লিখে নেওয়া হয়। এমনিভাবে মানুষ যখন লাগামহীনভাবে গুনাহ করতে থাকে, তখন যেন সে বামদিকের ফেরেশতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার সাহায্য প্রত্যাশা করে না। এ কারণে তার গুনাহ লেখা হয়। আর মানুষ যখন নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে, তখন যেন সে এ ফেরেশতার কাছে সাহায্য কামনা করে। ফলে, সে এ কাজকে লিখে নেয় সওয়াব হিসেবে।

কিরামান কাতিবীন রচিত মানুষের গোপন আমলনামা দু'বার প্রকাশ করা হবে। একবার ছোট কিয়ামতে অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় এবং একবার বড় কিয়ামতে। হাদিসে বলা হয়েছে—

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ.

যে মারা যায়, তার কিয়ামত কায়েম হয়ে যায়। (মুসনাদুল ফিরদাউস : ১১১৭)

এই কিয়ামতে মানুষ একা থাকে এবং তাকে বলা হয়— যেমন কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ.

তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ যেভাবে আমি প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম। (সূরা আনআম : ৯৪)

সেখানে তাকে আরও বলা হবে,

كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৪)

কিন্তু বড় কিয়ামতে মানুষ একা থাকবে না; বরং জনমানুষের সামনে হিসাব নেওয়া হবে। তারপর হিসাব অনুযায়ী সৎলোকেরা জান্নাতে এবং অপরাধীরা দলে দলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

প্রথম ভয়াবহতা হলো ছোটো কিয়ামতের দৃশ্য। আর বড় কিয়ামতের সমস্ত ভয়াবহতার দৃষ্টান্ত ছোটো কিয়ামতের মাঝে পাওয়া যায়। যেমন ভূমিকম্প হওয়ার দৃশ্য বড় কিয়ামতে সংঘটিত হবে। তদ্রূপ ছোটো কিয়ামতে শরীর কেঁপে ওঠে। আর শরীর আত্মার জন্য ভূমির মতো। এটা তো জানা কথা যে, কোনো স্থানে ভূমিকম্প হলে বলা হয় অমুক দেশে ভূমিকম্প হয়েছে। যদিও নির্দিষ্ট কোনো স্থান ছাড়া অন্য কোথাও ভূমিকম্প হয়নি। এমনকি যদি শুধু মানুষের ঘর কেঁপে ওঠে তাহলেও ভূমিকম্প হয়েছে বলা হয়। সুতরাং মৃত্যুর কারণে শরীর যে কেঁপে ওঠে তা সহজেই অনুমেয়।

শরীরকে ভূমির সাথে তুলনা করার কারণ মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট। যাকে যতটুকু মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা তার অংশ। অপরের শরীর তার অংশ নয়। যে ভূমির ওপর আপনি বসে আছেন সেটাও মাটি। সেটার কাঁপুনিতে আপনার শরীর কাঁপে বলেই আপনি ভয়ে থাকেন। নয়তো পৃথিবী তো সবসময়ই নড়ে চলছে, এতে তো আপনার ভয় করে না। কারণ এই কাঁপুনি আপনার শরীর অনুভব করে না। সুতরাং বোঝা গেল, আপনার শরীর হলো ভূমি, হাড় হলো পাহাড়। আপনার মাথা হলো আকাশ। আপনার অন্তর হলো সূর্য। শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তিসহ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো হলো আকাশের নক্ষত্ররাজি। রগ-রেশা হলো নদীনালা। চুল-পশম হলো লতাপাতা। হাত-পা হলো গাছপালা। এভাবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা শরীরের অংশসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মতো। তাহলে মৃত্যুর মাধ্যমে শরীরের অবসান ঘটা হলো ভূমিকম্পের ধাক্কা লাগা। হাড় থেকে গোশত পৃথক হয়ে যাওয়া হলো পৃথিবী এবং

পর্বতমালাকে তুলে নিয়ে এক ঝটকায় গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলা। হাড় ক্ষয় হয়ে যাওয়া হলো পাহাড়সমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া। মৃত্যুর সময় হৃদয় অন্ধকার হয়ে যাওয়া হলো সূর্যকে নিষ্প্রভ করে দেওয়া। শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তিসহ সকল ইন্দ্রিয় অকার্যকর হয়ে যাওয়া হলো নক্ষত্ররাজি খসে খসে পড়া। মস্তিষ্ক ফেটে যাওয়া হলো আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া। মৃত্যুর ভয়াবহতায় কপাল ঘেমে যাওয়া হলো সাগরসমূহকে উদ্বেলিত করে তোলা। এক পায়ের সঙ্গে অন্য পা জড়িয়ে যাওয়া হলো দশ মাসের গর্ভবতী উটনী এবং যাবতীয় অর্থসম্পদ বেকার হয়ে যাওয়া। রূহ দেহ ত্যাগ করা হলো পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করার পর তার ভেতরে যা আছে তা ছুড়ে ফেলে শূন্যগর্ভ হয়ে যাওয়া। (কিয়ামতের বর্ণনা জানতে হলে সূরা মুরসালাত, সূরা তাকবীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক দেখা যেতে পারে।)

যাবতীয় অবস্থা এবং ভয়াবহতার তুলনা করে আলোচনা আর দীর্ঘ করবো না। কেবল এতটুকুই বলব, মৃত্যুর মাধ্যমে আপনার ওপর এই ছোটো কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। বড় কিয়ামতের যেসমস্ত বিষয় আপনি বা অন্য কারও সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলো ছোটো কিয়ামতের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে না। (অর্থাৎ ছোটো কিয়ামত হয়ে গেছে বলে বড় কিয়ামত থেকে রেহাই মিলবে না।) আবার ইন্দ্রিয়— যা কি না নক্ষত্ররাজি— যদি আপনারটি বাতিল হয়ে যায় তাহলে অন্যেরটি দিয়ে আপনার কী উপকার হবে? অন্ধের কাছে তো রাত-দিন সবই বরাবর। সূর্যগ্রহণ হওয়া এবং গ্রহণমুক্ত হওয়ার কোনো পার্থক্য সে করতে পারে না। তার জন্য সূর্যগ্রহণ সবসময় লেগেই আছে। গ্রহণমুক্ত হওয়া তো আরেকজনের বিষয়। যার মাথা কেটে গেছে তার আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেছে। কারণ মাথার দিকের অংশের নাম আকাশ। যার মাথা নেই তার তো আকাশই নেই। আরেকজনের আকাশ তার কী উপকার করবে?

এমনটা হলো ছোটো কিয়ামতের অবস্থা। আসল ভয় আর ভীতিকর অবস্থা তখনই হবে যখন বড় কিয়ামত সংঘটিত হবে। কারও কোনো বিশেষত্ব থাকবে না। আসমান জমিন ধ্বংস হয়ে যাবে। পাহাড়গুলো সব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। ভীতিকর অবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

এই ছোটো কিয়ামত সম্পর্কে বিশদ লিখলেও তার এক দশমাংশও লেখা হবে না। বড় কিয়ামতের সামনে এর অবস্থান বড় জন্মের সামনে ছোটো জন্মের মতো। বস্তুত মানুষের দুবার জন্ম হয়ে থাকে। প্রথমটি হলো পৃষ্ঠদেশ এবং পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে নির্গত হয়ে গর্ভাশয়ে অবস্থান করা। গর্ভাশয়ে সে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকে। এখানে বিভিন্ন পর্যায়ে তার মধ্যে পরিবর্তন হয়। শুক্রকীট থেকে জমাটবাধা রক্তপিণ্ড, সেখান থেকে গোশতের টুকরো প্রভৃতি। এভাবে সে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছে। একসময় সে গর্ভাশয় থেকে এই বিশাল দুনিয়ায় আগমন করে। বড় কিয়ামতের সামনে ছোটো কিয়ামতের অবস্থা এই বিশাল দুনিয়ার সামনে মায়ের গর্ভাশয়ের অবস্থার মতো। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ যে জগতে উপনীত হয় তা গর্ভাশয়ের অবস্থার মতো। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ যে জগতে উপনীত হয় তা গর্ভাশয়ের তুলনায় বিস্তৃত এই দুনিয়া থেকেও অনেক অনেক গুণ বড়। এখন দুনিয়ার সাথে আখেরাতকে তুলনা করে দেখুন। কুরআনে এসেছে,

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ.

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। (সূরা লুকমান : ২৮)

দ্বিতীয়বার পুনরুত্থিত করা হবে প্রথমবার সৃষ্টির ওপর ভিত্তি করে। আর পুনরুত্থান কেবল দুবার হবে এমন নয়। আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী এদিকেই ইঙ্গিত করে,

وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَالَا تَعْلَمُوْنَ.

তোমাদের এমন রূপ দান করব, যা তোমরা জানো না। (সূরা ওয়াকিয়া : ৬১)

সুতরাং যে ব্যক্তি ছোটো বড় উভয় প্রকার কিয়ামত স্বীকার করে সে দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর যে শুধু ছোটো কিয়ামত তথা মৃত্যুকে বিশ্বাস করে সে এমন অন্ধ ব্যক্তির মতো যে এক চোখে উভয়জগৎকে দেখে। এটা নিশ্চিতভাবেই মূর্খতা, ভ্রান্তি এবং কানা দাজ্জালের অনুসরণ। এতো কঠিন ভয়াবহতা সামনে নিয়ে এই উদাসীনতা কতই না গুরুতর। তাদের লক্ষ্য করে বলছি,

আপনারা যদি মূর্খতা ও ভ্রান্তির কারণে বড় কিয়ামতে বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনারা বড়ই হতভাগা। ছোটো কিয়ামতই তো ইঙ্গিত করে যে, বড় কিয়ামত আছে।

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) কী বলেছেন তা কি শুনেননি? তিনি বলেছেন, كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا উপদেশদাতা হিসেবে মৃত্যুই যথেষ্ট। (মুসনাদুশ শিহাব : ১৪১০; শুআবুল ঈমান : ১০০৭২)

মৃত্যুযন্ত্রণা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য কি আপনাদের কানে পৌছায়নি? এমনকি তিনি এ-ও বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ.

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদের মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ করে দিন। (জামে তিরমিযী : ৯৭৮; সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৬২৩)

আপনার কি লজ্জা হয় না যে, মৃত্যু বিলম্বিত হওয়ার সুযোগে গাফলত আপনাদের পেয়ে বসেছে। আর গাফেলরা তো ভ্রান্তদের অনুসরণ করে। যাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ. فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّ لَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ.

তারা কেবল অপেক্ষায় আছে এক ভয়াবহ শব্দের, যা তাদের আঘাত করবে তাদের তর্কবিতর্কের সময়। তখন তারা শেষ অসিয়তটুকু করতে সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতেও পারবে না। (সূরা ইয়াসীন : ৪৯-৫০)

অসুখ-বিসুখ তাদের সতর্ক করে কিন্তু তারা সতর্ক হয় না। বার্ধক্য তাদের শিক্ষা দেয় কিন্তু তারা শিক্ষা নেয় না। আপনাদের দৃষ্টান্ত তো ওই লোকদের মতো হয়ে গেল যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ.

পরিতাপ বান্দাদের জন্য, তাদের কাছে যে রাসূলই এসেছেন তারা তার সাথে বিদ্রূপ করেছে। (সূরা ইয়াসীন : ৩০)

তারা কি ধারণা করেছে দুনিয়াতে তারা অমর হয়ে থাকবে?! এই আয়াত কি আপনারা পড়েননি?

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ.

তারা কি প্রত্যক্ষ করে না, তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠী আমি ধ্বংস করেছি, যারা তাদের মাঝে আর ফিরে আসবে না? (সূরা ইয়াসীন : ৩১)

নাকি ধারণা করেছে যে, যারা মারা গেছে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কখনোই নয়। কুরআন বলছে,

وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ.

এবং অবশ্যই তাদের সবাইকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। (সূরা ইয়াসীন : ৩২)

এই লোকেরা তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আয়াতই আসে তার থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। এর কারণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ جَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ. وَ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

আমি তাদের সামনে এক অন্তরাল ও পেছনে এক অন্তরাল দাঁড় করিয়েছি এবং তাদের (দৃষ্টি) ঢেকে দিয়েছি; ফলে তারা (কোনো কিছু) দেখতে পায় না। আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না। (সূরা ইয়াসীন : ৯-১০)

যাইহোক, আমরা মূলকথায় ফিরে আসি। এতক্ষণ যা আলোচনা হলো তার উদ্দেশ্য হলো এমন কিছু বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা যেগুলোর অবস্থান পার্থিব জ্ঞানের বহু ঊর্ধ্বে।

এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সবর হলো শয়তানি প্রেরণার বিরুদ্ধে দীনি প্রেরণার সংঘর্ষের নাম। এই সংঘর্ষ কেবল মানবজাতির বৈশিষ্ট্য। কেননা, কিরামান কাতিবীন তথা সম্মানিত লেখকদ্বয়কে মানুষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে তারা দুজন পাগল এবং শিশুদের ব্যাপারে লেখা থেকে বিরত থাকেন। কারণ আমরা উল্লেখ করেছি, ভালো কাজে আগ্রহী হলে

নেক কাজ এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে মন্দ কাজ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আর বাচ্চা ও পাগলের তো আগ্রহী হওয়ার যোগ্যতাই নেই। তাই তাদের থেকে আগ্রহ এবং উপেক্ষা কল্পনাই করা যায় না। আর কিরামান কাতিবীন কেবল তাদের আগ্রহ এবং উপেক্ষাই লিখে থাকেন যারা এসব করতে পারে। তবে কখনো কখনো হিদায়াতের নূরের সূচনা ভালোমন্দের পার্থক্যের বয়স থেকেই শুরু হয় এবং সাবালক হওয়ার বয়সে পৌঁছতে পৌঁছতে ক্রমান্বয়ে তা পূর্ণ হয়ে যায়। যেমন সূর্যের রশ্মি ভোরবেলা কম থাকে। সময়ের সাথে সাথে সূর্য পূর্ণরূপে উদিত হয় এবং তার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু এই হিদায়াত অপূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে। এর নির্দেশনা মোতাবেক আমল না করলে দুনিয়াতে শাস্তি হলেও আখেরাতে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয় না। এজন্যই নামায ছেড়ে দেওয়ার কারণে নাবালককে শাস্তি দেওয়া হলেও আখেরাতে তার আযাব হবে না। আর না তার আমলনামায় নামায তরকের গুনাহ লেখা হবে। সুতরাং স্নেহশীল অভিভাবক ও দয়ালু মুরুব্বি যদি কিরামান কাতিবীনের মতো নেককার হয়ে থাকেন তবে তার কর্তব্য হলো শিশুর মনে নেককাজ ও মন্দকাজের আকৃতি অঙ্কন করে দেওয়া। তার সামনে এগুলোর পরিচয় তুলে ধরা। তারপর (প্রয়োজন বোধে) তাকে শাসন করা। অভিভাবকের চরিত্র এমন হলে তবেই শিশুটি (ভবিষ্যত জীবনেও) ফেরেশতাসুলভ স্বভাবের অধিকারী হবে। ফলে সে ফেরেশতাদের মতো আল্লাহ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে। আখেরাতে তার নিবাস হবে নবীগণ, নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ এবং সিদ্দীকগণের সাথে। এমন অভিভাবক সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় পবিত্র দুটি আঙুলের দিকে ইশারা করে বলে গেছেন,

أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيْمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ.

আমি ও এতিমের অভিভাবক জান্নাতে এভাবে থাকবো। (সহিহ বুখারী : ৫৩০৪; জামে তিরমিযী : ১৯১৮)

সবর ঈমানের অর্ধেক

ঈমান দ্বারা কখনো দীনের মৌলিক বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা বোঝানো হয়। আবার কখনো দীনের মূলনীতি থেকে আহরিত নেক কাজও বোঝায়। আবার কখনো কখনো উভয়টিই বোঝায়।

জানার অনেক স্তর আছে। আমলেরও অনেক স্তর রয়েছে। সবগুলোর নাম ঈমান। এজন্যই সব মিলিয়ে ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে। আকাইদের আলোচনায় এ ব্যাপারে সবিস্তারে কথা হয়েছে। দুটি দিক বিবেচনায় সবর ঈমানের অর্ধেক বলে বিবেচিত।

১. ঈমানকে বিশ্বাস এবং আমল উভয়ের সমন্বিত রূপ বলে গ্রহণ করা। এমতাবস্থায় ঈমানের রোকন হবে দুটি। ইয়াকিন এবং সবর। ইয়াকিন দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার হেদায়েতের মাধ্যমে বান্দার দীনের বুনিয়াদি বিষয়াদির সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা। আর সবর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইয়াকিনের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা। কেননা, ইয়াকিনের মাধ্যমেই মানুষ জানতে পারে, অবাধ্যতা ক্ষতিকর, আনুগত্য উপকারী। আর গুনাহ বর্জন এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য সবর ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে সবর ঈমানের অর্ধেক।

এজন্যই নবী কারীম (স) উভয়কে সমন্বয় করে বলেছেন,

مِنْ اَقَلِّ مَا اُوْتِيْتُمْ اَلْيَقِيْنُ وَعَزِيْمَةُ الصَّبْرِ.

যেসব বিষয় তোমাদের কম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস এবং দৃঢ় ধৈর্যশক্তি অন্যতম। (কূতুল কুলূব : ১ : ১৯৪)

২. ঈমানকে কেবল আমলের ফলাফল হিসেবে ধর্তব্য করা হবে। তখন মানুষ যা কিছু করে সেগুলোকে উপকারী এবং ক্ষতিকর এই দুইভাবে বিভক্ত করা হবে। ফলে ক্ষতিকর বিষয়গুলো সবরের সাথে আর উপকারী বিষয়গুলো শোকরের সাথে সম্পৃক্ত হবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, ঈমানের দুটি অংশ, অর্ধেক সবর আর অর্ধেক শোকর।' (মুজামে কাবীর : ৯ : ১০৪)

মোটকথা, সবর হলো প্রবৃত্তির চাহিদার বিপরীতে দীনের প্রেরণায় অবিচল থাকার নাম। প্রবৃত্তির চাহিদা আবার দুধরনের। এক প্রকারের উৎপত্তি ঘটে

কামনা হতে। আরেক প্রকারের উৎপত্তিস্থল ক্রোধ। সুস্বাদু বস্তুর চাহিদা থেকে কামনা আর কষ্ট থেকে পলায়নের জন্য ক্রোধের উদ্রেক হয়। রোযা হলো কামনা থেকে সবর করা। তা কেবল পেট এবং যৌনাঙ্গের কামনা নিবারণ করে। এ বিবেচনায় নবী কারীম (স) বলেছেন,

اَلصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ.

রোযা হলো সবরের অর্ধেক। (জামে তিরমিযী : ৩৫৯১; সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৭৪৫)

কারণ, পূর্ণাঙ্গ সবর হলো কামনা এবং ক্রোধ উভয়ের উদ্রেককারী থেকে সবর করা। এ বিবেচনায় রোযা ঈমানের এক চতুর্থাংশ।

শরিয়ত কিছু আমলের সীমা নির্ধারণ করে সেগুলোকে ঈমানের অর্ধাংশ বা এক চতুর্থাংশ আখ্যা দিয়েছে। এটা বুঝতে প্রয়োজন পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো ঈমানের অধ্যায়ের আধিক্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। কারণ, ঈমান কেবল এক অর্থের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বহু অর্থের জন্য এর ব্যবহার আছে।

সবরের বিভিন্ন নাম

সবর দু'প্রকার— ১. দৈহিক সবর; যেমন— শারীরিক কষ্ট সহ্য করা এবং তাতে অটল থাকা। ২. মানসিক সবর; যেমন মনকে খারাপ প্রবণতা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখা। প্রথম প্রকার সবর আবার দু'ধরনের। প্রথম যেমন— নিজে কোনো কঠিন কাজ কিংবা ইবাদত ইত্যাদি পালন করা এবং দ্বিতীয়, যেমন অপরের কঠিন প্রহার, ভীষণ অসুখ কিংবা মারাত্মক আঘাত সহ্য করা। শরিয়তসম্মত উপায়ে হলে এ ধরনের সবর উত্তম।

সবর যদি উৎকৃষ্ট খাবার গ্রহণ ও যৌনাঙ্গের কামনার ক্ষেত্রে হয়, তাহলে এর নাম হয় 'ইফ্ফাত' (সংযম)।

যদি কোনো বিপদাপদে এ সবর করা হয়, তাহলে একে সবরই বলা হয় এবং এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় হা-হুতাশ করা।

প্রাচুর্যের তাড়না সহ্য করার ক্ষেত্রে যদি এ সবর করা হয়, তাহলে একে বলা হয়, 'যবতে নফস' (আত্মনিয়ন্ত্রণ)। এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় অহমিকা।

যদি যুদ্ধক্ষেত্রে সবর করা হয়, তাহলে একে বলা হয় সাহসিকতা। এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় ভীরুতা।

যদি ক্রোধ সংবরণ করার ব্যাপারে সবর করা হয়, তাহলে এর নাম সহনশীলতা, যার বিপরীত হচ্ছে ক্রোধোন্মত্ততা।

যদি জাগতিক অসহনীয় পদে সবর করা হয়, তাহলে এর নাম অসম সাহসিকতা এবং এর বিপরীত হচ্ছে অস্থিরতা, সংকীর্ণতা ও দুর্বল সাহসিকতা।

প্রয়োজনাতিরিক্ত জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে সবর করা হলে তার নাম সংসার বিমুখতা। এর বিপরীত সংসারাসক্তি।

যদি সাধারণ জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে সবর করা হয়, তাকে বলে অল্পেতুষ্টি। এর বিপরীত হলো লোভলালসা।

মূলত ঈমানের বেশিরভাগ গুণাবলিই সবরের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, ঈমান হচ্ছে সবর। (মুসনাদে আবু ইয়ালা : ১৭৫৪; মাকারিমুল আখলাক : ৩১) এরকম বলার কারণ এই যে, ঈমানের কর্মসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সম্মানিত কর্ম হচ্ছে সবর। আল্লাহ তাআলা সবরের প্রকারসমূহকে একত্রে উল্লেখ করে সবগুলোর নাম দিয়েছেন সবর। ইরশাদ হয়েছে—

وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

যারা অর্থসংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করল, এরাই ওই সকল ব্যক্তি যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকি। (সূরা বাকারা : ১৭৭)

মোটকথা, অবস্থার পরিবর্তনের কারণে সবরের নাম বিভিন্ন হয়। শব্দার্থ বোঝার যোগ্যতা যাদের আছে তারা মনে করবে, শব্দের পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। অর্থাৎ, অবস্থার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে সবরের যে ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে এটার দাবি ও চাহিদা এটাই যে, প্রতিটির সত্তা এবং অবস্থা ভিন্ন হবে। পক্ষান্তরে যিনি সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত নূরের মাধ্যমে দেখেন তার দৃষ্টি প্রথমেই পড়বে অর্থের ওপর। তখন অর্থের বাস্তব অবস্থা তিনি উদ্‌ঘাটন করবেন। তারপর শব্দ

নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন। কারণ, অর্থ বোঝানোর জন্য শব্দটিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থই হলো মূল আর শব্দ হলো তার অনুগামী। মূলকে যে অনুগামী আর অনুগামীকে যে মূল ভাববে তার পদস্খলন অনিবার্য। এই দুদলের দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সঠিক পথে চলে, না কি ওই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে? (সূরা মুলক : ২২)

চিন্তা করলে দেখা যাবে, কাফেররা সর্বপ্রথম এ ধরনের ভ্রান্তিতেই নিপতিত হয়েছিল। আল্লাহর কাছে আমরা তার দয়া ও মহানুভবতার ওসিলায় উত্তম তাওফিক কামনা করি।

সবরের প্রকারভেদ

শয়তানি প্রেরণার সাথে সংঘর্ষের দিক দিয়ে ধর্মীয় প্রেরণার তিনটি অবস্থা হয়ে থাকে।

১. শয়তানি প্রেরণাকে এমনভাবে পরাস্ত করে দেওয়া যাতে তার মধ্যে মোকাবেলা করার কোনো ক্ষমতা অবশিষ্ট না থাকে। সার্বক্ষণিক সবর করার ফলে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থার ক্ষেত্রেই বলা হয়ে থাকে مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ অর্থাৎ যে সবর করে, সে সফলকাম হয়। খুব কমসংখ্যক লোকই এ অবস্থায় পৌঁছতে পারে। যারা পৌঁছতে পারেন, তারাই সিদ্দীক ও আল্লাহর নৈকট্যশীল। তাঁরা দীনের ওপরই সর্বদা প্রতিষ্ঠিত এবং উজ্জীবিত থাকেন।

তাঁদের সম্পর্কে কুরআনে এসেছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا.

নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ', অতঃপর অবিচল থাকে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩০)

তাদের অন্তর দীনি প্রেরণায় প্রশান্ত থাকে। মৃত্যুর সময় তাদের ডেকে বলা হবে,

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.

হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে আসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। (সূরা ফাজর : ২৭-২৮)

২. শয়তানি প্রেরণা বিজয়ী হওয়া এবং ধর্মীয় প্রেরণার মধ্যে মোকাবেলা করার ক্ষমতা বাকি না থাকা। এ অবস্থায়ই মানুষ শয়তানি প্ররোচনার শিকার হয়ে সবরকম চেষ্টা-মুজাহাদা থেকে বিরত থাকে এবং গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এমন লোকদের সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। এরাই প্রবৃত্তির পূজারি। এদের প্রতিই নিম্নোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে—

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হেদায়াত দিতে পারতাম। কিন্তু আমার এ কথা স্থিরীকৃত যে, আমি নিশ্চয় জিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা সাজদাহ : ১৩)

এ ধরনের লোকেরাই তো আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বেছে নেয় এবং চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেউ তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে চাইলে তাকে আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ করা হয়,

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ.

অতএব যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ আপনি তাকে উপেক্ষা করে চলুন; সে তো শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্ত। (সূরা নাজম : ২৯-৩০)

এ অবস্থার পরিচয় হচ্ছে নিরাশ হওয়া এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গর্বিত থাকা। আর এটাই চরম মূর্খতা। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন—

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ.

অর্থাৎ, বিজ্ঞ তো সে ব্যক্তি, যে নিজেকে সংযত রাখে এবং মৃত্যুপরবর্তী অবস্থার জন্য আমল করে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি, যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে আশা করে। (জামে তিরমিযী : ২৪৫৯; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২৬০)

এমন অবস্থায় উপনীত ব্যক্তিকে কেউ উপদেশ দিলে সে বলে, আমি তওবা করার খুব ইচ্ছা রাখি; কিন্তু তা হয়ে উঠে না। তাই এর আশাও রাখি না। আর তাওবার প্রতি আগ্রহ না থাকলে বলে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। সুতরাং আমার তাওবার প্রয়োজন নেই।

এমন ব্যক্তি মূলত প্রবৃত্তির দাসে রূপান্তরিত হয়। প্রবৃত্তি তাকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে। ফলে তার বিবেকবুদ্ধি প্রবৃত্তির হাতে বন্দি হয়ে যায়। তার অবস্থা হয় কাফেরদের হাতে বন্দি মুসলমানদের মতো। কাফেররা মুসলমানদের উপহাস করে শূকর পালন ও মদ সরবরাহের দায়িত্ব দেয়। আল্লাহ তাআলার কাছে তার অবস্থান হয় এমন ব্যক্তির মতো যে কোনো মুসলমানকে নির্যাতন করে। তারপর তাকে বন্দি করে কাফেরের হাতে সমর্পণ করে। কেননা তার অপরাধের ঘৃণ্যতার কারণ হলো, মুসলমানকে সে এমন কাজে লাগিয়েছে যে কাজে লাগানো উচিত হয়নি। মুসলমানদের অধিকার হলো বিজয়ী হওয়া। কারণ সে আল্লাহ তাআলাকে চিনে এবং তার মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় প্রেরণা। আর কাফেরের প্রাপ্য হলো পরাজয়। কারণ তার মধ্যে শয়তানি প্রেরণা রয়েছে এবং সে দীন সম্পর্কে অজ্ঞ। আর মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের হক অন্যদের তুলনায় অধিক আবশ্যক। সুতরাং আল্লাহ তাআলার দলভুক্ত এবং ফেরেশতা বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এমন কাউকে শয়তানের দলভুক্ত করে আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া কাফেরের হাতে মুসলমানকে তুলে দেওয়ার মতো। বরং তা এমন যেন দয়ার্দ্র এবং অনুগ্রহশীল বাদশার প্রিয় সন্তানকে বন্দি করে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া। ভেবে দেখুন, এমন ব্যক্তি কী পরিমাণ কৃতঘ্ন। এমন লোকের শাস্তি কেমন ভয়াবহ হতে পারে একটু চিন্তা করে দেখুন। পৃথিবীতে সর্বাধিক নিকৃষ্ট উপাস্য হলো প্রবৃত্তি। আর আকল বা বিচার-বিবেচনাবোধ পৃথিবীতে সবচে মূল্যবান সৃষ্টি। (সুতরাং এমন অমূল্য সৃষ্টিকে নিকৃষ্টতম বস্তুর তরে বিকিয়ে দেওয়া কেমন বোকামি তা সহজেই অনুমেয়।)

৩. তৃতীয় অবস্থা হলো, উভয় বাহিনীর মোকাবেলা সমান সমান হওয়া। কখনো ধর্মীয় প্রেরণা বিজয়ী হবে আবার কখনো শয়তানি প্রেরণা। এমন ব্যক্তি জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত। বিজয়ীদের মধ্যে গণ্য নয়। তার অবস্থা নিম্নোক্ত আয়াতে বিবৃত হয়েছে—

خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا.

তারা একটি সৎকাজের সাথে অন্য একটি অসৎ কাজকে মিশ্রিত করেছে। (সূরা তাওবা : ১০২)

এই তিন অবস্থা শক্তি এবং দুর্বলতার বিবেচনায়। যার ওপর সবর করা হয় তাতে মানুষের তিন অবস্থা হতে পারে। সব প্রবৃত্তি হয় জয়ী হবে অথবা পরাস্ত হবে। কিংবা কিছু প্রবৃত্তি জয়ী আর কিছু পরাস্ত হবে। উপর্যুক্ত আয়াতটি তৃতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

আর প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তার চেয়েও অধম। কেননা, চতুষ্পদ জন্তুর জন্য মারেফাত ও শক্তি সৃষ্টি করা হয়নি, যা দিয়ে তারা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে। কিন্তু মানুষকে ক্ষমতা দান করা হয়েছে, অথচ সে তা কাজে লাগায় না।

এমন ব্যক্তি অপূর্ণাঙ্গ এবং পাপী। কারণ, তারা শক্তি থাকা সত্ত্বেও পূর্ণতা অর্জন করে না। কবি বলেছেন,

لَمْ اَرَ فِيْ عُيُوْبِ النَّاسِ عَيْبًا • كَنَقْصِ الْقَادِرِيْنَ عَلَى التَّمَامِ.

আমি লোকদের অনেক দোষই দেখেছি। কিন্তু পূর্ণতায় সক্ষম থাকা অবস্থায় অপূর্ণতার মতো দোষ আমি আর দেখিনি।

সহজ ও কঠিন হওয়ার ক্ষেত্রেও সবর দু'রকম। ১. এমন সবর, যা সহজ নয়, কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত তা টিকে থাকে না। এর নাম কষ্টসাধ্য সবর। ২. যা পরিশ্রম ছাড়াই অর্জন হয়। মানুষ যখন সর্বদা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং শুভ পরিণামে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তখন সবর সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰى. وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى.

সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকি হলে এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ। (সূরা লাইল : ৫-৭)

এই প্রকারের উদাহরণ হলো, কুস্তিগীর তার চেয়ে কোনো দুর্বল ব্যক্তিকে কষ্ট-পরিশ্রম ছাড়াই হারিয়ে দিতে পারে। পক্ষান্তরে উক্ত ব্যক্তি যদি শক্তিশালী হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অত্যন্ত কষ্ট-পরিশ্রম করতে হয়।

এমনিভাবে দীনি প্রেরণাও শয়তানি প্রেরণার মাঝে মল্লযুদ্ধ সংঘটিত হয়। অর্থাৎ, ফেরেশতা বাহিনী ও শয়তান বাহিনীর মাঝে। কখনো প্রবৃত্তি পরাস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং দীনি প্রেরণা বিজয়ী হয়।

দীর্ঘদিন অভ্যাসের ফলে সবর সহজ হয়ে যায়, তখন 'রেজা' অর্থাৎ সন্তুষ্টির মাকাম অর্জিত হয়। রেজার মর্তবা সবরের ঊর্ধ্বে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اُعْبُدُوا اللهَ عَلَى الرِّضَاءِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَفِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ.

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো সন্তুষ্টির মাধ্যমে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে অপ্রিয় বিষয়ে সবর করার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (মুসনাদে আহমদ : ১ : ৩০৭)

এক বুযুর্গ বলেন, সবরকারীদের তিনটি স্তর রয়েছে। ১. প্রবৃত্তি বর্জন করা। এটা তাওবাকারীদের স্তর। ২. তাকদিরে সন্তুষ্ট থাকা। এটা দুনিয়াত্যাগীদের স্তর। ৩. বান্দা আল্লাহ কর্তৃক সকল বিষয় পছন্দ ও মহব্বত করা। এটা সিদ্দিকীনের স্তর। (কূতুল কুলূব : ১ : ১৯৯)

বলার অপেক্ষা রাখে না, মুহাব্বাতের স্তর রেজার স্তরেরও ঊর্ধ্বে। যেমনিভাবে রেজার স্তর সবরের স্তরের ঊর্ধ্বে। এসব স্তর বিশেষ এক প্রকার সবরে সম্ভব আর তা হচ্ছে বালা-মুসিবতে সবর করা।

প্রসঙ্গত, বিধানগত দিক থেকে সবর কয়েক প্রকার। যথা- ফরয, নফল বা মুস্তাহাব, মাকরূহ এবং হারাম। শরীয়তে হারাম কর্মসমূহে সবর করা ফরয। মাকরূহ বিষয়াদিতে সবর করা মুস্তাহাব। শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন কষ্টে সবর করা হারাম। যেমন, কোনো ব্যক্তির নিজের হাত কিংবা তার সন্তানের হাত কাটা হচ্ছে, এমতাবস্থায় সে নীরব থাকে এবং সবর করে।

এমন সবর করা একেবারে হারাম। যে পীড়ন শরীয়তে মাকরূহ— হারাম নয়, তাতে সবর করা মাকরূহ। মোটকথা, সবরের পরিমাপ জানা উচিত। সবর ঈমানের অর্ধেক কেবল একথা জেনে মনে করা উচিত নয় যে, সকল সবরই উত্তম।

সবরের প্রয়োজনীয়তা

পার্থিব জীবনে মানুষ যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলো হয় তার ইচ্ছার অনুকূলে, না হয় প্রতিকূলে হয়ে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থাতে সবরের প্রয়োজন রয়েছে। যেসব অবস্থা মানুষের প্রবৃত্তির অনুকূল হয়ে থাকে, সেগুলো হচ্ছে, সুস্থতা, নিরাপত্তা, ধনসম্পদ, প্রভাব-খ্যাতি, জনবল, ধনবল, অধিকসংখ্যক চাকরবাকর; অনুসারী ও জীবন উপভোগের যাবতীয় সামগ্রী বিদ্যমান থাকা। এ সকল অবস্থায় সবর করার প্রয়োজন খুব বেশি। কারণ, মানুষ যদি দুনিয়াবী আনন্দ-উল্লাসে মেতে নিজেকে সংযত না করে এবং এগুলোতে ডুবে থাকে, তাহলে সে আনন্দ-উল্লাস বৈধ হলেও অবশেষে তা নাফরমানি ও অবাধ্যতার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। আর মানুষ যখন অমুখাপেক্ষী হয় তখন অবাধ্য আচরণ করে।

কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى. اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى.

বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে। কারণ, সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে। (সূরা আলাক : ৬-৭)

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, বিপদাপদে ঈমানদার সবর করে। কিন্তু সচ্ছলতায় সবর করা শুধু সিদ্দীকের কাজ। (কূতুল কুলূব : ১ : ১৯৭)

সাহল তস্তরী (র) বলেন, বিপদাপদে সবর করা অপেক্ষা সচ্ছলতায় সবর করা খুবই কঠিন। (কূতুল কুলূব : ১ : ১৯৭)

যখন দুনিয়ার অর্থসম্পদ সাহাবায়ে কেরামের হাতে আসতে থাকে, তখন তারা বললেন, বিপদাপদ ও দারিদ্র্যে আমাদের পরীক্ষা নেওয়া হলে আমরা সবর করলাম। কিন্তু যখন সচ্ছলতা ও নিরাপত্তায় পরীক্ষা নেওয়া হলো, তখন আমরা সবর করতে পারলাম না। (ইতিলালুল কুলূব : ২১৯)

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

হে মুমিনগণ! তোমাদের অর্থসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে তোমাদের উদাসীন না করে। (সূরা মুনাফিকুন : ৯)

আরও বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ.

তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। (সূরা তাগাবুন : ১৪)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ.

সন্তান মানুষকে কৃপণতা, ভীরুতা ও দুঃখ-দুর্দশায় লিপ্ত করে দেয়। (মুসনাদে আবু ইয়ালা : ১০৩২)

একবার রাসূলুল্লাহ (স) যখন হাসান (রা)-কে জামায় জড়িয়ে পড়ে যেতে দেখলেন, তখন মিম্বর থেকে নেমে এসে তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন, আল্লাহ সত্যিই বলেছেন—

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ.

নিশ্চয় তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ। (সূরা তাগাবুন : ১৫)

আমি আমার নাতিকে পড়ে যেতে দেখে স্থির থাকতে পারলাম না এবং তাকে কোলে তুলে নিলাম। (আবু দাউদ : ১১০৯; জামে তিরমিযী : ৩৭৭৪; সুনানে নাসায়ী : ৩ : ১০৮; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৬০০)

এতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ রয়েছে। সুতরাং নিরাপত্তা ও সচ্ছলতায় সবর করা সত্যিকার সাহসিকতার পরিচায়ক। সচ্ছলতায় সবর করার অর্থ হচ্ছে এর প্রতি আগ্রহ না করা এবং মনে করা যে, এটা ক্ষণস্থায়ী আমানত মাত্র, যা অচিরেই হাতছাড়া হয়ে যাবে। ধনৈশ্বর্যে তুষ্ট হওয়া এবং বিলাসিতায় ডুবে থাকা কিছুতেই উচিত হবে না। বরং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামাতের দ্বারা আল্লাহর হক আদায় করা জরুরি। যেমন— ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা, অপরকে শারীরিক ভাবে সাহায্য করা এবং মুখে সত্য কথা বলে তাঁর হক আদায় করা। এ ধরনের সবর শোকরের সাথে সম্পৃক্ত। শোকরে সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত এই সবর পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

নিরাপত্তা ও সচ্ছলতার সময়ে সবর করা খুবই কঠিন, কেননা তখন ক্ষমতা থাকে। যেমন— ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সামনে খাদ্য না থাকলে, সে সহজেই সবর করতে পারে। কিন্তু যদি উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাবার সামনে থাকে, তবে সবর করা খুবই কঠিন। সুতরাং সচ্ছলতার ফেতনা গুরুতর।

যেসব অবস্থা মানুষের প্রবৃত্তির প্রতিকূল হয়ে থাকে, সেগুলো হয়তো মানুষের ইচ্ছাধীন হবে, যেমন ইবাদত ও নাফরমানি, অথবা ইচ্ছাধীন নয়, যেমন বিপদাপদ ও দুর্ঘটনা, কিংবা প্রথমে ইচ্ছাধীন নয়; কিন্তু তা দূর করা ইচ্ছাধীন; যেমন, কষ্টদানকারী থেকে প্রতিশোধ নেওয়া। এই তিন অবস্থাতেই সবর করতে হবে।

ইবাদতে সবর করা খুব কঠিন কাজ। কেননা, মানুষ স্বভাবগতভাবে দাসত্বকে ঘৃণা করে এবং প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। একারণেই এক বুযুর্গ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সে আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে, যা ফিরাউন أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ (অর্থাৎ আমি তোমাদের সুমহান প্রভু) বলে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু ফিরাউন তা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিল এবং তার সম্প্রদায়ও তার কথা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু অন্যরা এই ইচ্ছা প্রকাশ করার সুযোগ না পেলেও অন্তরে গোপন রাখে। তাই চাকর-বাকর ও অধিনস্তদের কাজে ত্রুটি হলে মানুষ ক্রোধান্বিত হয়ে যায়। এর কারণ মূলত অভ্যন্তরীণ অহংকার এবং প্রভুত্বের দাবি। এ থেকে বোঝা যায়, সর্বাবস্থায় দাসত্ব কঠিন। এছাড়া অলসতার কারণে কিছু ইবাদত অপ্রিয় মনে হয়। যেমন নামায। আবার কিছু কৃপণতার কারণে দুঃসাধ্য মনে হয়। যেমন যাকাত। কিছু ইবাদত অলসতা ও কৃপণতা উভয়ের কারণে কষ্টকর মনে হয়। যেমন হজ ও জিহাদ। সুতরাং ইবাদতে সবর করার অর্থ অনেকগুলো কঠিন কাজে সবর করা।

তিনটি ক্ষেত্রে ইবাদতকারীর সবর করা জরুরি। ১. ইবাদতের পূর্বে। অর্থাৎ ইবাদতের পূর্বে নিয়ত শুদ্ধ করে নিবে এবং লৌকিকতা ও ইবাদতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়ে সবর করবে। সাথে সাথে তার ইখলাস ও অঙ্গীকার দৃঢ় করে নিবে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّانَوَى.

আমলের প্রতিদান নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর মানুষ যে নিয়ত করে তারই ফল পায়। (সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে। (সূরা বাইয়িনাহ : ৫)

আর একারণেই আল্লাহ তাআলা সবরকে আমলের অগ্রবর্তী করে বলেছেন,

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ.

কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ। (সূরা হুদ : ১১)

২. আমলরত অবস্থায় সবর করা। যেমন আমল করার সময় যেন আল্লাহ হতে অমনোযোগী না হয়ে যায় এবং ইবাদতের সুন্নত ও আদবের ব্যাপারে অলসতা না করে। আমলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আদবের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখবে। সুতরাং কোনো আমল শেষ হওয়া পর্যন্ত অলসতা সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহের ব্যাপারে সবর করবে। এটাও একটি কঠিন সবর। আল্লাহ তাআলা বলেন,

نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ. الَّذِيْنَ صَبَرُوْا.

কতইনা উত্তম প্রতিদান (সৎ) কর্মশীলদের জন্য, যারা ধৈর্য ধারণ করে। (সূরা আনকাবুত : ৫৮-৫৯)

আমল শেষ করা পর্যন্ত সবর করে। মনোযোগ সহকারে আমল করে।

৩. আমল শেষ করার পর সবর করা। অর্থাৎ, আমল করে তা প্রকাশ না করা। মানুষের মুখে বাহ বাহ শোনার উদ্দেশ্যে তা বলে বেড়ানো এবং আমল বিনষ্টকারী সকল বিষয়ে সবর করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ.

আর তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মদ : ৩৩)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى.

দানের খোঁটা এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নিষ্ফল করো না। (সূরা বাকারা : ২৬৪)

সুতরাং যে ব্যক্তি দান-সদকা করার পর খোঁটা ও কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সবর করবে না, সে নিশ্চিত তার আমল নষ্ট করে ফেলবে।

আমল দুই প্রকার ঃ ফরয ও নফল। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা উভয়টি একত্রে উল্লেখ করেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى.

নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। (সূরা নাহল : ৯০) এখানে ইনসাফ ফরয, অনুগ্রহ নফল এবং আত্মীয়কে দান করা মানবতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা। এগুলোর প্রত্যেকটিতেই সবরের প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, গুনাহেও সবর করতে হবে। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সকল প্রকার গুনাহ একত্রিত করে বলেছেন—

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ.

আর তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালংঘন করা থেকে। (সূরা নাহল : ৯০)

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوْءَ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ هَوَاهُ.

মুহাজির হলো সে ব্যক্তি, যে মন্দকাজ পরিত্যাগ করে এবং মুজাহিদ ওই ব্যক্তি, যে আপন প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে। (মুস্তাদরাকে হাকেম : ১ : ১১)

মানুষ যেসব গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেগুলোতে সবর করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কারণ, প্রবৃত্তির সাথে যখন অভ্যাস যোগ হয়, তখন শয়তানের দুটি বাহিনী পরস্পরে মিলেমিশে একে অপরকে সাহায্য করে এবং আল্লাহর বাহিনীর মোকাবেলা করে। ফলে ধর্মীয় প্রেরণা তাকে পরাস্ত

করতে সক্ষম হয় না। এরপর যদি সে গুনাহ সহজসাধ্য হয়, তাহলে তাতে সবর করা কঠিন। যেমন— গীবত, মিথ্যা, ঝগড়া-বিবাদ, প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে আত্মপ্রশংসা এমনভাবে হাসিঠাট্টা করা যাতে মানুষের মনে কষ্ট হয়, কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলা, মৃত ব্যক্তির দোষ বর্ণনা, তার ইলম, আমল এবং মর্যাদা হানি করা ইত্যাদি বিষয় বাহ্যিকভাবে গীবত। কিন্তু বাস্তবে এগুলো হলো আত্মপ্রশংসা। কারণ এসব কাজে নফসের দুটি চাহিদা থাকে। একটি হলো অপরের খুঁত ধরা। অপরটি হলো নিজেকে নিখুঁত প্রমাণ করা। এজন্যই নফস সেদিকেই বেশি আকৃষ্ট হয় যে দিকে নিজের প্রভুত্ব পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর প্রভুত্ব হলো দাসত্বের বিপরীত। মানুষকে দাসত্বের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; প্রভুত্বের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কারণ নফস এ দুটি চাহিদাকে একত্র করে। আর মুখ নাড়ানো সহজ। কিন্তু জীবনভর এমন ফালতু কথাকে অভ্যাস বানিয়ে নেওয়া হয় এবং তার ভালোমন্দের ওপর মন্তব্য করা অনর্থক মনে করা হয়। এজন্য এসমস্ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন। এর ঘৃণ্যতা ও অপছন্দনীয়তা মন থেকে উঠে গেছে। কারণ, এ বিষয়টি অধিক হারে সংঘটিত হয় এবং মানুষের স্বভাবের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। এ কারণেই দেখা যায়, রেশমি পোশাক পরতে দেখলে খারাপ ভাবা হয় কিন্তু গীবতের ঝড় তোলা খারাপ মনে হয় না। অথচ গীবত যিনা থেকেও ভয়াবহ। যে ব্যক্তি কথাবার্তার সময় নিজেকে গীবত থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তার জন্য নির্জনবাসই আবশ্যক। এছাড়া তার মুক্তির পথ নেই। নির্জনবাস অবলম্বন করা জনসম্মুখে চুপ থাকা অপেক্ষা অধিক সহজ। গুনাহের মাধ্যম যতটা না কঠিন, এর থেকে সবর করা (বিরত থাকা) তার থেকেও অধিক কষ্টকর। আর অন্তরে চিন্তার খটকা মুখ নাড়ানো অপেক্ষা অধিক সহজ। এই অবস্থায় নির্জনবাসেও রেহাই মিলে না। তবে মনে যদি দীনি কোনো চিন্তাভাবনা এসে পড়ে তাহলে ভিন্ন কথা। যদি ফিকিরকে নির্ধারিত কোনো কাজে না লাগানো হয় তাহলে কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলে না।

এছাড়া যে সকল অবস্থা প্রথমে ইচ্ছাধীন নয়; কিন্তু তা দূর করা ইচ্ছাধীন যেমন, কেউ কাউকে কথা কিংবা কাজের মাধ্যমে কষ্ট দিল অথবা শারীরিক কিংবা আর্থিকভাবে ক্ষতি করল। এক্ষেত্রে সবর করা এবং

প্রতিশোধ না নেওয়া কখনো ওয়াজিব আবার কখনো মুস্তাহাব। এক সাহাবী বলেন, কষ্ট-বিপদে সবর না করা পর্যন্ত আমরা কারও ঈমান গণ্য করতাম না। (কূতুল কুলূব : ১ : ১৯৫)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছ, আমরা তাতে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করব এবং নির্ভরকারীগণ আল্লাহর ওপরই নির্ভর করুক। (সূরা ইবরাহিম : ১২)

একবার কিছু অর্থসম্পদ রাসূলুল্লাহ (স) বণ্টন করলে কয়েকজন বেদুইন মুসলমান বলাবলি শুরু করল যে, এ বণ্টনে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। এ সংবাদ শোনার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুই গাল (ক্রোধে) লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, আমার ভাই মূসা (আ)-এর ওপর আল্লাহ তাআলা রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন। (সহিহ বুখারী : ৩১৫০; সহিহ মুসলিম : ১০৬২)

নবী কারীম (স)-কে আল্লাহ তাআলা ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দিয়ে বলেছেন,

وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ.

তাদের নির্যাতন উপেক্ষা করুন এবং নির্ভর করুন আল্লাহর ওপর। (সূরা আহযাব : ৪৮)

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا.

এরা (কাফেররা) যা বলে, সেজন্য আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সুন্দরভাবে এদের এড়িয়ে চলুন। (সূরা মুযযাম্মিল : ১০)

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ.

নিশ্চয় আমি জানি, তাদের কথাবার্তায় আপনার মন সংকুচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন। (সূরা হিজর : ৯৭-৯৮)

لَتُبْلَوُنَّ فِيٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۚ وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

নিশ্চয় তোমাদেরকে তোমাদের অর্থবিত্ত ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং মুত্তাকি হও, তা হলে নিশ্চয় তা হবে স্থির সংকল্পের কাজ। (সূরা আলে ইমরান : ১৮৬)

আয়াতে প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করাই উদ্দেশ্য। এ কারণে এ ধৈর্যের মর্যাদা অনেক। আল্লাহ তাআলা কিসাস ইত্যাদির ব্যাপারে ক্ষমাকারীর প্রশংসা করে বলেছেন,

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ.

যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তবে ঠিক ওই পরিমাণ প্রতিশোধ নেবে, যে পরিমাণ অন্যায় তোমাদের সাথে করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তা-ই উত্তম। (সূরা নাহল : ১২৬)

নবী কারীম (স) ইরশাদ করেন,

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ.

যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান করো। যে তোমার উপর অত্যাচার করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। (মুসনাদে আহমদ : ৪ : ১৫৮; শুআবুল ঈমান : ৭৭২৩)

ইনজিলে বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আ) বলেছেন, ইতঃপূর্বে তোমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, দাঁতের বদলে দাঁত, নাকের বদলে নাক অর্থাৎ, যতটুকু ক্ষতি তোমার করা হবে, ততটুকু প্রতিশোধ নিবে। তবে আমি বলি ক্ষতির পরিবর্তে ক্ষতি করো না। তোমার ডান গালে কেউ চড় মারলে তুমি তার সম্মুখে বাম গাল এগিয়ে দাও। তোমার চাদর কেউ নিয়ে গেলে তাকে

তুমি লুঙ্গিও দিয়ে দাও। কেউ অকারণে তোমাকে এক মাইল নিয়ে গেলে তার সঙ্গে তুমি দু'মাইল চলে যাও। এসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সবরের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে, মানুষের যন্ত্রণায় ধৈর্য ধারণ করা। এর মধ্যে দীনের প্রেরণার বিপরীতে ক্রোধ এবং কামনার প্রেরণা একত্রিত হয়। (আর সবগুলোর ওপর একত্রে নিয়ন্ত্রণ করা বড় বাহাদুরির কাজ।)

কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলোর কোনোটিই বান্দার ইচ্ছাধীন নয়। যেমন, প্রিয়জনের মৃত্যু, ধনসম্পদ নষ্ট হওয়া, রোগে স্বাস্থ্যহানি হওয়া, অঙ্গহানি হওয়া ইত্যাদি। এগুলোতে ধৈর্য ধারণ করাও উচ্চস্তরের সবর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিন ধরনের ধৈর্যের কথা কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে : ১. ফরয আদায়ে ধৈর্য ধরা। এর বিনিময় হলো তিনশত সওয়াব। ২. আল্লাহ তাআলার হারামকৃত বিষয়সমূহে ধৈর্য ধারণ করা। এর বিনিময়ে ছয়শত সওয়াব পাওয়া যায়। ৩. বিপদাপদে ধৈর্য ধরা। এর বদলা নয়শত সওয়াব। এই ধরনের ধৈর্য যদিও মুস্তাহাব, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার ধৈর্যের চেয়ে উত্তম, যদিও তা ফরয। কারণ, হারাম বিষয়ে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম। কিন্তু বিপদে ধৈর্য ধারণ সেই করবে, সিদ্দীকগণের মর্যাদা যার হাসিল হবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) দুআ করতেন,

اَسْئَلُكَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَاتُهَوِّنُ عَلَيَّ بِهٖ مَصَائِبَ الدُّنْيَا.

হে আল্লাহ! আমি এমন ইয়াকিন কামনা করি যা দ্বারা পার্থিব বিপদাপদ আমার জন্য সহজ হয়ে যায়। (জামে তিরমিযী : ৩৫০২; সুনানে নাসায়ী : ১০১৬১; মুস্তাদরাকে হাকেম : ১ : ৫২৮)

হযরত আবু সুলায়মান (র) বলেন, আল্লাহর শপথ! প্রিয় বস্তুতে আমরা ধৈর্য ধারণ করতে না পারলে অপ্রিয় বস্তুতে কীভাবে ধৈর্য ধারণ করতে পারব? (আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা : ৩২৫)

এক হাদিসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যখন বান্দার শরীর, ধনসম্পদ অথবা সন্তানসন্ততিতে কোনো বিপদ দেই এবং সে তা উত্তম ধৈর্য দ্বারা সহ্য করে নেয়, তখন কিয়ামতে তার জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করতে অথবা তার আমলনামা উন্মুক্ত করে দিতে আমি লজ্জা পাই। (নাওয়াদিরুল উসূল : ২২২; আল-কামিল : ৭ : ১৫০; মুসনাদুশ শিহাব : ১৪৬২)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اِنْتِظَارُ الْفَرْجِ بِالصَّبْرِ عِبَادَةٌ.

ধৈর্য সহকারে স্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষা করা ইবাদত। (মুসনাদুশ শিহাব : ৪৬; শুআবুল ঈমান : ৯৫৩১)

আরেক হাদিসে বলা হয়েছে— কোনো মুমিন বান্দার ওপর যখন বিপদ নেমে আসে এবং সে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলে। এরপর বলে—

اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ، وَأَعْقِبْنِيْ خَيْرًا مِّنْهَا.

হে প্রভু! আমার বিপদে আমাকে রক্ষা করুন এবং এর পরিবর্তে উত্তম বস্তু দান করুন। আল্লাহ তাআলা তখন তা-ই করেন। (সহিহ মুসলিম : ৯১৮)

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বললেন, হে জিবরাঈল! আমি যার উভয় চোখ নিয়ে নিই, তার প্রতিদান কী? জিবরাঈল বললেন, আপনি পুতঃপবিত্র। আপনি আমাদেরকে যে বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, তা ব্যতীত আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, তার বদলা এই যে, সে সবসময় আমার ঘরে থাকবে এবং আমার সান্নিধ্য লাভে লাভবান হবে। (মুজামে আওসাত : ৮৮৫০)

হাদিসে কুদসীতে রয়েছে— আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যখন কোনো বান্দাকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করি এবং সে ধৈর্য ধারণ করে এবং যারা তার সংবাদ নিতে আসে, তাদের নিকট কোনো অভিযোগ করে না। আমি তার মাংস অপেক্ষা প্রতিদানে উত্তম মাংস দেই এবং তাকে তার রক্ত অপেক্ষা উত্তম রক্ত দান করি। তাকে যখন রোগমুক্ত করি, তখন তাকে মাফ করে দিই। তখন তার কোনো গুনাহ থাকে না, আর যখন মৃত্যু দিই, তখন আমার রহমতের ছায়াতলে স্থান দিই। (মুস্তাদরাকে হাকেম : ১ : ৩৪৭; সুনানে কুবরা : ৩ : ৩৭৫; মুয়াত্তা : ২ : ৯৪০)

হযরত দাউদ (আ) আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, হে প্রভু! যে দুঃখী ব্যক্তি আপনার সন্তুষ্টির আশায় বিপদে ধৈর্য ধরে, তার পুরস্কার কী? ইরশাদ হলো, তার পুরস্কার হলো, তাকে ঈমানের পোশাক পরিধান

করানো হবে এবং তা কখনো খোলা হবে না। (শুআবুল ঈমান : ৮৮৪১; হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪৭ : ৪)

একবার খুতবায় হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বললেন, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে নিয়ামত দান করে তা নিয়ে যান, তখন যদি সে ধৈর্য ধরে, তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন নিয়ামত দান করেন, যা তার পূর্বের নিয়ামতের চেয়েও উত্তম হয়ে থাকে। এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

ধৈর্যশীলদের (পরকালে) অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। (সূরা যুমার : ১০; হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৫ : ২৯৮)

হযরত ফুযাইল (র)-কে সবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সবর হলো আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা। জিজ্ঞাসা করা হলো, এটা কীভাবে সম্ভব? তিনি বলেন, উক্ত ব্যক্তি নিজের অবস্থানের ঊর্ধ্বে আকাঙ্ক্ষা করবে না।

বর্ণিত আছে, হযরত শিবলী (র) গ্রেফতার হয়ে জেলে গেলে কিছু ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কারা? লোকেরা বলল, আমরা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনাকে দেখতে এসেছি। তখন তিনি তাদেরকে ঢিল মারতে লাগলেন। এতে তারা সকলেই পালিয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, যদি তোমরা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হতে, তাহলে আমার বিপদে ধৈর্য ধরতে। (আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া : ৩২৮)
এক সাধকের জামার পকেটে একটি কাগজের চিরকুট ছিল। তিনি কিছুক্ষণ পরপর সেটি বের করে পড়তেন। তাতে লেখা ছিল,

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا.

আপনি আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষোয় ধৈর্য ধারণ করুন; কারণ আপনি আমার তত্ত্বাবধানেই রয়েছেন। (সূরা তুর : ৪৮) (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা : ৩২৮)

বর্ণিত আছে, ফাতাহ মুসেলীর স্ত্রী একবার পা ফসকে পড়ে যান। এতে তার পায়ের নখ উপড়ে যায়। কিন্তু তিনি হেসে উঠলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা

করল, আপনি ব্যথা পাননি? তিনি বললেন, এর সওয়াবের আনন্দ ব্যথার কষ্ট দূর করে দিয়েছে। (আল-মুজালাসাহ ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ৫১৯)

হযরত দাউদ (আ) তার ছেলে হযরত সুলায়মান (আ)-কে বললেন, মুমিনের তাকওয়া প্রমাণিত হয় তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে— ১. সে যা পায় না, তাতে উত্তম ভরসা করা, ২. যা সে পায়, তাতে উত্তমভাবে সন্তুষ্ট থাকা এবং ৩. যে জিনিস পেয়েও হাতছাড়া হয়ে যায়, তাতে উত্তম ধৈর্য ধারণ করা। (আয-যুহদুল কাবীর : ৯৬৬)

নবী কারীম (স) ইরশাদ করেন—

مِنْ اِجْلَالِ اللهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّهٖ اَنْ لَّا تَشْكُوَ وِجْعَكَ وَلَا تَذْكُرَ مُصِيْبَتَكَ.

আল্লাহর সম্মান ও তাঁর হকের পরিচয় হলো, তুমি তোমার কষ্টের অভিযোগ করবে না এবং বিপদাপদের কথা বলবে না।[১]

বর্ণিত আছে, এক বুযুর্গ একটি থলেতে কিছু টাকা নিয়ে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে তার থলেটি হারিয়ে গেল। তখন বুযুর্গ বললেন, আল্লাহ তাআলা টাকাগুলোতে বরকত দান করুন। যে নিয়েছে তার আমার থেকে বেশি প্রয়োজন ছিল।

এক তাবেয়ি বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন বনু হানিফার মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় আমি নিহতদের সারিতে সালিম মাওলা আবু হুযায়ফা (রা)-কে দেখতে পেলাম। তখন তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল। আমি বললাম, আপনি কি পানি খাবেন? তিনি বললেন, আমাকে একটু শত্রুর দিকে নিয়ে যাও। আর ঢালের মধ্যে পানি রাখো। আমি তো রোযা রেখেছি। রাত পর্যন্ত হায়াত পেলে আমি তা পান করবো। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পথের অনুসারীদের ধৈর্যধারণ এমনই হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হয় যে, বিপদাপদে মানুষ সবরের মর্তবা কীভাবে লাভ করবে। কারণ, এটা ইচ্ছা বহির্ভূত বিষয়। অন্তরে বিপদাপদের প্রতি ঘৃণা না থাকার নাম যদি সবর হয়, তবে এটা মানুষের এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত নয়? এর জবাব

---

১ হাফেজ ইরাকী (র) বলেছেন, এরকম কোনো হাদিস আমি পাইনি। ইবনে আবিদ দুনিয়া 'আল মারাযু ওয়াল কাফফারাত' (২২৩) গ্রন্থে সুফিয়ান সাওরী (র)-এর সূত্রে কয়েকজন ফকিহ থেকে বর্ণনা করেছেন, সবর হলো নিজের বিপদ এবং ব্যাথার কথা আলোচনা না করা এবং নিজেকে পবিত্র বলে দাবি না করা।

হলো, সবরকারীর তালিকা থেকে মানুষ তখনই বাদ পড়বে, যখন সে বিপদে হা-হুতাশ করবে, চেহারায় আঘাত করবে এবং গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলবে। সর্বদা অভিযোগ করে বেড়াবে, দুঃখ প্রকাশ করবে এবং খাওয়া-পরার অভ্যাসে পরিবর্তন আনবে। আলোচ্য সকল বিষয় মানুষের ইচ্ছাধীন। সুতরাং তার উচিত এসকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। নিজের অভ্যাসে বহাল থাকা, পরিবর্তন না আনা। মনে করতে হবে, হারানো বস্তুটি তার কাছে আমানত ছিল, যা তার মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

রুমাইসা উম্মে সুলাইম (রা) বর্ণনা করেন, আমার অসুস্থ ছেলেটি যখন মারা গেল, তখন আমার স্বামী হযরত আবু তালহা (রা) বাড়িতে ছিলেন না। আমি ঘরের এক কোণে লাশটি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলাম। এরপর আবু তালহা বাড়ি ফিরলে আমি ধীরস্থিরভাবে তাকে খাবার দিলাম। তিনি খেতে খেতে, ছেলের অবস্থা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো আছে। কারণ, অসুস্থ হওয়ার পর থেকে কোনো রাত এত শান্তিতে কাটেনি, যেমন সেই রাতটি কেটেছিল। এরপর আমি অন্য দিনের চেয়ে অধিক সাজসজ্জা করলাম এবং স্বামী আমার সাথে মিলিত হলেন। এরপর আমি তাকে বললাম, আমাদের প্রতিবেশীর কাণ্ড খুবই অদ্ভুত। তিনি জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, সে একটি জিনিস চেয়ে এনেছিল। এখন মালিক সেটি ফিরিয়ে নিয়ে গেলে সে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। আবু তালহা বললেন, প্রতিবেশীর এরকম আচরণ খুবই খারাপ হয়েছে। আমি বললাম, তোমার এই পুত্র আল্লাহর তরফ থেকে ধার ছিল। আল্লাহ এখন তা নিয়ে গেছেন। একথা শুনে আবু তালহা (রা) আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করলেন। পরের দিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فِيْ لَيْلَتِهِمَا.

হে আল্লাহ! এই রাতের ব্যাপারে তাদের উভয়ের জন্য বরকত দাও। রাবী বলেন, এই দুআর পর আমি মসজিদে আবু তালহার সাতটি ছেলে সন্তানকে কুরআন পাঠ করতে দেখেছি। (সহিহ বুখারী : ৫৪৭০; সহিহ মুসলিম : ২১৪৪; মুজামে কাবীর : ২৫ : ১২৮; হিলয়াতুল আউলিয়া : ২ : ৫৯)

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম জান্নাতে প্রবেশ করেছি তখন আবু তালহার স্ত্রী রুমাইসাকে সেখানে দেখেছি। (সহিহ বুখারী : ৩৬৭৯)

এক বুযুর্গ বলেন, "সবরে জামীল" (সুন্দর সবর) হচ্ছে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে অপরের চেয়ে পৃথকভাবে চিনতে না পারা। মৃতের জন্য ক্রন্দন করলে কেউ ধৈর্যশীলদের তালিকা থেকে বের হয়ে যায় না। কেননা, এটা মানবতার দাবি। মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ এ থেকে মুক্ত নয়। এজন্যেই পুত্র ইবরাহিমের মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে। তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আপনি তো আমাদেরকে এরকম করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বললেন,

إِنَّ هٰذِهٖ رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

এটা তো রহমত। যারা রহম করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকেই রহমত দান করেন। (সহিহ বুখারী : ১৩০৩, ১৩৮৪; সহিহ মুসলিম : ২৩১৫, ৯২৩)

এই অশ্রুপাতের মাধ্যমে মানুষ 'রিয়া' বা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টির স্তর থেকেও বের হয়ে যায় না। ইঞ্জেকশন এবং সিঙ্গা লাগানোর সময়ও তো ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই ব্যাথা অনুভব করে। কখনো কখনো তো ব্যাথার যন্ত্রণায় চোখ থেকে অশ্রুও বের হয়। এ ব্যাপারে 'রিয়া' অধ্যায়ে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ!

ইবনে আবি নাজীহ কোনো খলিফার মৃত্যুতে শোকবার্তা লিখেছিলেন, যে ব্যক্তি এটা জানে, আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন সেটা তাঁর পাওনা, সে ব্যক্তি এটার বেশি হকদার যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। এর মধ্যে তার নিজের গুরুত্ব অনুধাবন করবে। মনে রাখবেন, যেটা আপনার আগে চলে গেছে সেটা আপনার জন্য অবশিষ্ট থাকল। আর যেটা আপনার পরে বাকি থাকবে সেটার ব্যাপারে আপনি বদলা পাবেন। মনে রাখবেন, বিপদাপদে সবর করার কারণে যে প্রতিদান পাওয়া যায় তা বিপদাপদ থেকে বাঁচার কারণে যে নিয়ামত উপভোগ করা যায় তার থেকে অনেক ভালো। (কূতুল কুলূব : ১ : ১৯৫)

মোটকথা, আল্লাহর নিয়ামতের কথা চিন্তা করে কষ্টক্লেশ সহ্য করে যাওয়ার মাধ্যমে সওয়াব পাওয়া যাবে। এমন ব্যক্তি সবরকারীদের মর্যাদা হাসিল করবে।

অবশ্য পরিপূর্ণ ধৈর্য হচ্ছে রোগ, দারিদ্র্য ও যাবতীয় বিপদাপদকে গোপন রাখা। এক বুযুর্গ বলেছেন, বিপদাপদ, জ্বালা-যন্ত্রণা এবং সদকা গোপন রাখা সৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত। (শুআবুল ঈমান : ৯৫৭৫; হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ১৯৭)

সবরের এই বিভক্তির পর এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সর্বাবস্থায় এবং সর্বক্ষেত্রে সবর করা আবশ্যক। প্রবৃত্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য যে নির্জনতা অবলম্বন করে তাকেও সবর করতে হয়। যতই একাকী থাকুক না কেন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সে মুক্ত থাকতে পারে না। আর শয়তানের কুমন্ত্রণা মনের মধ্যে প্রভাব ফেলে। যা একাকী ও স্থির থাকতে দেয় না। অন্তরে যেসব চিন্তাভাবনা আসে তার অধিকাংশই এমন সব ছুটে যাওয়া বিষয়ে যার নাগাল পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। অথবা এমন সব বিষয়ে চিন্তা আসে যা ভাগ্যে থাকলে ভবিষ্যতে জুটবে। এই দুপ্রকারই অযথা সময় নষ্ট। অন্তর হলো মানুষের হাতিয়ার এবং জীবন হলো তার পুঁজি। মানুষের অন্তর সামান্য সময়ের জন্যও যদি আল্লাহর স্মরণ এবং চিন্তা থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে তাহলে এটা অনেক বড় ক্ষতির কথা। আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তরের এমন কাজ উদ্দেশ্য যার দ্বারা আল্লাহর অন্তরঙ্গতা অর্জিত হয়। আর আল্লাহর চিন্তা দ্বারা এমন কাজ উদ্দেশ্য যার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় জানা যায় এবং এই পরিচয় আল্লাহর ভালোবাসা লাভের মাধ্যম হয়। এটা এমন অবস্থায় হবে যখন অন্তরের খটকা বৈধ বিষয়ে হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় এমনটা হয় না। সাধারণত মনের মধ্যে প্রবৃত্তিই ঘুরপাক খায়। চিন্তা চলতে থাকে কেমন করে সেসব বাস্তবায়ন করা যাবে।

এই ব্যক্তি সবসময় এমন সব লোকের সাথে বিতর্কে লিপ্ত থাকে যারা তার মতো বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছে, অথবা তার ধারণামতে যারা তার বিরোধিতা করতে পারে বরং যে ব্যক্তি তার এবং তার পরিবার-পরিজনের জন্য একনিষ্ঠ এমন ব্যক্তি সম্পর্কেও ধারণা করা হয় যে সে বিরোধী। তারপর চিন্তা করে কীভাবে তাদের শাসন করা যায় এবং বিরোধিতা যাতে করতে না পারে সেজন্য শুরু থেকে দমিয়ে রাখা যায়। দিন রাত এ চিন্তাতেই কেটে যায়।

প্রকৃতপক্ষে শয়তানের দুই ধরনের বাহিনী রয়েছে। এক প্রকার বাহিনী উড়ে বেড়ায় আরেক প্রকার বাহিনী চলাচল করে। কুমন্ত্রণা হলো তার উড়ন্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। আর মনের মধ্যে থাকা প্রবৃত্তি হলো চলন্ত

বাহিনী। এর কারণ হলো, শয়তান আগুন থেকে সৃষ্ট। আর মানুষ পোড়া মাটির মতো ঠনঠনে মাটি থেকে সৃষ্ট। এই মাটির মধ্যে আগুনও রয়েছে। মাটির স্বভাব হলো স্থিরতা। আর আগুনের স্বভাব হলো নড়াচড়া করা। জ্বলন্ত কিন্তু স্থির— আগুন এমন হতে পারে না; বরং আপন প্রকৃতি মতো তা নড়াচড়া করবে এটাই স্বাভাবিক। আগুন থেকে সৃষ্ট অভিশপ্ত শয়তানকে নড়াচড়া বন্ধ করে মাটি থেকে তৈরি সৃষ্টিকে সিজদা করতে আদেশ করা হয়েছিল। কিন্তু সে এই হুকুম মানতে অস্বীকার করে। অহংকার প্রদর্শন করে নাফরমানি করে।

অবাধ্যতার কারণস্বরূপ সে যুক্তি প্রদর্শন করে।

خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ.

আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে কাদা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আরাফ : ১২)

সুতরাং এই অভিশপ্ত শয়তান যখন আমাদের আদি পিতা আদম (আ)-কে সিজদা করেনি তাহলে তার সন্তানদের সিজদা করবে এমনটা আশা করা যায় না। শয়তান যদি মানুষকে কুমন্ত্রণা দেওয়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে সে মানুষকে ইবাদত করতে সহযোগিতা করে তার বশ্যতা স্বীকার করে নিল। আর এই বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়াই সিজদার মূলকথা। মাটিতে কপাল ঠেকানো হলো তার বাহ্যিক অবস্থা। যদি এভাবে কাজ করা অপমান এবং লাঞ্ছনার জন্য নির্ধারণ করা হতো তাহলে এমনটাই করা হতো। যেমন কোনো সম্মানিত ব্যক্তির সামনে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকা বেয়াদবি মনে করা হয়।

অতএব, ঝিনুক দেখে মুক্তা, শরীর দেখে আত্মা এবং খোসা দেখে বাদামের কথা ভুলে যাবেন না। এমন যেন না হয় যে দৃশ্যমান জগৎ নিয়ে এতটাই মজে গেলেন যে, অদৃশ্য জগতের আর কোনো খবরই থাকলো না। মনে রাখবেন শয়তান আপনার চিরন্তন শত্রু। আপনাকে গোমরাহ করার জন্য তাকে ছাড় দিয়ে রাখা হয়েছে। সে আপনাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে চলবে। তার লক্ষ্য হলো আপনার ও তার চিন্তা এক বানিয়ে ফেলা। ফলে আপনার অন্তর এক আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যাবে। সুতরাং অভিশপ্ত শয়তান যেন কোনোভাবেই আপনার কাছে সুযোগ না পায় সেজন্য সতর্ক

থাকুন। তাহলেই আপনি আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতে পারবেন। অভিশপ্ত শয়তানের দলভুক্ত হওয়া থেকে বেঁচে যাবেন।

এমন হওয়া অসম্ভব যে, আপনার অন্তরে আল্লাহর স্মরণও নেই আবার শয়তানের কুমন্ত্রণাও নেই। বরং শয়তান মানুষের রগে রক্তের মতো প্রবাহিত হয়ে চলে। এটার অবস্থা এমন যেন কোনো পাত্রের মাঝে বাতাস থাকা। এখন আপনি যদি একটি পাত্রে বাতাস ও পানি উভয়টিই ভর্তি রাখতে চান তাহলে তা অসম্ভব। বরং পাত্রের যতটুকু অংশ পানিশূন্য থাকবে ততটুকু জায়গার মধ্যে হাওয়া অবস্থান করবে। তদ্রূপ আল্লাহর যিকিরে ভরপুর হৃদয় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকে। অন্যথায় যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে সামান্য সময়ের জন্যও উদাসীন হয়ে যায় ওই সময়টাতে শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ.

যে ব্যক্তি চির দয়ালু আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান এবং সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ : ৩৬)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الشَّابَّ الْفَارِغَ.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অবসর যুবককে অপছন্দ করেন। এর কারণ হলো, যুবক যখন এমন কাজ না করে যার কারণে তার অন্তর কোনো বৈধ কাজ বা দীনি চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, তখন বাহ্যত তাকে অবসর দেখা গেলেও শয়তান তার অন্তরে বাসা বাঁধে। তারপর তাতে নিজের বংশ বিস্তার করতে থাক। আর শয়তানের বংশ বিস্তার অন্য যে কোনো প্রাণির তুলনায় দ্রুততর হয়ে থাকে। কারণ শয়তানের সৃষ্টি আগুন হতে। আর আগুন সামনে শুকনা জিনিস পেলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সামান্য খড়কুটো থেকে অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি হতে সময় লাগে না। তদ্রূপ যুবকের মনে প্রবৃত্তি হলো আগুনের জন্য খড়কুটোর মতো। আগুন যদি তার খোরাক লাকড়ি না পায় তাহলে তা স্তিমিত হয়ে আসে। সুতরাং প্রবৃত্তি না থাকলে শয়তানের জন্য কোনো সুযোগই থাকলো না।

অতএব, আপনি চিন্তা করলেই বুঝত পারবেন প্রবৃত্তিই আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু। এটাই নফসের কাজ। এজন্যই হুসাইন ইবনে মনসূর হাল্লাজকে শূলে চড়ানোর সময় যখন তাসাউফের পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, তাসাউফ হলো তোমার নফস। তুমি যদি তাকে কাজে লাগিয়ে ব্যস্ত না রাখো তবে সে-ই তোমাকে ব্যস্ত রাখবে।

মোটকথা, প্রকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ সবর হলো যাবতীয় নিন্দনীয় কাজ পরিহার করা। আর অভ্যন্তরীণ কাজ থেকে সবর করা (অর্থাৎ মনের মধ্যে আসা ওয়াসওয়াসা দমন করা) অধিক যৌক্তিক। আর এই সবর মৃত্যু পর্যন্ত করে যেতে হয়। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা এ ব্যাপারে তাওফিক কামনা করি।

সবর অর্জনের উপায়

এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, যিনি রোগ-ব্যাধি প্রেরণ করেছেন, তিনি এর ওষুধও প্রেরণ করেছেন এবং আরোগ্য দানের অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং ধৈর্য যদিও অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার; কিন্তু ইলম ও আমলের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব। ধৈর্যের প্রকার বিভিন্ন হওয়ার কারণে তার প্রতিবন্ধকও বিভিন্ন এবং প্রতিবিধানও বিভিন্ন প্রকার। বিষয়টি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। কতিপয় উদাহরণের মাধ্যমে তা আলোচনা করছি।

যেমন, এক ব্যক্তি ব্যভিচারের উত্তেজনা থেকে ধৈর্য শিক্ষা করতে চায়। এই উত্তেজনা তার ওপর এত প্রবল যে, সে যৌনাঙ্গ দমন করতে পারলেও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম নয়। কিংবা দৃষ্টিকে সংযত করতে সক্ষম হলেও মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মন সব সময় তাকে যৌনস্পৃহায় জাগিয়ে তুলে, নিরবচ্ছিন্নভাবে যিকির, ইবাদত ও সৎকাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ধর্মীয় প্রেরণা এবং শয়তানি প্রেরণার মধ্যে সংঘর্ষ লেগে থাকে। আমরা যদি এদের এক পক্ষের জয় এবং অপর পক্ষের পরাজয় আশা করি, তবে যাকে বিজয়ী করা উদ্দেশ্য হয়, তাকে শক্তিশালী করা এবং অপর পক্ষকে দুর্বল করা আবশ্যক। কাজেই উল্লেখিত উপমাতে ধর্মীয় কাজে উৎসাহকে শক্তি যোগানো এবং শয়তানি কাজে উৎসাহকে দুর্বল করতে হবে।

তিন পদ্ধতিতে শয়তানি প্রেরণা দুর্বল করা যায়

এক. যৌন উত্তেজনাকে নিস্তেজ করার মূল উৎসকে খুঁজে বের করতে হবে। মূলত তার শক্তির মূল উৎস হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও পর্যাপ্ত খাবার গ্রহণ। সুতরাং খাবার-দাবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এ ধরনের ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সব সময় রোযা রাখতে হবে। ইফতারের সময় সে শুধু সামান্য হালকা খাদ্য গ্রহণ করবে। গোশত ও বলবর্ধক খাদ্য পরিহার করবে।

দুই. যৌনোত্তেজক সামগ্রী মওজুদ থাকলে তৎক্ষণাৎ তা দূর করতে হবে। কামোত্তেজনার মূল হচ্ছে চোখের দৃষ্টি। কেননা, দৃষ্টি অন্তরকে আর প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। এ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্জনবাস অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। হাদিসে আছে-

اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ.

দৃষ্টি হচ্ছে ইবলিসের অন্যতম বিষাক্ত তির। (মুস্তাদরাকে হাকেম : ৪ : ৩১৪)

শয়তান এই তির এমনভাবে নিক্ষেপ করে যে, চক্ষু বন্ধ রাখা ব্যতীত তা থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। সুতরাং মানুষ যখন সুন্দরী রমণীদের গমনাগমনের স্থান থেকে দূরে সরে যাবে, তখন ইবলিসের এই তির তার শরীরে লাগবে না।

তিন. মানুষ যে জিনিসের আগ্রহ প্রকাশ করে, সে জাতীয় বৈধ বস্তুর মাধ্যমেই মনকে সান্ত্বনা দিতে হবে। যেমন, বর্ণিত উপমায় বিবাহ দ্বারা মনকে সান্ত্বনা দেবে। কারণ, তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় বিবাহিতা স্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, এটা তাকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখবে। অধিকাংশ লোকের জন্য এই চিকিৎসা খুবই উপকারী। তবে কিছু সংখ্যক মানুষের যৌনস্পৃহা এতে দমন হয় না।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ.

তোমরা বিবাহ করো। যার পক্ষে তা সম্ভব নয় সে যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা তার প্রবৃত্তি দমন করবে। (মুজামে আওসাত : ৮১৯৯)

এখানে প্রথমোক্ত চিকিৎসাটি অর্থাৎ, খাবার নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, অবাধ্য জন্তু অথবা হিংস্র কুকুরকে খেতে না দেওয়ার মতো, যাতে সে দুর্বল হয়ে তার

শক্তি নিস্তেজ হয়ে যায়। দ্বিতীয় চিকিৎসাটি হচ্ছে, কুকুরের সামনে থেকে গোশত লুকিয়ে ফেলার মতো, যাতে সে দেখতে না পায় এবং লোভ না করে। তৃতীয় চিকিৎসাটি হচ্ছে, কুকুরের পছন্দনীয় খাদ্যের মধ্য থেকে তাকে অল্প দেওয়া, যাতে শাসনে ধৈর্য ধারণ করার মতো শক্তি তার মধ্যে অব্যাহত থাকে।

অপরপক্ষে দীনি প্রেরণাকে দু'ভাবে শক্তি জোগানো যায়

এক. মনকে সাধনার উপকারিতা এবং দীন ও দুনিয়াতে তার শুভ ফলাফলেরও লোভ দেখানো। এ ক্ষেত্রে ধৈর্যের ফযিলত এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার শুভ পরিণতি সম্পর্কে যে সকল হাদিস বর্ণিত আছে, সেগুলোতে অধিক পরিমাণে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। এর ফলে দীনি প্রেরণা মজবুত হয় এবং তাতে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

বর্ণনায় এসেছে, বিপদে সবর করার সওয়াব ছুটে যাওয়া বস্তুর অপেক্ষা বেশি। এজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এমন বিপদের কারণে ঈর্ষাবোধ করেন। কারণ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির যা খোয়া গেছে তা আজ না হয় কাল চলেই যেতো। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে যা অর্জিত হয়েছে তা মৃত্যুর পর অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এর দৃষ্টান্ত এমন যেন কোনো ব্যক্তি খারাপ বস্তু প্রদান করে ভালো বস্তু প্রাপ্তির জন্য দাদন চুক্তি করল। এখন খারাপ বস্তুর জন্য আপসোস করা তার উচিত হবে না।

এর সম্পর্ক মারেফাতের সঙ্গে। আর এই মারেফাত ঈমানের অংশ বিশেষ। এই মারেফাত কখনো দুর্বল হয়ে যায় আবার কখনো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই মারেফাত শক্তিশালী হলে দীনি প্রেরণা শক্তিশালী হয় এবং তা ব্যক্তিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। আবার মারেফাত দুর্বল হয়ে পড়লে তা দীনি প্রেরণাকেও দুর্বল করে দেয়। এই ঈমানের শক্তির অপর নাম ইয়াকীন। এই ইয়াকীনই দৃঢ় সবরের চালিকা শক্তি। কিন্তু এমন ব্যক্তি খুবই কম যাকে ইয়াকীন এবং দৃঢ় সবর প্রদান করা হয়েছে। (কূতুল কুলূব : ১ : ৯৪)

দুই. দীনি প্রেরণার মধ্যে শয়তানি প্রেরণাকে ধ্বংস করার অভ্যাস ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে গড়ে তোলা। এক পর্যায়ে সে বিজয়ের স্বাদ উপভোগ করবে। তখন সে সাহসী হয়ে উঠবে এবং শয়তানি প্রেরণার সঙ্গে

মোকাবেলার শক্তি ধারণ করবে। কেননা, অভ্যাস ও দক্ষতা আমলের শক্তিকে সুদৃঢ় করে দেয়। এ জন্যই যারা পরিশ্রমের কাজ করে, যেমন শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক, তারা আতর বিক্রেতা, ফকিহ ও সাধু ব্যক্তিদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। কেননা এ শ্রেণির লোকদের শক্তি অভ্যাস ও দক্ষতা দ্বারা দৃঢ় হয় না।

এ দুটি প্রতিশ্রুতির মধ্যে প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে, যেমন কুস্তিগীরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে, যদি প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে পারে তবে অনেক পুরস্কার পাবে। যেমন, ফেরাউন হযরত মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে জাদুকরদের বলেছিল,

إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ.

(তোমরা বিজয়ী হতে পারলে) তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা শুআরা : ৪২)

দ্বিতীয় চিকিৎসা হচ্ছে, যেমন কোনো বালককে কুস্তি শেখানোর উদ্দেশ্য হলে শৈশব থেকেই তাকে এ বিদ্যার আবশ্যকীয় বিষয়াদিতে অভ্যস্ত করে তোলা হয়, যাতে কুস্তির প্রতি তার আগ্রহ বাড়ে এবং শক্তি ও সাহসিকতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি ধৈর্য সহকারে সাধনাই বর্জন করবে, তার মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা প্রশমিত হয়ে পড়বে এবং সে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী হতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি নিজেকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গড়ে তোলে, সে যখন ইচ্ছা প্রবৃত্তির ওপর বিজয় লাভ করতে পারবে।

এই চিকিৎসা পদ্ধতি ধৈর্যের সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তা পরিপূর্ণ করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হলো নফসকে কুমন্ত্রণা থেকে নিবৃত্ত করা। যে ব্যক্তি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তিকে দমন করবে, নির্জনবাসকে প্রাধান্য দেবে এবং আল্লাহ তাআলার যিকির ও ফিকিরের জন্য মুরাকাবা করবে তার জন্য এই চিকিৎসা বেশি কঠিন। কেননা কুমন্ত্রণা তার মন বিক্ষিপ্ত করে দিবে। এর একমাত্র চিকিৎসা হলো বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা। বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পরিজন নাম-জশ সব ছেড়ে যাওয়া। সামান্য পরিমাণ খোরাকের ওপর তুষ্ট হয়ে যাওয়া।

কেবল এতটুকুই যথেষ্ট নয়। এরপর সমস্ত চিন্তাভাবনা এক আল্লাহর দিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এক আল্লাহর চিন্তা অন্তরে অবস্থান গ্রহণ করলে তখন আর অন্য কোনো চিন্তা থাকবে না। আসমান জমিনের ঊর্ধ্বলোকে অন্তরের পরিভ্রমণ শুরু হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার আশ্চর্যজনক সব সৃষ্টি তার দৃষ্টিগোচর হবে। মারেফাতের দরজাগুলো তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। অন্তরের অবস্থা যখন এমন হবে তখন নফসের কুমন্ত্রণা আর শয়তানের ওয়াসওয়াসা প্রতিহত করা সম্ভব হবে।

অন্তরের পরিভ্রমণ না হলে কেবল নফল নামায, যিকির-আযকার এবং তিলাওয়াত দিয়ে উপকৃত হওয়া যাবে না বরং এসব আমলের সঙ্গে অন্তরের একাগ্রতাও জরুরি। কারণ, কুমন্ত্রণা মনের একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটায়; বাহ্যিক আমলসমূহ মুখে মুখে করা যায়।

এসব আমলের পাশাপাশি সতর্ক থাকতে হবে। কারণ সম্পূর্ণ সময় তখনও নিরাপদ হয়নি। কারণ সব সময়ই বিভিন্ন ধরনের চিন্তাভাবনা হানা দিতে থাকে। যেমন অসুস্থতা, ভয়ভীতি, মানুষ থেকে কষ্ট পাওয়া এবং কাছের মানুষের অবাধ্যতা। এসব কারণ অন্তরের ব্যস্ততার ওপর প্রভাব ফেলে এবং তাকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করে দেয়।

এগুলো হলো এক প্রকার প্রতিবন্ধকতা।

আরেক প্রকার প্রতিবন্ধকতা আছে যা প্রথম প্রকার প্রতিবন্ধকতা থেকেও অধিক প্রয়োজনীয়। সেটা হলো পানাহার, পোশাক এবং জীবনোপকরণের ব্যবস্থার প্রয়োজন। জীবন-যাপনের ব্যবস্থার দায়িত্বশীল নিজে হলে এর পিছনে সময় ব্যয় করতে হয়। আর দায়িত্বশীল অন্য কেউ হলেও খাদ্য এবং বস্ত্রের প্রয়োজন হতে মুক্তি মিলে না। এর চিন্তাও মনে আনাগোনা করতেই থাকে। পার্থিব সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার পর অধিকাংশ সময় মুক্তি মিলে যদি না কোনো দুর্ঘটনা বা বিপদাপদ না হয়। সেসময়টা অন্তর স্বচ্ছ থাকে। চিন্তাভাবনা করা সহজ হয়। আসমান-জমিনের অনেক রহস্য উন্মোচিত হয়। অন্তর যদি সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে তাহলে এর এক দশমাংশও হয় না। এই স্তরই হলো চূড়ান্ত স্তর, মানুষ আপন চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে যা আয়ত্তে আনতে পারে।

অন্তরের স্বচ্ছতা এবং রহস্য উন্মোচিত হওয়ার পরিমাণ তাকদীরের ওপর নির্ভরশীল। এর উদাহরণ হলো শিকার এবং রিজিকের মতো। যেমনটা

ভাগ্যে আছে তেমনই মিলে। কখনো দেখা যায় সামান্য পরিশ্রমে বড় শিকার পাওয়া গেছে। আবার কখনো দেখা যায় সারাদিন পরিশ্রম করেও সামান্যই ভাগ্যে জুটে। এর মধ্যে বান্দার কোনো হাত নেই। এসমস্ত ব্যবস্থাপনা দয়াময় আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণে।

হ্যাঁ, বান্দার ইচ্ছাধিকার কেবল এতটুকুই যে সে এই প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে পারে। তা এভাবে যে, দুনিয়ার দিকে আকর্ষণ করে এমন সব বস্তুর আকর্ষণ মন থেকে ছিন্ন করবে।। উপর দিক থেকে টান তখনই কার্যকর হয় যখন নিচ থেকে টান ছিন্ন হয়। নিম্ন বর্ণিত হাদিসে দুনিয়াবি সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলা হয়েছে,

إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِيْ أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، أَلَا فَتَعَرَّضُوْا لَهَا.

তোমাদের দিনগুলোতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অসংখ্য অনুগ্রহ রয়েছে। জেনে রেখো, তোমাদের অবশ্যই সেসবের মুখোমুখি হতে হবে। (মুজামে কাবীর : ১৯ : ২৩৩; তামহীদ : ৫ : ৩৩৯) এর কারণ হলো, উক্ত দান ও আকর্ষণের পিছনে আসমানি প্রেরণা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন,

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ.

আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু। (সূরা যারিয়াত : ২২) আর এটা হলো রিযিকের সর্বোচ্চ প্রকার। কারণ, আসমানের বিষয়াদি আমাদের অজানা। আমরা জানি না আল্লাহ কখন আমাদের জন্য রিযিকের ইন্তেজাম করবেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো জায়গা খালি রেখে আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা করা। সাথে সাথে সময় হওয়ার প্রতীক্ষা করা। এর উদাহরণ হলো এমন কৃষক যে জমি কর্ষণ করে আগাছা পরিষ্কার করে। তারপর তাতে বীজ ছিটিয়ে দিয়ে বৃষ্টির অপেক্ষা করে। এই বৃষ্টির অপেক্ষা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কখন বৃষ্টির ইন্তেজাম করবেন তা অজানা। তবে আল্লাহর অনুগ্রহের কাছে কৃষকের প্রত্যাশা থাকে যে তিনি কোনো বছর বৃষ্টিহীন করবেন না। এভাবে কোনো বছর, কোনো মাস এমনকি কোনো দিন এমন যায় না যেদিন আল্লাহর অনুগ্রহ এবং ঐশী আকর্ষণের প্রয়োজন থাকে না।

তদ্রূপ বান্দারও উচিত অন্তরকে প্রবৃত্তির আগাছা থেকে পরিষ্কার করা। তারপর তাতে নিয়ত এবং ইখলাসের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া। তারপর রহমতের আশা করা। বর্ষাকালে মেঘ দেখা দিলে যেভাবে বৃষ্টির দৃঢ় আশা করা হয়। বিশেষ বিশেষ সময়ে, দৃঢ় সংকল্পের মুহূর্তে এবং অন্তরের অবস্থা অনুকূলে থাকার সময় এ প্রতীক্ষা শক্তি যোগায়। যেমন আরাফার দিন, জুমার দিন এবং রমযানের দিনগুলো। কারণ সংকল্প আর বাতাস অবিরত ধারায় আল্লাহর রহমত বর্ষণের ফয়সালার কারণ। এজন্যই মানুষ যখন বৃষ্টি প্রার্থনা করে তখন মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়। আর মুষলধারায় অন্তর্জ্ঞান এবং ঊর্ধ্বজগতের জ্ঞান ভাণ্ডার হতে মারেফাতের সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করাটা অবিরত ধারায় পানির ফোঁটা পড়া এবং দূরদূরান্তের সাগর ও মেঘমালা ভেসে আসার থেকে অধিক সামঞ্জস্য রাখে।

বরং হালাত এবং কাশফ আপনার সঙ্গে আপনার অন্তরেই থাকে। আর আপনি তার থেকে উদাসীন হয়ে বিভিন্ন সম্পর্ক ও প্রবৃত্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ফলে আপনার এবং কাশফ ও হালাতের মাঝে পর্দা পড়ে যায়। সুতরাং এখন কর্তব্য হলো উক্ত পর্দা ছিন্ন করা। যাতে মারেফাতের আলোয় অন্তর আলোকিত হয়ে যায়। এটা তো স্পষ্ট যে দূরদূরান্ত থেকে পানি আনার থেকে মাটি খুঁড়ে পানি বের করা সহজ। এটা জানা হলো যে অন্তরেই মারেফাতের অবস্থান আর মানুষ উদাসীনতার কারণে একে ভুলে রয়েছে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনকে تَذْكِرَةٌ বা স্মারক নামে উল্লেখ করেছেন। যেমন এক জায়গায় বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক। (সূরা হিজর : ৯)

অন্য এক জায়গায় এসেছে,

وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ.

বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা সোয়াদ : ২৯)

আরেক আয়াতে বলেছেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

অবশ্যই আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী? (সূরা ক্বমার : ১৭)

এটা হলো প্রতিবন্ধকতা এবং কুমন্ত্রণা থেকে সবরের চিকিৎসা। এটাই সবরের সর্বশেষ স্তর।

আর সমস্ত সম্পর্ক থেকে সবর করা (ছিন্ন করা) মনের মাঝে যা উদিত হয় তার ওপর সবর করা থেকে অধিক ফযিলতপূর্ণ। জুনায়েদ (র) বলেছেন, দুনিয়া থেকে আখেরাত পরিভ্রমণ করা মুমিনের জন্য সহজ। আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের খাতিরে সৃষ্টিজগৎকে ত্যাগ করা কঠিন। নফস থেকে আল্লাহ তাআলার দিকে সফর করা ভীষণ কঠিন। তবে সবচেয়ে কঠিন হলো আল্লাহ তাআলার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করা। (আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৩২৪)

জুনায়েদ (র)-এর মতে কঠিন সবর হলো অন্তরের প্রতিবন্ধকতাসমূহ থেকে সবর করা। তারপর দ্বিতীয় কঠিন হলো সৃষ্টিজগৎকে পরিহার করা। নফসের জন্য সবচেয়ে দৃঢ় সম্পর্ক হলো সৃষ্টিজগৎ আর জশখ্যাতির সঙ্গে সম্পর্ক। নেতৃত্ব এবং পদ দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু। এটা সর্বজন পছন্দনীয় এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় হওয়ার কারণ হলো তা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার অন্যতম গুণ। অন্তর এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করার কারণ হলো অন্তরের সৃষ্টি আল্লাহ তাআলা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ.

বলে দিন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত। (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮৫)

পদের প্রতি অন্তরের আকর্ষণ থাকা নিন্দনীয় নয়। প্রকৃতপক্ষে এর নিন্দা করার কারণ হলো শয়তান এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নির্দেশের জগৎ থেকে সরিয়ে দেয় আর শয়তান সে জগতের প্রতি হিংসা পোষণ করে। তাই সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। না হয় নেতৃত্ব এবং পদ প্রকৃতপক্ষে এক সৌভাগ্য। তদ্রূপ এর আকাঙ্ক্ষাকারী আখেরাতের অন্বেষী হয়ে থাকে। তাই সে এমন নেতৃত্ব চায় যা হবে চিরস্থায়ী। সে ইজ্জত চায় অসম্মান চায় না। ভীতি নয় নিরাপত্তায় আগ্রহী হয়। সচ্ছলতা চায় দরিদ্রতা নয়। পূর্ণাঙ্গ পেতে আগ্রহী অপূর্ণাঙ্গ নয়। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য হলো নেতৃত্ব এবং পদের

বৈশিষ্ট্য। যার কামনা নিন্দনীয় হতেই পারে না; বরং প্রতিটি মানুষেরই এ অধিকার আছে যে সে এমন রাজ্যের অধিকারী হতে চাইবে যা অন্যের থাকবে না। আর যে ব্যক্তি রাজত্বের অভিলাষী হবে সে নিশ্চিতভাবেই সম্মান, মর্যাদা এবং প্রভাব প্রতিপত্তির অভিলাষী হবে। তবে মনে রাখা দরকার যে, রাজত্ব দুপ্রকার। এক প্রকার রাজত্ব বিপদাপদে ঘেরা। দ্রুতই লাভ হয়, আবার দ্রুতই হাতছাড়া হয়ে যায়। এটা হলো দুনিয়ার রাজত্ব।

আরেক প্রকার রাজত্ব আছে যা চিরস্থায়ী, অনন্তকালব্যাপী চলমান। কোনো বিপদাপদ বিশৃঙ্খলা নেই। কিন্তু এই রাজত্ব লাভ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এটা আখেরাতের বাদশাহী।

কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাবেই ত্বরাপ্রবণ। যা সামনে দেখে তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে, পরিণামের কথা ভেবেও দেখে না। শয়তান মানুষের এই দুর্বলতাটাকেই কাজে লাগায়। দুনিয়াকে শোভিত করে মানুষের সামনে উপস্থিত করে। আখেরাতের কথা ভুলিয়ে দুনিয়ার ব্যাপারে প্রবঞ্চিত করে। দুনিয়ার দিকে মানুষের মন সংযোগ করে। তাকে এ মিছে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, উভয় জগতেই বিত্তবান হওয়া যাবে।

এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে,

اَلْأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللهِ الْاَمَانِيَّ.

নির্বোধ সেই ব্যক্তি যে নিজেকে তার প্রবৃত্তির অনুসারী বানিয়ে নেয় এবং আল্লাহ তাআলার কাছে বড় বড় আশা করে। (জামে তিরমিযী : ২৪৫৯; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২৬০)

শয়তানের এই ধোঁকায় পড়ে মানুষ বোকা বনে যায়। দুনিয়ায় সম্মান ও সম্পদের পিছনে ছুটতে থাকে। আখেরাতের কথা ভুলে যায়। এই অবস্থা কুরআনে বলা হয়েছে,

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ. وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ.

না; বরং তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাসো এবং আখেরাতকে উপেক্ষা কর। (সূরা কিয়ামাহ : ২০-২১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اِنَّ هٰؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا.

এরা (কাফেররা) তো পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং তারা পরবর্তীতে আগত কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে চলে। (সূরা দাহর : ২৭)

আরেক আয়াতে এসেছে,

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ.

অতএব (হে রাসূল!) যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ আপনি তাকে উপেক্ষা করে চলুন; সে তো শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্ত। (সূরা নাজম : ২৯-৩০)

সমগ্র সৃষ্টিজগতে শয়তানের এ চক্রান্ত ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ তাআলা রাসূলগণের কাছে ফেরেশতাদের পাঠালেন। ফেরেশতারা এই ওহি নিয়ে এলেন যে, কীভাবে চিরশত্রু শয়তান এবং তার ভ্রষ্টতাকে খতম করতে হবে। তখন রাসূলগণ মানুষকে কৃত্রিম এবং অস্থায়ী রাজত্বের পরিবর্তে প্রকৃত এবং চিরস্থায়ী রাজত্ব গ্রহণের আহ্বান জানালেন। তাদের বক্তব্য (কুরআনের ভাষায়)-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ.

হে মুমিনগণ! তোমাদের কী হলো, যখন তোমাদের আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটি জড়িয়ে ধর? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অতি সামান্য। (সূরা তাওবা : ৩৮)

তাওরাত, ইনজিল, যাবুর, কুরআন এবং মুসা (আ) ও ইবরাহিম (আ)-এর ওপর যেসব সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে এর সবগুলোতেই মানুষকে চিরস্থায়ী এবং অনন্তকাল ব্যাপী চলমান রাজত্বের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। অর্থাৎ সকলেই যেমন দুনিয়ার রাজত্ব নিয়ে আখেরাতের বাদশাহ হতে পারে। দুনিয়ার রাজত্ব পাওয়ার পদ্ধতি হলো, দুনিয়ার প্রতি বিরাগভাজন হওয়া,

অল্পেতুষ্ট হওয়া প্রভৃতি। আর আখেরাতে বাদশাহ হওয়ার পদ্ধতি হলো আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের মাধ্যমে চিরস্থায়ী রাজত্ব মিলবে। এমন সম্মান মিলবে যার পর কোনো অসম্মান নেই। চোখ জুড়ানো এমন সব বস্তু সে জগতে মিলবে, যার খবর কোনো প্রাণীই জানে না।

শয়তান মানুষকে দুনিয়ার দিকে আকর্ষণ করে কারণ সে জানে দুনিয়াতে মজে গেলে আখেরাত হারাতে হবে। কারণ দুনিয়া আর আখেরাত দুই সতিনের মতো। শয়তান এটাও জানে যে, দুনিয়ার পেছনে দৌড়ালেও তার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। যদি নাগাল পাওয়া সম্ভব হতো তাহলেও শয়তান হিংসা করতো। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার রাজত্ব নানারকম ঝগড়া-বিবাদ, নোংরামি আর পেরেশানিতে ভরপুর। যশখ্যাতির বিষয়টিও এমনই। তারপর দুনিয়ার নাগাল যদি পাওয়াও যায়, সমস্ত উপকরণ যদি মিলেও যায়, তথাপি জীবন ফুরিয়ে যাবে। (আর মৃত্যুর হাত থেকে কারও নিস্তার নেই।) এই কথাই কুরআনে এসেছে,

حَتّٰٓى اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَا ۙ اَتٰهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ.

অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীগণ মনে করে তা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি তা কর্তিত ফসলের ন্যায় এমনভাবে নির্মূল করে দিই, যেন গতকালও তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। (সূরা ইউনুস : ২৪)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেছেন,

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ.

তাদের নিকট পার্থিব জীবনের উপমা পেশ করুন, তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। তা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। (সূরা কাহফ : ৪৫)

দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য তখনই হবে যখন উপস্থিত রাজত্ব থেকে বিমুখ হবে। তখন শয়তান তাকে হিংসা করে এই বৈরাগ্য থেকে ফিরিয়ে রাখতে তৎপর হবে। আর বৈরাগ্যের অর্থ হলো প্রবৃত্তি এবং ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে দীন এবং ঈমানের ইঙ্গিতের বশীভূত করে দেওয়া। এটাই হলো প্রকৃত রাজত্ব। এর মাধ্যমেই মানুষ স্বাধীনতা লাভ করে। প্রবৃত্তি প্রবল হলে মানুষ লজ্জাস্থান, পেট এবং অন্যান্য ইচ্ছার দাসে পরিণত হয়। তখন সে চতুষ্পদ প্রাণির মতো বশীভূত হয়ে যায়। যে প্রাণিকে গলায় দড়ি দিয়ে যেদিকে ইচ্ছা টানা-হেঁচড়া করা যায়।

আপসোস, মানুষ কী পরিমাণ ধোঁকায় পড়ে আছে! বেচারা চাকর হয়ে ভাবছে, সে বুঝি রাজত্ব পেয়ে গেছে। প্রবৃত্তির দাস হয়ে মনে করছে, সে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করেছে। এমন ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই লাঞ্ছিত হয়।

জনৈক বাদশাহ এক দুনিয়া বিরাগী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, আপনার কি কোনো প্রয়োজন আছে? (থাকলে আমি তা পূরণ করে দেব।) দুনিয়া বিরাগী ব্যক্তিটি বললেন, আমি কীভাবে আপনাকে প্রয়োজন পূরণ করে দিতে বলবো, অথচ আমার রাজত্ব আপনার রাজত্ব থেকে বড়। বাদশাহ বললেন, আমার রাজত্ব অপেক্ষা আপনার রাজত্ব বড় কেমন করে? দরবেশ ব্যক্তিটি বললেন, আপনি যার ভৃত্য সে আমার ভৃত্য। বাদশাহ বললেন, তা আবার কেমন করে? দরবেশ বললেন, আপনি তো আপানার প্রবৃত্তি, ক্রোধ, লজ্জাস্থান এবং উদরের গোলামি করেন। আর এরা সবাই আমার গোলাম। এই হলো দুনিয়ার রাজত্ব। এই রাজত্বের বিনিময়েই আখেরাতের রাজত্ব মিলবে। যারা দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে আছে তারা দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়টিই বরবাদ করেছে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তাআলার তাওফিকে সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর অটল আছে, তারা উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করবে।

পাঠক ইতোমধ্যেই রাজত্ব ও প্রভুত্ব এবং বশীভূতকরণ ও দাসত্বের পরিচয় জানতে পেরেছেন। এবং এটাও জানতে পেরেছেন, এক্ষেত্রে মানুষ কী ভুল করে থাকে ও শয়তান কীভাবে ধোঁকা দেয় এবং সত্য থেকে বিচ্যুত করে। সুতরাং আপনি সহজেই রাজত্ব ও নাম যশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবেন। এসব হাত ছাড়া হয়ে গেলে আপনি সহজেই সবর করতে

পারবেন। এগুলো বর্জন করার মাধ্যমে আপনি ইহজগতের রাজত্ব লাভ করবেন। আবার আখেরাতেও রাজত্ব লাভ করার আশাবাদী হতে পারেন।

যদি কারও অন্তর যশখ্যাতির প্রতি আসক্ত হয়ে যায় এবং কর্তৃত্বের প্রতি ভালোবাসার কারণে তা অভ্যাসে রূপ নেয়, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য শুধু জানাই যথেষ্ট নয়; বরং জানার সঙ্গে সঙ্গে কার্যত অনুশীলন করাটাও তার জন্য অপরিহার্য। এক্ষেত্রে ব্যক্তি তিনভাবে অনুশীলন করবে।

প্রথমত, এমন ব্যক্তি যশখ্যাতির স্থান থেকে দূরে সরে যাবে। যাতে যশখ্যাতির উপলক্ষ্যও তার নজরে না পড়ে। উপলক্ষ্য নজরে পড়লে সবর করা তার জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে। যেমন প্রবৃত্তির তাড়না অধিক এমন ব্যক্তিকে উত্তেজক ছবি দেখতেও নিষেধ করা হয়েছে। যে যশখ্যাতি থেকে বাঁচার জন্য দূরে সরে না যায় সে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত প্রশস্ত ভূমি পেয়েও না শোকরি করল। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেছেন,

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا.

আল্লাহর জমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যে, সেখানে তোমরা হিজরত করতে? (সূরা নিসা : ৯৭)

দ্বিতীয়ত, এমন ব্যক্তি অভ্যাসের বিপরীত কাজ করবে। কৃত্রিমতার অভ্যাস থাকলে বর্জন করবে। সাদামাঠা জীবন যাপন করবে। বিনয়ী হবে। খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, ওঠাবসা সর্বক্ষেত্রে আগের অভ্যাস পরিবর্তন করে ফেলবে। পরিবর্তন এমনভাবে করবে যাতে পুরোনো অভ্যাস বিস্মৃত হয়ে নতুন অভ্যাস মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায়। কারণ বৈপরীত্যই একমাত্র চিকিৎসা।

তৃতীয়ত, বৈপরীত্যের মধ্যে নম্রতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে। অর্থাৎ উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্তের পর্যায়ে একবারে চলে যাবে না। কারণ, মানুষ স্বভাবগতভাবেই নিরীহ। স্বভাবে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন আনতে হয়। সুতরাং অভ্যাসের কিছু অংশ ছাড়বে আর কিছু অংশ দিয়ে নফসকে সান্ত্বনা দেবে। নফস শান্ত হয়ে গেলে আবার কিছু অংশের প্রতি মন দিয়ে সেটাকে ত্যাগ করবে। এভাবে ধীরে ধীরে অভ্যাস পরিবর্তন করবে।

এই ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِنَّ هٰذَا الدِّيْنَ مَتِيْنٌ، فَأَوْغِلْ فِيْهِ بِرِفْقٍ، وَلَا تُبَغِّضْ إِلٰى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللهِ، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقٰى.

এই দীন মজবুত (দুর্গের মতো)। সুতরাং তাতে নম্রতার সঙ্গে প্রবেশ করো। তোমার নফসের কাছে আল্লাহ তাআলার ইবাদতকে অসহনীয় করে ফেলবে না। কারণ, যে ব্যক্তি বাহনের পিঠে সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয় সে মনযিলে পৌঁছতে পারে না। আবার তার বাহনও রক্ষা পায় না। (শুআবুল ঈমান : ৩৬০২)

অন্য এক হাদিসে এসেছে,

لَا تُشَادُّوْا هٰذَا الدِّيْنَ. فَإِنَّ مَنْ يُّشَادَّهُ يَغْلِبْهُ.

এই দীনের সাথে পাল্লা দিয়ো না। যে এর সাথে পাল্লা দিতে যাবে সে হেরে যাবে। (সহিহ বুখারী : ৩৯)

সুতরাং কুমন্ত্রণা, প্রবৃত্তি এবং যশখ্যাতির সবরের চিকিৎসা করার ব্যাপারে যা আমরা উল্লেখ করেছি তা ওইসমস্ত নিয়মকানুনের সঙ্গে যুক্ত করে নিন যা আত্মসংশোধনের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। এটাকে আপনি মূলনীতি বানিয়ে নিন। যাতে আপনি পূর্বোল্লিখিত সকল প্রকার সবরের চিকিৎসা জানতে পারেন। নাহলে প্রতিটি প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হবে। ফলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে করার প্রতি লক্ষ রাখবে সে এমন পর্যায়ে উন্নীত হবে যে, সবর ভিন্ন তার কাছে ভালো লাগবে না। ইতঃপূর্বে যেমন সবর করতে ভালো লাগতো না।

মোটকথা, বিষয়টি উলটে যাবে। পছন্দনীয় বিষয় অপছন্দনীয় হয়ে যাবে। আর অপছন্দনীয় বিষয় এতটাই পছন্দনীয় হয়ে যাবে যে তা ছাড়া টিকতে পারবে না। এই বিষয়টি বুঝতে হলে অভিজ্ঞতা আর রুচির প্রয়োজন। একটি দৃষ্টান্ত বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলবে। যেমন একটি বাচ্চাকে প্রাথমিকভাবে জোর করে খেলা ছেড়ে পড়তে বসানো হয়। খেলা ছেড়ে পড়ায় লেগে থাকা বাচ্চার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। এক সময় এমন অবস্থা হয় যে পড়ালেখা ছাড়া তার ভালোই লাগে না।

এক বুযুর্গ একবার শিবলী (র)-কে সবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন প্রকার সবর সবচেয়ে বেশি কঠিন? আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সবর

করা? শিবলী (র) বললেন, না। বুযুর্গ বললেন, আল্লাহ তাআলার খাতিরে সবর করা? শিবলী (র) বললেন, না। বুযুর্গ বললেন, তবে কি আল্লাহ তাআলার সাথে সবর করা? শিবলী (র) বললেন, না। বুযুর্গ প্রশ্ন করলেন, তাহলে কোনটা?

শিবলী (র) বললেন, আল্লাহ তাআলা থেকে সবর করা। এই বলে শিবলী (র) এত জোরে চিৎকার করে উঠলেন যে, তাঁর রূহ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। (আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৩২৬)

আল্লাহ তাআলার বাণী,

اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا.

তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, (মোকাবেলায়) দৃঢ়তা অবলম্বন করো এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থির থাকো। (সূরা আলে ইমরান : ২০০)

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, প্রথম স্তর হলো সীমান্ত রক্ষায় স্থির থাকা, তারপর হলো সবরের প্রতিযোগিতা করা, তারপর হলো সবর করা। (আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৩২৭)

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলার জন্য সবর করা কষ্টকর। আল্লাহ তাআলার সাহায্যে সবর করা মানে অস্তিত্ববান থাকা, আল্লাহ তাআলার সাথে সবর করা হলো বিশ্বস্ততা আর আল্লাহ তাআলা থেকে সবর করা (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা থেকে সরে যাওয়া) হলো রুক্ষতা (নিন্দনীয়)। (আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৩২৭)

এ অর্থেই কবি বলেন,

وَالصَّبْرُ عَنْكَ فَمَذْمُوْمٌ عَوَاقِبُهُ * وَالصَّبْرُ فِيْ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ مَحْمُوْدٌ.

তোমার থেকে সবর করা পরিণতির বিচারে নিন্দনীয়। আর অন্য সবার ক্ষেত্রে সবর করা প্রশংসনীয়।

আরেক কবি বলেন,

اَلصَّبْرُ يَجْمُلُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا * إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَجْمُلُ.

সকল ক্ষেত্রে সবর করা প্রশংসনীয়, কেবল তোমার ক্ষেত্রে সবর করা প্রশংসনীয় নয়।

দ্বিতীয় পর্ব : শোকর

এ পর্বে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে—

প্রথম পরিচ্ছেদ : শোকরের ফযিলত, স্বরূপ, প্রকার এবং বিধান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শোকরযোগ্য বস্তু।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সবর উত্তম না শোকর?

প্রথম পরিচ্ছেদ
শোকরের ফযিলত, স্বরূপ, প্রকার এবং বিধান

শোকরের ফযিলত

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে শোকরকে যিকিরের সাথে বর্ণনা করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে,

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

বস্তুত আল্লাহর স্মরণই শ্রেষ্ঠতর। (সূরা আনকাবুত : ৪৫)

ইরশাদ হয়েছে—

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ.

সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো না। (সূরা বাকারা : ১৫২)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ.

তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ও ঈমান আনো, তাহলে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন? (সূরা নিসা : ১৪৭)

এক আয়াতে আছে—

وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ.

আর শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করব। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৫)

আল্লাহ তাআলা অভিশপ্ত ইবলিসের উক্তি উল্লেখ করেছেন—

لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ.

নিশ্চয় আমিও আপনার সরল পথে মানুষের জন্য ওত পেতে থাকবো। (সূরা আরাফ : ১৬)

তাফসীরকারকদের অনেকেই বলেছেন, এখানে সরল পথ দ্বারা শোকরকারীদের পথকে বোঝানো হয়েছে।

শোকরের মর্যাদা অনেক উঁচু হওয়ায় অভিশপ্ত ইবলিস মানুষের শোকর না করার ত্রুটির কথা উল্লেখ করে বলেছে,

وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ.

এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (সূরা আরাফ : ১৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ.

আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। (সূরা সাবা : ১৩)

শোকরের সাথে তিনি নিয়ামত বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিতরূপে উল্লেখ করেছেন; এতে কোনো ব্যতিক্রম বর্ণনা করেননি। যেমন তিনি বলেছেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ.

তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদের অবশ্যই বাড়িয়ে দেব। (সূরা ইবরাহিম : ৭)

অথচ অন্য পাঁচটি নিয়ামত কবুল করার বিষয়ে ব্যতিক্রম বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে, সম্পদশালী করা, দুআ কবুল করা, রিজিক, ক্ষমা এবং তাওবা। ইরশাদ হয়েছে—

فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَآءَ.

তবে আল্লাহ চাইলে তাঁর নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন। (সূরা তাওবা : ২৮)

তিনি আরও বলেছেন,

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ.

তোমরা যে দুঃখের জন্য তাঁকে ডাকছো, তিনি চাইলে তোমাদের সেই দুঃখ দূর করবেন। (সূরা আনআম : ৪১)

يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত রিজিক দান করেন। (সূরা বাকারা : ২১২)

وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ.

তা ভিন্ন অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা নিসা : ৪৮)

وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ.

আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন। (সূরা তাওবা : ১৫) এটি প্রভুত্বের একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ.

আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল। (সূরা তাগাবুন : ১৭)

এছাড়া জান্নাতবাসীদের প্রথম কথা হবে শোকর। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ.

তারা প্রবেশ করে বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। (সূরা যুমার : ৭৪)

وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

তাদের শেষ ধ্বনি হবে— 'সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর'! (সূরা ইউনুস : ১০)

হাদিসেও শোকরের বহু ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ.

আহার করে শোকর আদায়কারী ধৈর্যশীল রোযাদারের ন্যায়। (জামে তিরমিযী : ২৪৮৬; সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৭৬৪)

হযরত আতা (র) বর্ণনা করেন, একদিন আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর দরবারে গিয়ে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অধিক বিস্ময়কর যে অবস্থাটি দেখেছেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি তখন কেঁদে কেঁদে বললেন, তাঁর কোন অবস্থাটি বিস্ময়কর ছিল না? এক রাতে তিনি আমার কাছে আসলেন এবং বিছানায় অথবা লেপের নিচে আমার সঙ্গে শয়ন করলেন। এক সময় তাঁর দেহ আমার শরীর স্পর্শ করল। তিনি বলে উঠলেন, হে আবু বকরের কন্যা! আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম, আমি তো আপনার সঙ্গে থাকতেই পছন্দ করি। তবে আমি আপনার ইচ্ছার অনুগামী। আমি তাঁকে অনুমতি দিয়ে দিলাম। তিনি পানির পাত্রের নিকট চলে গেলেন এবং সামান্য পানি দিয়ে অযু করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন, এমনকি অশ্রু তাঁর বুকে প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর রুকুতে, সেজদায় এবং সেজদা থেকে মাথা তুলে খুব কাঁদলেন। তিনি এভাবে কাঁদতেই থাকলেন, অবশেষে বিলাল (রা) এসে তাঁকে ফজরের নামাযের কথা জানালেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তো আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারপরও আপনার কাঁদার কারণ কী? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? আর আমি ক্রন্দন করব না কেন যেখানে আল্লাহ আমার প্রতি এই আয়াত নাযিল করেছেন,

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ....

(সহিহ মুসলিম : ২৮২০; সহিহ ইবনে হিব্বান : ২৬০; আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৩১০)

এ থেকে জানা যায়, ক্রন্দন কখনো শেষ হওয়া উচিত নয়। এ রহস্যের প্রতিই নিম্নোক্ত বর্ণনার ইঙ্গিত রয়েছে।

একবার একজন নবী রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পথে ছোটো একটি পাথর দেখতে পান। পাথর থেকে প্রচুর পানি বের হচ্ছিল। দেখে তিনি অবাক

হন। আল্লাহ তাআলা পাথরকে কথা বলার ক্ষমতা দান করলেন। সে বলল, যেদিন থেকে আমি আল্লাহর এই কালাম শুনেছি যে,

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.

মানুষ ও পাথর হবে জাহান্নামের ইন্ধন। (সূরা বাকারা : ২৪) সেদিন থেকেই আমি ভয়ে কাঁদছি। সেই নবী সাথে সাথে আল্লাহর নিকট দুআ করলেন, হে আল্লাহ! এই পাথরকে আপনি আগুন থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করে পাথরকে নাজাত দিলেন। নবী (আ) পাথরকে নাজাতের সুসংবাদ জানিয়ে চলে গেলেন। দীর্ঘদিন পর তিনি সে পথে এসে পাথরটিকে পূর্বের মতো কাঁদতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখন কাঁদছো কেন? সে বলল, পূর্বের ক্রন্দনের কারণ ছিল ভয়। আর এ ক্রন্দন কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের। (আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৩১৪)

মানুষের অন্তরও পাথরের ন্যায় অথবা পাথরের চেয়েও কঠিন। তাই এর কঠোরতা ভয় ও কৃতজ্ঞ অবস্থায় কান্না ছাড়া দূর হবে না। এক হাদিসে নবী কারীম (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ডাক দেওয়া হবে— যারা আল্লাহ তাআলার অধিক প্রশংসাকারী, তারা উঠো। এরপর একটি দল উঠবে, তাদের জন্য পতাকা স্থাপন করা হবে, অতঃপর তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, অধিক প্রশংসাকারী কারা? নবী কারীম (স) বলেন, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। (তাবারানি) আরেক রেওয়ায়েতে আছে, যারা সুখে ও দুঃখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। (আল-মুজামুল কাবীর : ১৯/১২)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রশংসা দয়াময় আল্লাহর চাদরতুল্য। (কূতুল কুলূব : ১ : ২০৫; তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম : ১ : ২৬)

আল্লাহ তাআলা আইয়ুব (আ)-এর কাছে ওহি পাঠালেন, আমি বান্দার শোকরের বিনিময়ে সন্তুষ্টি প্রদান করি। অর্থাৎ বান্দা শোকর করলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে যান। যেমনটা সূরা নিসার ১৪৭নং আয়াতে বলা হয়েছে,

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ.

তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ও ঈমান আনো, তাহলে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন? (সূরা নিসা : ১৪৭)

আল্লাহ তাআলা আইয়ুব (আ)-এর কাছে সবরকারীদের অবস্থা বর্ণনা করে ওহি পাঠালেন, 'তাদের ঠিকানা হবে দারুস সালাম নামক জান্নাত। তারা যখন তাতে প্রবেশ করবে তখন আমি তাদেরকে শ্রেষ্ঠ কথা শোকর করা শিখিয়ে দেব। যখন তারা শোকর করবে তখন আমি তাদের থেকে আরও চাইব। আর যখন তারা আমার দীদার লাভ করবে, তখন আমি তাদের ওপর নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দেব। (কূতুল কুলূব : ১ : ২০৪)

যাকাত না দিয়ে সম্পদ জমা করে রাখার ভয়াবহতা সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলে ওমর (রা) জানতে চাইলেন, তাহলে আমরা কোন ধরনের সম্পদ সঞ্চয় করব? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا.

তোমরা যিকিরকারী জিহ্বা এবং শোকরকারী অন্তর সঞ্চয় করো। (জামে তিরমিযী : ৩০৯৪; সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৫৬)

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) মাল সঞ্চয় করার পরিবর্তে শোকরগুজার অন্তর তৈরি করার ওপর জোর দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন,

اَلشُّكْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ.

শোকর হলো ঈমানের অর্ধেক। (কূতুল কুলূব : ১ : ২০৩)

শোকরের মর্ম ও পরিচয়

সালেকীনের মাকামসমূহের একটি হচ্ছে শোকর। এই শোকর তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত— ইলম, হালত ও আমল। ইলম থেকে হালত এবং হালত থেকে আমল সৃষ্টি হয়। ইলম হচ্ছে মূল; ইলম হচ্ছে সকল নিয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা। হালত হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামতে সন্তুষ্ট হওয়া এবং আমলের অর্থ হচ্ছে, যা আল্লাহর উদ্দেশ্য ও প্রিয়, তাতে অবিচল থাকা। আমল অন্তর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং জিহ্বার সাথেও সম্পৃক্ত। শোকরের পরিচয় ভালোভাবে জানার জন্য সবগুলোর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রথম বিষয় : ইলম

ইলম দ্বারা তিনটি বিষয় জানা উদ্দেশ্য। ১. স্বয়ং নিয়ামত। ২. এটি তার জন্য নিয়ামত হওয়ার কারণ। ৩. নিয়ামতদাতার সত্তা ও গুণাবলি। নিয়ামতদাতা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে এই জ্ঞান রাখতে হবে যে, সকল নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। তিনিই প্রকৃত নিয়ামতদাতা। মধ্যবর্তী সকলেই তাঁর অনুগত মাত্র, যারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য।

এই জ্ঞানের অবস্থান হলো আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা এবং তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তির পর। মর্যাদাগতভাবে ঈমানের পরিচয়ের মধ্যে প্রথম স্থানে আছে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা। অর্থাৎ ত্রুটিমুক্ত সত্তা কেবল তিনিই। এরপর আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি। অর্থাৎ জগতে যা কিছু আছে সব একমাত্র তাঁরই সৃষ্টি। তিনিই সমস্ত নিয়ামত প্রদান করেছেন। এই জ্ঞানের অবস্থান পূর্বের দুই জ্ঞানের পরে হলেও এর মর্যাদা সেগুলোর পূর্বে। কারণ এর মধ্যে পবিত্রতা বর্ণনা ও একত্ববাদের স্বীকারোক্তি ছাড়াও পূর্ণাঙ্গ শক্তি ও একাই সৃষ্টি করার অর্থও পাওয়া যায়। যেমন এক হাদিস থেকে জানা যায়, 'সুবহানাল্লাহ' বললে দশটি, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে বিশটি এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে ত্রিশটি নেকি মিলবে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২০৫)

আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হলো সর্বোত্তম যিকির আর 'আলহামদুলিল্লাহ' হলো সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ। (জামে তিরমিযী : ৩৩৮৩; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৯০০)

অন্য হাদিসে এসেছে,

لَيْسَ شَيْءٌ فِي الْأَذْكَارِ يُضَاعَفُ كَمَا يُضَاعَفُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

'আলহামদুলিল্লাহ'র সওয়াব যেভাবে দ্বিগুণ করে দেওয়া হয় অন্য কোনো যিকিরের সওয়াব সেভাবে দ্বিগুণ করা হয় না। (কূতুল কুলূব : ১ : ২০৫)

এমনটা ভাবা ভুল হবে, উল্লিখিত সওয়াব কেবল মুখ নাড়ানোর মাধ্যমে অর্জিত হয়ে যাবে; এর মর্ম অনুধাবন করার প্রয়োজন নেই। বস্তুত

'সুবহানাল্লাহ' হলো আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হলো আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের বর্ণনা, 'আলহামদুলিল্লাহ' এ কথা প্রমাণ করে সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। এই সমস্ত নেকি তখনই অর্জিত হবে যখন এই ইলম থাকবে। শুধু মুখ নাড়ানোর মাধ্যমে নয়। এই তিনটি বিষয় হলো ঈমান এবং ইয়াকিনের দরজাস্বরূপ।

এখন জানা উচিত যে, এই জ্ঞান তখনই পূর্ণ হবে, যখন বান্দার কাজকর্ম শিরকমুক্ত হবে। যেমন, এক ব্যক্তিকে কোনো বাদশাহ কোনো পুরস্কার দান করল। এখন এই পুরস্কার পাওয়া অথবা তার কাছে পৌঁছার ব্যাপারে সে যদি বাদশার প্রতিনিধি অথবা মন্ত্রীও অন্তর্ভুক্ত আছে বলে ধারণা করে, তাহলে সে এই নিয়ামতে বাদশার সাথে অন্যকেও শরিক করল এবং এই নিয়ামত যে সম্পূর্ণরূপে বাদশার পক্ষ থেকে প্রদত্ত, তা সে স্বীকার করলো না। বরং মনে করল যে, বাদশাহ এবং মন্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে সে পুরস্কার পেয়েছে। ফলে, তার আনন্দও উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাবে। অবশ্য যদি সে বিশ্বাস করে, যে নিয়ামত সে পেয়েছে, তা বাদশার নির্দেশের কারণে, যা তিনি নিজের কলম দ্বারা কাগজে লিখেছেন, তাহলে এতে শিরক হবে না এবং পূর্ণরূপে কৃতজ্ঞতা আদায়ে ত্রুটি থাকবে না। কারণ, সে তো কলম ও কাগজের শোকর করে না এবং এগুলো নিয়ে খুশিও হয় না; বরং খুশি হয় নিয়ামত নিয়ে। এমনিভাবে যদি সে বাদশার মন্ত্রীকেও মনে করে যে, সে বাদশার চাপ ও আদেশের কারণে দেয়—নিজের ক্ষমতা থাকলে কিছুই দিতো না, তাহলে এতে শিরক হবে না। এখানে মন্ত্রী কাগজ ও কলমের মতোই গণ্য হবে।

একইভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে চিনবে এবং তাঁর কর্মকে বুঝবে, সে জানতে পারবে, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্র সবই তাঁর হুকুমের অধীন। সুতরাং আল্লাহর নিয়ামত যদি কারও নিকট অন্যের মাধ্যমে পৌঁছে, তাহলে বুঝতে হবে, সে তা পৌঁছাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধ্য ছিল। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন যে, এই নিয়ামতটি অমুকের নিকট পৌঁছানোর মধ্যেই তার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত। এরপর তার এ কাজটি না করার কোনো অজুহাতই থাকতে পারে না।

সুতরাং এটা বুঝতে হবে, উক্ত ব্যক্তি আপনাকে কিছু দিয়ে থাকলে তা নিজের প্রয়োজনেই দিয়েছে; আপনার প্রয়োজনে দিয়েছে এমন নয়।

আপনার উপকারের মধ্যে নিজের স্বার্থ না থাকলে আপনার উপকার করতো না। প্রকৃত অনুগ্রহকারী তো সেই মহান সত্তা যিনি তাকে আপনার ওপর অনুগ্রহ করতে বাধ্য করেছেন। তিনিই উক্ত ব্যক্তির অন্তরে ইচ্ছাশক্তির সঞ্চয় করায় সে আপনার কাছে তা পৌছাতে বাধ্য হয়েছে।

সুতরাং বান্দা যখন জানবে যে, আল্লাহ তাআলাই প্রকৃত নিয়ামতদাতা তখন সে তাওহিদে বিশ্বাসী হবে এবং আল্লাহ তাআলারই শোকর করতে সক্ষম হবে। বরং শুধু এই জানার কারণেই সে শোকরকারী হয়ে যাবে। হযরত মূসা (আ) মোনাজাতে আল্লাহর দরবারে আরজ করেন, হে প্রভু! আপনি আদমকে স্বহস্তে সৃষ্টি করে কত নিয়ামত দান করেছেন। সে আপনার শোকর কীভাবে আদায় করল? আল্লাহ বলেন, আদম এ সকল নিয়ামতকে আমারই পক্ষ থেকে বিশ্বাস করেছে। আর এ বিশ্বাসই ছিল তার শোকর আদায়। অতএব বাহ্যিক নিয়ামতদাতাকে নিয়ে আনন্দিত হওয়া মানুষের উচিত নয়; বরং প্রকৃত নিয়ামতদাতারও ধ্যান করা উচিত। সুতরাং সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, এটা বিশ্বাস করতে হবে। যদি এক্ষেত্রে কোনোরূপ সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটে, তাহলে নিয়ামত ও নিয়ামতদাতা সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে না।

কেননা, ইলমের ত্রুটির কারণে হালতও ত্রুটিযুক্ত হবে এবং হালত ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে আমলও ত্রুটিযুক্ত থেকে যাবে।

দ্বিতীয় বিষয় : ইলম দ্বারা অর্জিত হালত

নিয়ামতদাতার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া এবং তাঁর প্রতি বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা। ইলমের মতো এটাও একটি স্বতন্ত্র শোকর। এই শোকর তখনই হয়, যখন তার শর্ত যথাযথ আদায় হয়। শর্ত হলো, সন্তুষ্টি শুধু নিয়ামতদাতার প্রতি হতে হবে; নিয়ামত ও নিয়ামত দানের প্রতি নয়। বিষয়টি বুঝতে হয়তো কষ্ট হবে। তাই একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টি উপস্থাপন করবো।

যেমন, একজন বাদশাহ ভ্রমণে বের হওয়ার পূর্বক্ষণে এক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া দান করল। লোকটি এই ঘোড়া পেয়ে কয়েকভাবে আনন্দিত হবে। প্রথমত শুধু ঘোড়ার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। কেননা, এটা উপকারী জিনিস, আরোহণ উপযোগী, উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক এবং শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভূত। এ

ধরনের সন্তুষ্ট সেই ব্যক্তি হবে, বাদশার প্রতি যার কোনো কৌতূহল নেই—শুধুমাত্র ঘোড়ার প্রতিই কৌতূহল। এমনকি, যদি সে এই ঘোড়াটি মরুভূমিতেও পেতো, তবু এতটুকুতেই সন্তুষ্ট হতো। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র বাদশার দানের কারণে সন্তুষ্ট হবে। কেননা, এতে বোঝা যায়, এই ব্যক্তির প্রতি বাদশার করুণা রয়েছে। সে যদি এই ঘোড়াটি মরুভূমিতে পেয়ে যেত, তাহলে কখনো সন্তুষ্ট হতো না। কেননা, এতে বাদশার অন্তরে স্থান পাওয়ার উদ্দেশ্যটি অর্জিত হতো না। তৃতীয়ত, সন্তুষ্টির কারণ হলো, সে আরোহণ করে সফরের কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে এবং বাদশার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সেবা করবে। এমনকি, বাদশার মন্ত্রী হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকতে পারে।

উল্লিখিত তিন প্রকারের প্রথম প্রকারে শোকরের কোনো অর্থই পাওয়া যায় না। কারণ, এতে দৃষ্টি শুধু ঘোড়ার প্রতি এবং সন্তুষ্টিও ঘোড়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। সুতরাং সে ঘোড়া নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে; দাতা নিয়ে নয়। এটা ওইসব লোকের অবস্থা, যারা শুধু নিয়ামতটি সুস্বাদু ও উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হওয়ায় সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং এই স্তরটি শোকরের থেকে অনেক দূরবর্তী। দ্বিতীয় প্রকার অবশ্য শোকরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এতে মূলত নিয়ামতদাতার সত্তার দিক দিয়ে সন্তুষ্টি নেই। বরং এজন্য যে, বাদশার করুণা নিশ্চিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও নিয়ামতপ্রাপ্তির কারণ হবে। এটা সেই সৎকর্মীদের অবস্থা, যারা শাস্তির ভয়ে ও সওয়াবের আশায় আল্লাহ তাআলার শোকর ও ইবাদত করে।

তৃতীয় প্রকারে পরিপূর্ণ শোকরের অর্থ পাওয়া যায়। এতে নিয়ামতে সন্তুষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও দীদার লাভ করে ধন্য হওয়া। আর এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদার স্তর। এর পরিচয় হলো, মানুষ আখেরাত অর্জনে সহায়ক বিষয়াদি ব্যতীত অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হবে না এবং যে বিষয় আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয় এবং তাঁর পথে প্রতিবন্ধক হয়, তাতে সে কষ্ট পাবে। এ কারণে উপভোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উল্লিখিত ব্যক্তি নিয়ামতের প্রত্যাশা করে না। (যেমন উল্লিখিত উদাহরণে ঘোড়াপ্রাপ্ত ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে।) সে ঘোড়াটি পছন্দ করার কারণ তা আরোহীকে বাদশার সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। ফলে বাদশার দর্শন এবং সান্নিধ্য সে উপভোগ করবে।

এজন্যই হযরত শিবলী (র) বলেন, শোকরের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়ামতদাতা আল্লাহর দীদার লাভ করা, নিয়ামতের দীদার নয়। (আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৩১২)

হযরত ইবরাহিম খাওয়াস (র) বলেন, সাধারণ মানুষ পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির উপর শোকর আদায় করে; কিন্তু বুযুর্গগণ অন্তরের হালতের উপর আল্লাহর শোকর আদায় করেন। (আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৩১২)

এই মর্তবা এমন লোকদের বোধগম্য নয়, যারা আনন্দ ও খুশিকে কেবল উদরপূর্তি, যৌনতৃপ্তি, রং-তামাশা, হইহুল্লোড় ইত্যাদিতে সীমিত মনে করে। অন্তর সবরকমের স্বাদ উপভোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্তর যদি সুস্থ হয়ে থাকে তাহলে কেবল আল্লাহ তাআলার যিকির, মারেফাত এবং তাঁর দীদারের মাধ্যমেই স্বাদ উপভোগ করে থাকে। পক্ষান্তরে অন্তর সুস্থ না হলে অন্য কোনো কিছুতে স্বাদ পায়। যেমন কিছু ব্যক্তি মাটি খেয়ে অভ্যস্ত, আবার কিছু অসুস্থ ব্যক্তি মিষ্টি দ্রব্য পছন্দ করে না; বরং তেতো খাবার মিষ্টি খাবারের মতো আগ্রহ নিয়ে খেয়ে থাকে। কবি বলেন,

وَمَنْ يَكُ ذَا فَمٍ مُرٍّ مَرِيْضٍ * يَجِدُ مُرًّا بِهِ الْمَاءَ الزُّلَالَا.

রোগে যার মুখ তিতা হয়ে আছে, তাকে চিনির শিরা দিলেও তা তিতাই লাগবে। (দিওয়ানে মুতানাব্বী)

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শোকর এভাবেই আদায় করতে হবে।

কেউ এই মর্তবা লাভে অক্ষম হলে তার দ্বিতীয় মর্তবা লাভে সচেষ্ট হওয়া উচিত। আর প্রথম মর্তবা তো গণনার বাইরে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মর্তবার মাঝে অনেক পার্থক্য। কেউ ঘোড়া পাওয়ার জন্য বাদশার কাছে যেতে চায়। আবার কেউ বাদশার কাছে যাওয়ার জন্য ঘোড়া চায়। সুতরাং নিয়ামত পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া আর নিয়ামতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য কামনা করা এ দুয়ের মাঝে অনেক তফাত।

আগ্রহবশত লৌকিকতা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। (ওমর (রা)-কে এক ব্যক্তি সালাম দিলে তিনি উত্তর দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছো? সে বলল, আপনার কাছে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি। ওমর (রা) বললেন, তোমার কাছে একথাই আশা করেছিলাম। (মুয়াত্তা : ২ : ৯৬১)

তৃতীয় বিষয় : নিয়ামতদাতার পরিচয় জানার কারণে যে আনন্দ লাভ হয়, সে অনুযায়ী আমল করা

এই আমল অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে সংযুক্ত। অন্তরের আমল হচ্ছে সকল মানুষের জন্য কল্যাণকামিতা ও উত্তম আচরণের মনোভাব পোষণ করা। জিহ্বার আমল হচ্ছে প্রশংসাসূচক ভাষায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আর শরীরের আমল হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নিয়ামত মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যবহার করা এবং এগুলোকে তাঁর নাফরমানির কাজে ব্যবহার না করা। যেমন, চোখের আমল হলো কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি নজরে পড়লে তা গোপন করা। কানের আমল হচ্ছে, কোনো মুসলমানের কোনো দোষ শুনে থাকলে তা প্রকাশ না করা। মুখের আমল হলো, মুখে এমন ভাষা উচ্চারণ করা, যা দ্বারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। এরূপ করার হুকুমও রয়েছে। হাদিসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ? সে বলল, ভালো আছি। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে পুনরায় এই প্রশ্ন করলে সে একই উত্তর দিল। তৃতীয়বার রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশ্নের উত্তরে বলল, আল্লাহর প্রশংসা এবং শুকরিয়া, আমি ভালো আছি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমার নিকট আমি একথাই আশা করছিলাম। (কূতুল কুলূব : ১ : ২০৪; মুজামে আওসাত : ৪৩৭৪)

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ পরস্পর যে কুশল বিনিময় করতেন, তার উদ্দেশ্যও ছিল এটাই যে, কোনোভাবে মুখ থেকে আল্লাহর শোকরিয়াসূচক কথা বের হোক। যাতে করে শোকর আদায়কারী এবং জিজ্ঞাসাকারী উভয়ে আনুগত্যশীল হয়। আগ্রহবশত লৌকিকতা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

কাউকে কুশল জিজ্ঞেস করা হলে উত্তর দানের ব্যাপারে তার ইচ্ছাধিকার রয়েছে। শোকর আদায় করবে অথবা অভিযোগ জানাবে, নইলে চুপ থাকবে। এটা একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার। শোকর আদায় করলে সেটা হবে আনুগত্য। অভিযোগ করলে সেটা হবে নিকৃষ্ট অপরাধ। যে দাসের কিছুই করার ক্ষমতা নেই সে কীভাবে অভিযোগ করতে পারে? তাও আবার এমন রাজাধিরাজের বিরুদ্ধে যার নিয়ন্ত্রণে সব কিছু। সুতরাং বান্দার কর্তব্য হলো অভাব-অভিযোগ এবং কষ্টের অনুযোগ আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করা। বান্দার কাছে প্রকাশ না করা। তিনিই বিপদ

দান করেন আবার তিনিই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। মনিবের জন্য অপমানিত হওয়ার মধ্যেই গোলামের সম্মান। আর অন্যের কাছে অভিযোগ করা হলো অসম্মান। অপমানিত হওয়ার পর অন্যের কাছে নিজের অপমানের কথা বলে বেড়ানো নিকৃষ্টতর অপমান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهُ.

তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করো তারা তোমাদের রিযিক দেওয়ার কোনো ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে রিযিক কামনা করো এবং তাঁরই ইবাদত করো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (সূরা আনকাবুত : ১৭)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ.

আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো তারা তো তোমাদের মতোই বান্দা। (সূরা আরাফ : ১৯৪)

মোটকথা, মুখ দিয়ে কৃতজ্ঞতা উচ্চারণ করাও শোকর আদায়ের মধ্যে গণ্য। বর্ণিত আছে, কয়েকজন ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর দরবারে হাজির হয়। তাদের মধ্য এক যুবক কিছু বলার জন্য দণ্ডায়মান হলে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি প্রথমে কথা বলবে। তখন যুবক বলল, আমিরুল মুমিনীন! যদি সবকিছু বয়সের ওপরই নির্ভরশীল হতো, তাহলে মুসলমানদের শাসক আপনার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ হতো। খলিফা বললেন, ঠিক আছে! তুমি বলো। যুবক বলল, আমরা আপনার দরবারে কোনো দাবি নিয়ে অথবা আপনার ভয়ে আসিনি। কেননা, আপনার অনুগ্রহ আমরা ঘরে বসেই পেয়ে গেছি। আর আপনার ন্যায়পরায়ণতার কারণে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা শুধু আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে এসেছি। মৌখিক কৃতজ্ঞতা আদায় করেই আমরা চলে যাব। (তারীখে দিমাশক : ৬৮ : ১৯৪; আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৩১৪; আনসাবুল আশরাফ : ৮ : ১৩৩)

মোটকথা, উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ই শোকরের মূল। এগুলোর মাধ্যমে শোকরের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত হয়। শোকরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন— নিয়ামতদাতার নিয়ামত বিনয়ের সাথে স্বীকার করার নাম শোকর। (আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৩১১) এ সংজ্ঞায় মৌখিক উক্তি এবং অন্তরের কতক অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, শোকর হচ্ছে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ উল্লেখ করে তার প্রশংসা করা। (লাত্বাইফুল ইশারাত : ১ : ৩৮০; আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৩১১) এতে শুধু মৌখিক আমলের প্রতিই লক্ষ রাখা হয়েছে।

কারও কারও মতে, শোকর হচ্ছে তত্ত্বে নিমগ্ন থাকা এবং সদাসর্বদা নিয়ামতদাতার মহত্ত্ব স্মরণ রাখা। (আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৩১১)

এই সংজ্ঞা শোকরের অধিকাংশ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে; কিন্তু জিহ্বার আমল শোকরের বাইরে থেকে যায়।

হামদুন আল-কাসসার (র) বলেছেন, (আল্লাহ তাআলার) নিয়ামতের শোকর আদায়ের অর্থ হলো, তুমি নিজেকে অনাহূত আগন্তুক মনে করবে। (আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৩১১)

একথার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শোকরের অর্থ মারেফাতের মধ্যে পাওয়া যায়।

হযরত জুনাইদ (র) শোকরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, শোকরকারী নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য মনে করবে না। এতে কেবল অন্তরের একটি বিশেষ অবস্থা পাওয়া যায়।

মনীষীগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহ থেকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। প্রত্যেকের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ছিল বিধায় উক্তিও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। বরং এক্ষেত্রে একই বুযুর্গের উক্তি দু'অবস্থার ক্ষেত্রে দু'রকম হয়েছে। কেননা, তাদের মধ্যে যখন যে হালত প্রবল হতো, সে হালত অনুযায়ীই তারা বক্তব্য রাখতেন। তারা যতটুকু বলা প্রশ্নকারীর জন্য উপযুক্ত মনে করতেন, ততটুকুই বলতেন, অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জন করতেন। এখানে পাঠকবর্গের একথা মনে করা উচিত নয় যে, আমরা এসব কথা তাদের প্রতি বিদ্রূপ করে বলছি অথবা আমাদের সুচিন্তিত বক্তব্য তাদের মনঃপূত নয়। বরং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আমাদের বক্তব্য অস্বীকার করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে শোকর

অনেকেই মনে করতে পারে যে, শোকর নিয়ামতদাতার হক এবং শোকর দ্বারা তার কিছু না কিছু ফায়দা হয়। যেমন, আমরা রাষ্ট্রপ্রধানদের শোকর কয়েকভাবে আদায় করতে পারি। যেমন, প্রশংসা দ্বারা শোকর করতে পারি। এতে রাষ্ট্রপ্রধানদের ফায়দা এই যে, জনগণের মনে তাদের অবস্থান শক্ত হয় এবং তাদের সম্মান বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, সেবাদানের মাধ্যমে শোকর করতে পারি। এতেও তাদের কোনো কোনো উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা হয়। তৃতীয়ত, সেবকের আকৃতিতে বাদশাদের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে শোকর করতে পারি। এতে তাদের দল বড় হয়।

যাহোক, শোকরের ফলে নিয়ামতদাতার এ ধরনের কোনো না কোনো উপকার লাভ হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে এমন হওয়া দু'কারণে অসম্ভব। প্রথম কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর সেবাযত্ন, সাহায্য এবং সেবকের আধিক্যের প্রয়োজন নেই।

তাঁর সামনে আমরা রুকু-সিজদা করলে তাঁর কোনো ফায়দা হয় না। এমনিভাবে আমাদের কোনো কাজেই তার কোনো ফায়দা নেই।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমরা নিজ ইচ্ছায় যত কাজ করি, সেগুলোও আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিয়ামত। কারণ, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শক্তি-সামর্থ্য, ইচ্ছা-প্রয়াস এবং নড়াচড়ার উপকরণ সবই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। সুতরাং তাঁর নিয়ামতের শোকর তাঁরই নিয়ামত দ্বারা কীভাবে হতে পারে? অতএব বোঝা গেল, উল্লিখিত দু'কারণে আল্লাহ তাআলার জন্য শোকর অসম্ভব। সুতরাং এমন এক উপায় প্রয়োজন, যাতে এই অসম্ভাব্য না থাকে এবং শোকরও আদায় হয়।

এ সম্পর্কে নবীদের জীবনী দেখা যেতে পারে। কেননা, হযরত দাউদ (আ) ও হযরত মূসা (আ)-ও এমনি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর নিকট বলেছিলেন, হে প্রভু! আমরা কীভাবে আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করব? কারণ, যখন শোকর আদায় করব, তখন আপনার কোনো নিয়ামতের মাধ্যমেই করব। জবাবে আল্লাহ তাআলা এই মর্মে ওহি প্রেরণ করেন যে, তোমরা যখন এটা বুঝতে পেরেছ, তখন আমিও ধরে নিলাম, তোমরা আমার শোকর করেছ।

এখন পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, আমি প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তাঁদের কাছে পাঠানো ওহির মর্ম বুঝিনি। এটা পরিষ্কার যে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় সম্ভব নয়। কিন্তু শোকর আদায় অসম্ভব এ কথা উপলব্ধি করা কী করে শোকর হতে পারে? এটা বড়ো জোর নিয়ামত হতে পরে। এটাকে যদি শোকর বলি তাহলে কথা দাঁড়ায় এমন, যে শোকার আদায় করে না সেই শোকর আদায় করে। আবার কেউ যদি বাদশার পক্ষ থেকে প্রথমবার পুরস্কার গ্রহণের পর দ্বিতীয়বার পুরস্কার গ্রহণ করে তাহলে দ্বিতীয়বার গ্রহণ করাটা প্রথমবারের শোকর বলে গণ্য হবে। বিষয়টি স্পষ্ট হলো না। সম্ভব হলে বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করুন।

এর উত্তর হলো, এটা মারেফাতের দরজায় কড়াঘাতের মতো, যা পারস্পরিক লেনদেনের ঊর্ধ্বের বিষয়। তারপরও আমরা এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করছি। মূলত এখানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি : কেবল একত্ববাদের দৃষ্টি। এই দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে নিশ্চিতভাবে জানাবে যে, যেই সত্তা কৃতজ্ঞ তিনিই কৃতজ্ঞতাপ্রাপ্ত। যিনি প্রেমিক তিনিই প্রেমাস্পদ। এই দৃষ্টিভঙ্গি এমন লোকদের যারা এ কথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কিছু ছিল না। আবার তিনি ছাড়া অন্য সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অতীত এবং ভবিষ্যতে এটাই একমাত্র চির সত্য। কেননা, আল্লাহ তাআলা ভিন্ন অন্য কিছু তখনই কল্পনায় আসবে যখন তার স্থিতিশীলতা কল্পনায় আসবে। আর এমন ভিন্নতার কোনো অস্তিত্বই নেই। আসলে এর অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব। কারণ আপাত বিদ্যমান বস্তু সত্তাগতভাবে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। আর যা সত্তাগতভাবে বিদ্যমান তিনি ভিন্ন অন্য কাউকে না থাকা ধরা হলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে কেবল তিনিই একমাত্র বিদ্যমান। আর তাঁর সঙ্গে অন্য কেউ বিদ্যমান ধরা হলে তাঁর বিদ্যমান থাকার কোনো বিশেষত্ব হয় না। অথচ তিনিই একমাত্র নিয়ন্ত্রক।

অতএব যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, একমাত্র নিয়ন্ত্রক তিনিই; তিনিই একক ও নির্মুখাপেক্ষী সত্তা। তার অবস্থানের দিকে লক্ষ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে সবকিছুর উৎস কেবল তিনিই। তিনিই সব কিছুর প্রত্যাবর্তনস্থল। তিনিই কৃতজ্ঞ আবার তিনিই কৃতজ্ঞতাপ্রাপ্ত। তিনিই প্রেমিক আবার তিনিই প্রেমাস্পদ।

এটাই ছিল হাবীব ইবনে আবু হাবীব (র)-এর দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি যখন

إِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ط نِعْمَ الْعَبْدُ ط إِنَّه أَوَّابٌ.

আমি তাকে (আইয়ূবকে) ধৈর্যশীল পেয়েছি। কত উত্তম বান্দা সে! আর সে তো ছিল আমার অভিমুখী। (সূরা সোয়াদ : ৪৪) এ আয়াত পড়তেন তখন বলতেন, কী চমৎকার বিষয়! তিনি দিয়েছেন আবার তিনিই প্রশংসা করছেন। অর্থাৎ হাবীব (র) এটা বোঝাতে চেয়েছেন, আল্লাহ তাআলা যখন নিজের দানের প্রশংসা করছেন তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজের প্রশংসা নিজেই করছেন।

তদ্রূপ শায়েখ আবু সাঈদ মীহানী (র)-এর সামনে যখন এ আয়াত পড়া হলো,

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ.

যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে। (সূরা মায়েদা : ৫৪) তখন তিনি বললেন, আসলেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন। তাঁকে ভালোবাসতে দাও। তাদেরকে ভালোবাসার মাধ্যমে আসলে তিনি নিজেকেই ভালোবাসেন। শায়েখ মীহানী (র) বলতে চাচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা নিজেই প্রেমিক আবার তিনিই প্রেমাস্পদ।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। যেমন লেখক যখন নিজের বই পছন্দ করেন তখন আসলে তিনি নিজেকেই পছন্দ করেন। আবার কারিগর বা শিল্পী যখন নিজের কর্ম বা শিল্পকে পছন্দ করেন তখন বস্তুত নিজেকেই পছন্দ করেন। তদ্রূপ পিতা তার সন্তানকে ভালোবাসার অর্থ হলো নিজেকেই ভালোবাসা। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর যা কিছু আছে সবই হলো লেখকের লেখা আর কারিগরের শিল্পকর্মের মতো। সুতরাং যদি তিনি সেসব ভালোবাসেন তাহলে তো তিনি নিজেকেই ভালোবাসলেন।

এসব হলো একত্ববাদের দৃষ্টিভঙ্গি। সুফিদের মতে এ অবস্থাকে 'ফানা' বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ভিন্ন আর যা কিছু আছে এমনকি নিজেকেও মিটিয়ে দেওয়া। যারা এ বিষয়টি বুঝবে না তারা এ কথা অস্বীকার করে বলবে, প্রতিদিন এত অধিক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করার পরও সে কী করে সাড়ে তিন হাত বিশিষ্ট এই দেহ মিটিয়ে দিতে পারে?

মূর্খরা সুফিদের এই সমস্ত কথা না বোঝার কারণে তাদের নিয়ে হাসাহাসি করে। অবশ্য সুফি ও নেককারদের হাসির পাত্র হতেই হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ. وَ اِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ. وَ اِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ. وَ اِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْا اِنَّ هٰؤُلَآءِ لَضَالُّوْنَ. وَ مَا اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ.

যারা অপরাধী তারা তো মুমিনদের উপহাস করতো এবং তারা যখন মুমিনদের কাছ দিয়ে যেত তখন পরস্পরে চক্ষু টিপে ইশারা করতো। এবং যখন তাদের আপনজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরত, এবং যখন তাদেরকে (মুমিনদের) দেখত তখন বলত, নিশ্চয় এরা পথভ্রষ্ট। অথচ তাদেরকে তো তাদের (মুমিনদের) তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। (সূরা মুতাফফিফীন : ২৯-৩৩)

তারপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, শেষ হাসিটা হবে নেককার এবং মুমিনদের। ইরশাদ হচ্ছে,

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ. عَلَى الْاَرَآئِكِ ۙ يَنْظُرُوْنَ.

আজ মুমিনগণ উপহাস করছে কাফেরদের, সুসজ্জিত আসনে বসে (তাদেরকে) অবলোকন করছে। (সূরা মুতাফফিফীন : ৩৪-৩৫)

তদ্রূপ নূহ (আ) যখন কিশতি তৈরির কাজ করতেন তখন কাফেররা তার কাজ নিয়ে হাসাহাসি করতো। তখন নূহ (আ)-এর উত্তর ছিল,

اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ.

তোমরা যদি আমাদের উপহাস করো তবে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ। (সূরা হুদ : ৩৮)

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : এমন লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি যারা নিজের পক্ষ থেকে 'ফানা'-এর স্তরে পৌঁছেনি। এরা আবার দুই দলে বিভক্ত।

একদল কেবল নিজেদের অস্তিত্ব স্বীকার করে; আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এরা হলো অন্ধ এবং অধঃপতিত। চোখ থাকা সত্ত্বেও

এরা অন্ধ। কারণ তারা সুনিশ্চিতকে অস্বীকার করে। তিনি হলেন এমন নিয়ন্ত্রক যিনি নিজের ওপরও নিয়ন্ত্রণ রাখেন আবার প্রতিটি প্রাণ যা কামাই করে তার ওপরও নিয়ন্ত্রণ রাখেন। প্রতিটি বস্তুই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তারা এর প্রতি বিশ্বাস না রেখে কেবল নিজেদের স্বীকার করে। সত্যটা মেনে নিলে তারা দেখতে পেতো, প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো স্থিরতা এবং অস্তিত্বই নেই। তাদের বর্তমান অস্তিত্ব তো এসেছে সৃষ্টি হওয়ার পর। তারা আপনাআপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে এমন নয়।

যা পূর্ব থেকেই ছিল তা হলো বিদ্যমান। আর যা সৃষ্টি করা হয়েছে তা হলো সৃষ্টি। যিনি বিদ্যমান তিনি চিরসত্য। সবকিছুর নিয়ন্ত্রক এবং অবিনশ্বর সত্তা। আর সৃষ্টি হলো নশ্বর, ধ্বংসশীল এবং অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

আরেক দল এমন যারা অন্ধ নয়; তবে তাদের চোখে সমস্যা রয়েছে। তারা এক চোখ দিয়ে সত্যকে দেখেও তা অস্বীকার করে না। তাদের অপর চোখটি সম্পূর্ণ অন্ধ হলে তারা হক মোটেই দেখতে পেতো না। যেহেতু তা সম্পূর্ণ অন্ধ নয় তাই এ চোখ দিয়ে তারা আল্লাহ তাআলার পাশাপাশি অন্য সত্তাকেও সাব্যস্ত করে। প্রথম দলটি জেনেশুনে অস্বীকার করে আর এরা শিরক করে। তাদের চোখের সমস্যা আরেকটু বৃদ্ধি পেলে দুই স্রষ্টা (তাদের দাবী অনুসারে)-এর মাঝে পার্থক্য করে। ফলে তারা মনিব ও গোলাম নির্ধারণ করে। এই পার্থক্য নির্ণয় এবং অপর বিদ্যমানে ক্ষমতা হ্রাস করার মাধ্যমে একত্ববাদের সীমানায় ঢুকে পড়ে। এরপর তারা যদি ত্রুটিযুক্ত চোখে সুরমা ব্যবহার করে তাহলে এর ত্রুটি কমে আসবে এবং জ্যোতি বৃদ্ধি পাবে। ফলে সে আল্লাহ তাআলা ভিন্নর জন্য যা নির্ধারণ করেছিল তার অসারতা দেখতে পাবে। এভাবে চলতে থাকলে তার চোখ সুস্থ হয়ে যাবে। আর সে আল্লাহ তাআলা ভিন্ন কিছুই দেখতে পাবে না। অর্থাৎ সে একত্ববাদের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হবে।

আল্লাহ তআলা ভিন্ন অন্যদের মধ্যে ত্রুটি ধরতে পারা হচ্ছে তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রাথমিক স্তর। এর স্তর অগণিত। একারণেই একত্ববাদীদের স্তরগত পার্থক্য হয়ে থাকে।

রাসূলগণের ওপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ হলো সেই সুরমা যার মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি লাভ হয়। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) হলেন চোখের ডাক্তার। তারা

কেবল আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। তারা যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর দাওয়াত দিয়েছেন এর অর্থ হলো একমাত্র একক সত্যকেই দেখতে হবে। বস্তুত খুব কম লোকই একত্ববাদের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছতে পারে। আবার অস্বীকারকারী এবং মুশরিকদের সংখ্যাও নগণ্য। তারা আসলে তাওহীদের বিপরীতের একদম সীমানা ঘেঁষে অবস্থান করে। কারণ পৌত্তলিকরা বলে, আমরা এই সমস্ত দেবদেবির পূজা-অর্চনা এজন্যই করি যাতে তারা আল্লাহর দরবারে আমাদের নৈকট্যশীল করে দেয়। তারা একত্ববাদের দরজায় আলতোভাবে প্রবেশ করে। এ দুই শ্রেণির মাঝামাঝি লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তাদের কারও অবস্থা এমন যে হঠাৎ করে চোখ খুলে যায়। তখন সে তাওহিদের মর্ম উপলব্ধি করে। কিন্তু এ অবস্থা হলো বিজলীর চমকের মতো অস্থায়ী। আবার কারও কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং দীর্ঘ সময় চলমান থাকে। তবে তা স্থায়ী হয় না। আর এই স্থায়িত্বটাই কঠিন। কবি বলেন,

لِكُلٍّ إِلَى شَأْوِ الْعَلَا حَرَكَاتُ * وَلٰكِنْ عَزِيْزٌ فِي الرِّجَالِ ثُبَاتُ.

সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছার জন্য সবাই দৌড়ঝাঁপ করে। কিন্তু (সর্বোচ্চ চূড়া নয়, বরং লক্ষ্যে) অবিচল থাকাই মানুষের জন্য কষ্টকর।

আল্লাহ তাআলা নবী (স)-কে নৈকট্য কামনা করতে আদেশ দিয়ে বলেন,

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. সিজদা করুন এবং নিকটবর্তী হোন। (সূরা আলাক : ১৯)

তখন নবী কারীম (স) সিজদায় গিয়ে বললেন,

أَعُوْذُ بِعَفْوِكَ، وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

(হে আল্লাহ!) আমি আপনার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আপনার ক্ষমার আশ্রয় নিচ্ছি। আপনার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় নিচ্ছি। আপনার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনার কাছেই আশ্রয় নিচ্ছি। আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না। আপানার যথাযথ প্রশংসা তো আপনিই করেছেন। (সহিহ মুসলিম : ৪৮৬; সুনানে নাসায়ী : ৮ : ২৮৩)

এখানে নবী কারীম (স)-এর প্রথম দুআ 'আপনার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আপনার ক্ষমার আশ্রয় নিচ্ছি' এটা কেবল আল্লাহ তাআলার কাজের মুশাহাদা (দর্শন) বোঝায়।

অবস্থা এমন যেন নবী কারীম (স) কেবল আল্লাহ তাআলা ও তার কাজ মুশাহাদা (প্রত্যক্ষ) করছেন। তাই তিনি তাঁর কাজের থেকে কাজের আশ্রয় নিচ্ছেন। তারপর আরও নিকটবর্তী হয়ে তাঁর কাজের মুশাহাদাকে মিটিয়ে দিলেন। কাজের উৎস অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি মুশাহাদা (প্রত্যক্ষ) করতে লাগলেন। তাই তিনি বললেন, 'আপনার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য আপনার ক্ষমার আশ্রয় নিচ্ছি।' এখানে ক্রোধ আর ক্ষমা দুটিই আল্লাহ তাআলার গুণ বা বৈশিষ্ট্য। তারপর নবী কারীম (স) এই গুণের মধ্যে তাওহিদ বা একত্ববাদের কমতি দেখতে পেয়ে তিনি আরও নৈকট্য অর্জন করলেন। বৈশিষ্ট্য ও গুণের স্তর থেকে আল্লাহ তাআলার সত্তার মুশাহাদায় চলে গিয়ে বললেন, 'আপনার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে আশ্রয় নিচ্ছি।' এটা হলো আল্লাহর কর্ম ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ না করে তাঁর থেকে পলায়ন করে তাঁর কাছে আশ্রয় নেওয়া। কিন্তু নবী কারীম (স) নিজেকে আল্লাহ তাআলার সত্তা থেকে পালিয়ে তাঁর কাছে আশ্রয় নিতে ও তাঁর প্রশংসা করতে দেখতে পেয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিতে আগ্রহী হলেন। তাই তিনি আরও নিকটবর্তী হয়ে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন এ কথা বলে, 'আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না, আপনার যথাযথ প্রশংসা তো আপনিই করেছেন।' এখানে নবী কারীম (স)-এর বক্তব্য 'শেষ করতে পারবো না' হলো নিজেকে 'ফানা' (মিটিয়ে দেওয়া) এবং মুশাহাদার স্তর থেকে বেরিয়ে যাওয়া। আর 'আপনার যথাযথ প্রশংসা আপনিই করেছেন' হলো একথা প্রকাশ করা যে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং প্রশংসাকারী এবং প্রশংসিত। সবকিছু তাঁর থেকে শুরু হয় এবং তাঁর কাছে গিয়েই শেষ হয়। সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর কেবল তাঁর সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে। এ দুআর মধ্যে নবী কারীম (স) একত্ববাদীর প্রথম স্তর থেকে চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছেন। এ পর্যায়ে গিয়ে কেবল আল্লাহ তাআলার দীদারের স্বাদ আস্বাদন করাটাই কেবল বাকি ছিল।

নবী কারীম (স) একের পর এক ধাপ অতিক্রম করেছেন। শুরু থেকেই ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেছেন। তথাপি নিজের স্তর অতিক্রম করা ও চলার মধ্যে কমতি দেখেছেন। এক হাদিসে এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন,

إِنَّهُ لَيُخَانُ عَلَى قَلْبِيْ، حَتَّى أَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

কখনো কখনো আমার অন্তরেও আচ্ছাদন পড়ে যায়। তাই আমি দিনে রাতে সত্তরবার ইস্তিগফার করি। (সহিহ মুসলিম : ২৭০২; সুনানে আবি দাউদ : ১৫১৫; সহিহ বুখারী : ৬৩০৭)

নবী কারীম (স)-এর ইস্তিগফার ছিল ধারাবাহিকভাবে সত্তরটি স্তর অতিক্রম হওয়ার জন্য। যার প্রথমটিই ছিল সৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে। যদিও প্রথমটি শেষটির তুলনায় নগণ্য। তাঁর ইস্তিগফার মূলত এজন্যই ছিল। (অর্থাৎ নবী কারীম (স)-এর ইস্তিগফার পাপ মার্জনার জন্য ছিল না; বরং মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ছিল।)

আয়েশা (রা) নবী কারীম (স)-কে বললেন, আল্লাহ তাআলা তো আপনার আগে পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবুও কেন আপনি সিজদায় এতো কান্নাকাটি করেন? কেন এতো মুজাহাদা করেন? উত্তরে নবী কারীম (স) বললেন, أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا. তবে কি আমি শোকরগুজার বান্দা হবো না? (সহিহ মুসলিম : ২৮২০)

অর্থাৎ আমি কি মর্যাদা বৃদ্ধির কামনা করবো না? কারণ শোকর হলো নিয়ামত বৃদ্ধির কারণ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ.

তোমরা কৃতজ্ঞ হলে আমি তোমাদের অবশ্যই বাড়িয়ে দেব। (সূরা ইবরাহিম : ৭)

আমরা ইলমে মুকাশাফা (আধ্যাত্মিক জ্ঞানে)-এর গভীরে চলে গেছি, তাই এখানেই কথার লাগাম টেনে ধরছি এবং পারস্পরিক আচরণের জ্ঞান তথা ইলমে মুআমালার বিষয়ে ফিরে যাচ্ছি।

নবীগণকে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তাওহিদের প্রতি আহ্বান করা। এই তাওহিদ পর্যন্ত পৌঁছার পথে রয়েছে অনেক দূরত্ব ও

অসংখ্য বাধা। শরিয়ত পূর্ণাঙ্গভাবে এসব বাধা অতিক্রম করার পন্থা বাতলে দেয়। এতে শোকর, শোকরকারী ও যার শোকর করা হয়— স্বতন্ত্র মনে হয়। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে। মনে করুন, এক বাদশাহ তাঁর থেকে দূরে অবস্থানকারী এক খাদেমের নিকট সওয়ারি, পোশাক এবং পাথেয় হিসেবে নগদ টাকাপয়সা পাঠালেন, যাতে সে রাস্তার দূরত্ব অতিক্রম করে বাদশার দরবারে চলে আসে। খাদেমের আসার সম্ভাব্য কারণ দুটি।

১. রাষ্ট্রপ্রধানের উদ্দেশ্যে দরবারে এসে গেলে কিছু শাহী দায়িত্ব পালন করবে। ফলে, শাহীকর্মে সুবিধা হবে। ২. তার আসার মধ্যে বাদশার কোনো উপকারিতা নেই এবং তাতে সাম্রাজ্যের কোনো সৌন্দর্যও বৃদ্ধি হবে না এবং সে না থাকলেও সাম্রাজ্যের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং এতে স্বয়ং খাদেমের স্বার্থ রয়েছে। সে রাষ্ট্রপ্রধানের নৈকট্য লাভে ধন্য হতে পারে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য অর্জনের ব্যাপারটিকেও এই দ্বিতীয় পর্যায়ে মনে করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে খাদেম শুধু বাহনে আরোহণ করে রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট চলে আসলেই শোকরকারী হবে না, যে পর্যন্ত সে রাষ্ট্রপ্রধানের উদ্দিষ্ট শাহী কর্মের দায়-দায়িত্ব পালন না করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যদিও কোনো ফায়দা রাষ্ট্রপ্রধানের কাম্য নয়, তবু খাদেম শোকরকারী ও অস্বীকারকারী হতে পারে। যেমন যদি সে রাষ্ট্রপ্রধানের দেওয়া সামগ্রী যথাযথ খাতে খরচ করে, তবে সে শোকরকারী হবে। অন্যথা অকৃতজ্ঞ-অস্বীকারকারী হবে। সুতরাং সে যদি রাষ্ট্রপ্রধানের শাহী পোশাক পরিধান করে, তবে সে প্রভুর শোকরকারী হবে। কেননা, প্রভুর নিয়ামতকে সে তারই অভীষ্ট কর্মে ব্যয় করেছে।

পক্ষান্তরে যদি খাদেম রাষ্ট্রপ্রধানের বাহনে আরোহণ করে রাষ্ট্রপ্রধানকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে দূরে চলে যায়, তাহলে সে নিয়ামত অস্বীকারকারী হবে। আর যদি বাহনে না উঠে এবং নিকটে অথবা দূরে না যায়, তারপরও সে নিয়ামতের অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবে। কেননা, সে প্রভুর নিয়ামতকে অকেজো করে রেখেছে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহর কাছে থাকার মধ্যেই তার কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। এরপর নৈকট্যের স্তর লাভের জন্য এমন সব নিয়ামতের ব্যবস্থা করেছেন, যেগুলো ব্যবহার করতে সে ক্ষমতা রাখে। কিন্তু মানুষ

প্রবৃত্তির কারণে মহান আল্লাহর দরবার হতে দূরে সরে যাচ্ছে। মানুষের এই দূরত্ব ও নৈকট্যকে আল্লাহ তাআলা এভাবে উল্লেখ করেছেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ. ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ.

আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতম পরিণত করে দেই, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ; তাদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। (সূরা তীন : ৪-৬)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহের দ্বারা মানুষ হীনতম স্তর থেকে উন্নতি করে নৈকট্যের স্তরে পৌঁছতে পারে। এতে মানুষেরই উপকার হবে। মানুষ নৈকট্যশীল হোক কিংবা দূরবর্তী, তাতে আল্লাহ তাআলার কোনো উপকার নেই।

এখন মানুষ ইচ্ছা করলে নিয়ামতকে আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করতে পারে। তাহলে সে শোকরকারী হবে। কারণ, সে তার রবের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেছে। আর যদি নাফরমানিতে ব্যবহার করে, তাহলে নিয়ামতের অস্বীকারকারী হবে। কেননা, সে রবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেছে। আর যদি নিয়ামতকে যথাযথ ব্যবহার না করে অকার্যকর করে রাখে এবং আনুগত্য ও নাফরমানি কোনো কিছুতেই ব্যবহার না করে, তাহলে এতেও সে নিয়ামতের অস্বীকারকারী হবে। কারণ, সে তো নিয়ামতকে নষ্ট করে দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা বান্দার উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। যেন সে এর মাধ্যমে আখেরাতের সৌভাগ্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। সুতরাং যে আনুগত্যশীল বান্দা আল্লাহর নিয়ামতকে যে পরিমাণ আনুগত্যে ব্যবহার করবে, সে সেই পরিমাণ নিয়ামতের শোকরকারী হবে। আর যে অবাধ্য ও উদাসীন ব্যক্তি নিয়ামতের অপব্যবহার করবে, সে হবে অকৃতজ্ঞ-অস্বীকারকারী।

নাফরমানি এবং আনুগত্য দুটোই ইচ্ছাধীন। কিন্তু ভালোবাসা ও অপছন্দ করা ইচ্ছাধীন নয়। এটা তাকদীর তথা ভাগ্য সংক্রান্ত আলোচনা। এজন্য

আমরা এ বিষয়ে আর কথা বাড়াবো না। এ বিষয়ে আলোচনা করতে শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে দুটি সংশয়ের নিরসন হয়। যেমন আমরা বলেছি, শোকরের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় পথে তাঁর নিয়ামত খরচ করা। এখন তাঁর নিয়ামত তাঁর পছন্দনীয় পথে খরচ করলে উদ্দেশ্য সাধন হয়ে যাবে। আবার মানুষের কর্ম আল্লাহ তাআলার দান (অর্থাৎ তিনি ক্ষমতা দান করাতেই মানুষ কর্ম করতে সক্ষম হয়।) নিয়ামতের পাত্র হিসেবে মানুষের প্রশংসা করা হয়। আবার এই প্রশংসাও আল্লাহ তাআলার আরেক দান। যিনি নিয়ামত দিচ্ছেন, তিনি প্রশংসাও করছেন। ফলে তাঁর দুই কাজের এক কাজ অপর কাজকে তাঁর ভালোবাসার দিকে ফেরানোর কারণ হলো। সুতরাং সর্বাবস্থায় শোকর কেবল তাঁরই হবে। আর মানুষ শোকরকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। কারণ শোকর তার থেকে প্রকাশ পেয়েছে। তবে এটা মনে করা যাবে না যে, মানুষ শোকর সৃষ্টি করেছে। যেমন কাউকে জ্ঞানী বলা হয় তার মধ্যে জ্ঞান আছে বলে। সে জ্ঞানের স্রষ্টা বা উৎপাদক এমনটা নয়। এই জ্ঞান সৃষ্টির কৃতিত্ব কেবল আল্লাহ তাআলার। মানুষ সৃষ্টির বহু পূর্বেই তাকে এই জ্ঞানের পাত্র হিসেবে নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। এখন কেউ যদি নিজেকে জ্ঞানের স্রষ্টা বা উৎপাদক মনে করে তবে এটা তার নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়।

একবার সাহাবায়ে কেরাম (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, সবকিছু যখন নির্ধারণ করেই রাখা হয়েছে, তখন আমল করে লাভ কী? উত্তরে নবী কারীম (স) বললেন,

إِعْمَلُوْا، فَكُلٌّ، مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

তোমরা আমল করতে থাকো, কারণ যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে। (সহিহ বুখারী : ৪৯৪৯; সহিহ মুসলিম : ২৬৪৭)

নবী কারীম (স) এটা স্পষ্ট করে দিলেন যে, সৃষ্টি হলো আল্লাহ তাআলার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ও তাঁর ক্রিয়ার ক্ষেত্র।

মোটকথা, মানুষ যেমন আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, তেমনি মানুষের কাজকর্মও আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তবে আল্লাহ তাআলা এমন কর্মপদ্ধতি

অবলম্বন করেছেন যে, মানুষের কিছু কাজকে অপর কিছু কাজের ক্ষেত্র বানিয়েছেন। যেমন মানুষ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, তেমনি কথা বলার ক্ষমতাও আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তদ্রূপ প্রাণ ও ইচ্ছাশক্তিও আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। কিন্তু মানুষের কথা বলার জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা, প্রাণ ও ইচ্ছাশক্তি। এখানে ক্ষমতা, প্রাণ ও ইচ্ছাশক্তি এগুলো একে অপরের ক্ষেত্র।

এখানে আরেকটি প্রশ্নের উদয় হয় যে, বান্দার যদি ইচ্ছাধিকার না-ই থাকে তাহলে আদেশ দেওয়া হলো কেন যে 'তোমরা কাজ করতে থাকো। নতুবা অবাধ্যতার কারণে তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে।' বান্দার যখন কিছুই করার নেই তখন তাকে শাস্তি দেওয়ার কী যৌক্তিকতা আছে?

এর উত্তর হলো, এই আদেশ বান্দার মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করে। আর বিশ্বাসের ফলে অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত হয়। এই ভীতিই প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে এবং দুনিয়ার ধোঁকা থেকে বাঁচতে সহায়তা করে। ফলে আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য অর্জন সহজ হয়। এ সমস্ত মাধ্যম তৈরি এবং সেগুলো বিন্যস্ত করেছেন আল্লাহ তাআলা। আদিতে আল্লাহ তাআলা যার জন্য সৌভাগ্য নির্ধারণ করেছেন তার জন্য তিনি এসব মাধ্যম সহজ করে দেন। ফলে পর্যায়ক্রমে সে জান্নাতে পৌঁছে যায়। 'যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়।' এ কথার মর্ম এটাই। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা যার ভাগ্যে কল্যাণ লিখেননি সে আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা এবং আলেমদের বক্তব্য শোনা থেকে দূরে থাকে। যেহেতু শোনে না তাই সে জানে না। আর না জানার কারণে সে ভীত হয় না। ভীত না হওয়ার কারণে সে দুনিয়ার আসক্তি কাটাতে পারে না। ফলে সে শয়তানের দলভুক্ত হয়ে যায়। এদের সকলের চূড়ান্ত ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

সুতরাং এটা জানা গেল, একদল লোককে বাধ্যতামূলক জান্নাতে নেওয়া হবে আবার আরেক দলকে অপমানিত করে জাহান্নামে ফেলা হবে। মুত্তাকিদের বাধ্য করা হবে ইলম ও ভীতির মাধ্যমে। আর অপরাধীদেরকে অবহেলা আর দুনিয়ার ধোঁকার মাধ্যমে অপমানিত করা হবে। এই বাধ্য করা আর অপমানিত করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তিনি ছাড়া আর কেউ তা পারবে না। গাফেল আর উদাসীনদের চোখ থেকে পর্দা সরে যাওয়ার পর তারা বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে। সেদিন তারা শুনতে পাবে,

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

আজ কর্তৃত্ব কার? আল্লাহরই, যিনি এক, পরাক্রমশালী। (সূরা মুমিন : ১৬)

আদি থেকে অন্ত সমস্ত দিনের রাজত্ব কেবলই আল্লাহ তাআলার। তথাপি উদাসীনরা সেদিনই কেবল বিষয়টি জানতে পারবে। এ কথার মাধ্যমে এমন সময় তাদের হুঁশ ফিরবে, যখন হুঁশ কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মূর্খতা এবং অন্ধত্ব থেকে হেফাজত করুন। কারণ এটাই প্রকৃত ধ্বংসের কারণ।

আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়ের মাঝে পার্থক্য

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় বিষয়গুলো জানা ব্যতীত শোকর অর্জন এবং অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকার বর্জন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কারণ, শোকরের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহকে তাঁর পছন্দনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা এবং অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে নিয়ামতসমূহকে আদৌ ব্যবহার না করা অথবা অপছন্দনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা। আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ চেনার উপায় দুটি।

১. কুরআনের আয়াত ও হাদিস শোনা এবং ২. অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা। শেষোক্ত পদ্ধতি কঠিন বিধায় তা বিরল। আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করে মানুষের জন্য রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন। মানুষের কাজকর্ম সম্পর্কিত শরিয়তের হুকুম-আহকাম জানার ওপর এই পথের পরিচয় নির্ভরশীল। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সকল কাজকর্মে শরিয়তের হুকুম সম্পর্কে জানবে না, সে শোকর আদায়ে সক্ষম হবে না।

দ্বিতীয় উপায় তথা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার যে সকল সৃষ্ট বস্তু দুনিয়াতে রয়েছে, সেগুলোর রহস্য জানা। পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই, যার মধ্যে কোনো রহস্য নেই এবং সেই রহস্যে কোনো উদ্দেশ্য নেই। মূলত প্রত্যেক বস্তু দ্বারা যা উদ্দেশ্য, তাই আল্লাহর পছন্দনীয়। এই রহস্য আবার দু'ধরনের— জাহের (প্রকাশ্য) ও বাতেন (অপ্রকাশ্য)। প্রকাশ্য রহস্যসমূহ আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন, গোপন রহস্যসমূহ বর্ণনা করেননি। যেমন— সূর্য সৃষ্টির মধ্যে

এই রহস্য নিহিত যে, এর দ্বারা দিন ও রাতের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। সুতরাং দিনের উদ্দেশ্য জীবিকা উপার্জন এবং রাতের উদ্দেশ্য বিশ্রাম। এ হচ্ছে সূর্য সৃষ্টির বাহ্যিক রহস্য। এছাড়াও এর অনেক গোপন রহস্য রয়েছে, যা বর্ণিত হয়নি। এমনিভাবে মেঘমালা ও বৃষ্টি বর্ষণের রহস্যও কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.

আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করেছি, অতঃপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদীর্ণ করেছি; এবং তাতে আমি উৎপন্ন করেছি শস্য; আঙুর, শাকসবজি, যায়তুন, খেজুর, ঘন উদ্যান, ফল এবং তৃণ, তা তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের ভোগের জন্য। (সূরা আবাসা : ২৫-৩২)

তারকাসমূহের রহস্যাবলি গোপন এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। তারা যতটুকু জানে, তা হচ্ছে যে, এগুলো আকাশের সৌন্দর্য, যা দেখে মানুষের নয়ন পুলকিত হয়। নিচের আয়াতে আল্লাহ তাআলাও এদিকে ইঙ্গিত করেছেন,

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ نِ الْكَوَاكِبِ.

নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আসমান নক্ষত্ররাজির সৌন্দর্য দিয়ে সুশোভিত করেছি। (সূরা সাফফাত : ৬)

সারকথা, আকাশ, তারকারাজি, বাতাস, সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত, উদ্ভিদ, জীবজন্তু ইত্যাদি জগতের প্রতিটি বিন্দুতে অসংখ্য রহস্য নিহিত। এক থেকে দশ, এক হাজার, দশ হাজার পর্যন্ত রহস্য প্রতিটি কণার ভেতরে লুক্কায়িত। জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিছু কিছু রহস্য সুস্পষ্ট। যেমন— সকলেই জানে যে, চোখ দেখার জন্য, ধরার জন্য নয়। হাত ধরার জন্য; চলার জন্য নয়। পা চলার জন্য, ঘ্রাণ গ্রহণের জন্য নয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন নাড়ি, পিত্ত, কলিজা, মূত্রাশয়, শিরা-উপশিরা ইত্যাদির রহস্য সম্পর্কে সকলে অবগত নয়। আর যারা অবগত তাদের ইলম আল্লাহ তাআলার ইলমের তুলনায় খুবই নগণ্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا.

তোমাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সামান্যই। (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮৫)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, যে ব্যক্তি কোনো নিয়ামতকে এমন কাজে ব্যবহার না করে, যে কারণে সে নিয়ামত সৃষ্টি হয়েছে, সে উক্ত নিয়ামতে আল্লাহ তাআলার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। যেমন, এক ব্যক্তি হাত দিয়ে অন্য কাউকে আঘাত করলো। এখানে আঘাতকারী হাতের নিয়ামতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। যেহেতু হাত সৃষ্টি হয়েছে ক্ষতিকর জিনিসকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলার জন্য এবং উপকারী বস্তুকে গ্রহণ করার জন্য; অপরকে আঘাত করার জন্য নয়।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো গায়রে মাহরামের দিকে তাকালো, সে চোখের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। কারণ, চোখ সৃষ্টি করা হয়েছে দীন ও দুনিয়ার উপকারী বিষয় অবলোকন করার জন্য এবং ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ না দেখার জন্য। মানুষের সাথে সাথে পৃথিবী ও অন্যান্য সামগ্রী সৃষ্টির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষ সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এবং দুনিয়ার ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়। সর্বদা যিকিরে মগ্ন থাকা ব্যতীত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে না।

আর মহব্বত লাভের জন্য সার্বক্ষণিক ফিকিরের মাধ্যমে মারেফাত অর্জন করতে হবে। শরীর টিকে থাকে খাবারের মাধ্যমে। আর খাবার তৈরি হয় জমিন, পানি এবং বাতাসের সমন্বয়ে। আর এ সমস্ত বস্তুর পূর্ণতার জন্য আসমান জমিনের এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অংশের সৃষ্টির প্রয়োজন। আর এসব কিছুই শরীর গঠনের প্রয়োজনে। কারণ শরীর হচ্ছে নফসের বাহন। আর আল্লাহ তাআলার কাছে কেবল এমন নফসই প্রত্যাবর্তন করে যা ইবাদত ও মারেফাতের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ. مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ.

আর আমি জিন এবং মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য। আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না এবং এটাও চাচ্ছি না যে, তারা আমার আহার যোগাবে। (সূরা যারিয়াত : ৫৬-৫৭)

সুতরাং আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত নিয়াতমতকে তাঁর আনুগত্যে ব্যবহার না করাই হলো তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

আমরা এখন গোপন রহস্যগুলোর একটি উপমা পেশ করছি, যাতে মানুষ এর মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়েও শোকর ও অকৃজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পারে। আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিয়ামত হচ্ছে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা। এ দুটি বস্তুর ওপরই দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত। যদিও এগুলো ধাতব পদার্থ মাত্র— এর মূল পদার্থ দিয়ে কোনো উপকার লাভ হয় না, তবুও এগুলোর প্রতিই মানুষ চরমভাবে মুখাপেক্ষী। যেহেতু প্রত্যেক মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান ইত্যাদির জন্য অনেক জিনিসের প্রয়োজন হয়। এগুলো বিনিময় ব্যতীত পাওয়ার কোনো উপায় নেই। যেমন এক ব্যক্তির জাফরান আছে কিন্তু তার উট প্রয়োজন। এমনিভাবে কারও উট আছে কিন্তু তার জাফরান প্রয়োজন। এমতাবস্থায় এই বিনিময়ের জন্য উভয় বস্তুর মূল্যমান এক হতে হবে। কেননা, এটা জানা কথা যে, কেউ বস্ত্রের বিনিময়ে ঘর অথবা গাধার বিনিময়ে আটা অথবা মোজার বিনিময়ে দাস ক্রয় করতে চাইলে তা সম্ভব হবে না। কেননা, এখানে উভয় বস্তুর মূল্যমান এক নয়। এই সমস্যা দূর করতে আল্লাহ তাআলা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সৃষ্টি করেছেন, যাতে এগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক বস্তুর মূল্যমান নির্ধারণ করা যায়। যেমন, বলা যায় যে, এই উট একশ' স্বর্ণমুদ্রার এবং এই পরিমাণ জাফরান একশ' স্বর্ণমুদ্রার। কাজেই উভয়টি এক সমান। অতএব বিনিময়যোগ্য। স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা সমতা সম্ভব হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, এগুলোর সাথে অন্য কোনো উদ্দেশ্যের সম্পর্ক নেই এবং এগুলোকে খাওয়াও যায় না, পান করাও হয় না। আল্লাহ তাআলা এগুলোকে একজনের হাত থেকে অন্য জনের হাতে যাওয়ার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোকে রহস্যময় করে রেখেছেন, এগুলো দ্বারা সকল বস্তু হাসিল করা যায়। সুতরাং এগুলোর মালিক হওয়া সকল জিনিসের মালিক হওয়ার নামান্তর। এছাড়াও স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার আরও অনেক রহস্য বিদ্যমান, যদি কেউ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রাকে এমন কাজে ব্যবহার করে, যা এই রহস্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত

নয় কিংবা উদ্দেশ্যের উল্টো ব্যবহার করে, তাহলে সে এই নিয়ামতদ্বয়ে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হবে। সুতরাং, কেউ এগুলোকে জমা করে মাটির নিচে পুঁতে রাখলে সে এর মূল উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেবে। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.

আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। (সূরা তাওবা : ৩৪)

আর যে ব্যক্তি সোনা-রুপার পাত্র তৈরি করায়, সে-ও নিয়ামতের অস্বীকারকারী হবে এবং তা জমা করে রাখার চেয়ে অধিক ঘৃণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

مَنْ شَرِبَ فِيْ اٰنِيَةٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ فَكَاَنَّمَا يَتَجَرَّعُ فِيْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ.

যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পানি পান করে, সে যেন তার পেটে দোযখের আগুন ভরে। (সহিহ বুখারী : ৫৬৩৪; সহিহ মুসলিম : ২০৫৬)

একইভাবে যে ব্যক্তি সোনা-রুপা দ্বারা সুদি লেনদেন করবে, সেও নিয়ামতের অস্বীকারকারী ও জালেম হবে। কারণ, এ দুটি বস্তু অন্য বস্তু লাভ করার মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে; নিজের বিশেষ সত্তা দ্বারা উপকার পাওয়ার জন্য সৃজিত হয়নি। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বয়ং এগুলোর মধ্যেই ব্যবসা করবে, সে রহস্যের পরিপন্থি কাজ করবে। সম্পদকে অন্যায় কাজে ব্যবহার করায় তার একাজ জুলুম বলে গণ্য হবে। কোনো লোকের কাছে কাপড় আছে; অর্থসম্পদ নেই, তার খাবার ও বাহন কেনা দরকার। এখন যার কাছে খাবার ও বাহন আছে তার কাপড়ের বিনিময়ে সেসব পণ্য বিক্রি করার প্রয়োজন নেই। তাই যার কাছে কাপড় আছে সে অর্থের বিনিময়ে কাপড় বিক্রি করতে বাধ্য হবে। তারপর সেই অর্থের বিনিময়ে সে খাবার ও বাহন কিনবে। কারণ অর্থসম্পদের মাধ্যমে প্রয়োজন পূরণ ও উদ্দেশ্য সাধন হয়। এমন নয় যে, অর্থসম্পদ নিজেই উদ্দেশ্য। অন্যান্য সম্পদের মাঝে অর্থসম্পদের অবস্থান হলো বাক্যের মাঝে 'হরফ' (অব্যয়)-এর মতো। অব্যয় যেমন নিজে পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ

করে না বরং অন্যের সাথে মিলে পূর্ণ অর্থ দেয়, তেমনি অর্থসম্পদ নিজেই উদ্দেশ্য হতে পারে না; বরং তা অন্যান্য সম্পদ লাভের মাধ্যম। অন্য কথায় বলা যায়, অর্থ সম্পদের দৃষ্টান্ত হলো আয়নার মতো। আয়নার মধ্যে যেমন সকল রং প্রতিফলিত হয়, তেমনি অর্থসম্পদের মাধ্যমে সব রকমের সম্পদ লাভ করা যায়। এখন কেউ যদি শুধু নগদ অর্থের লেনদেন করে তাহলে সে অর্থ সম্পদের সঞ্চয়কারীর মতোই হলো। শাসক অথবা বার্তাবাহককে আটকে রাখা জুলুম ও অন্যায় হওয়ার কারণ হলো এর কারণে ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন ঘটে।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, অর্থসম্পদের বিক্রি যদি না জায়েযই হয়, তাহলে দিরহামের বদলে দিরহাম এবং দিনারের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা বৈধ হয় কী করে? (টাকা ভাঙ্গানোর যে রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তা বৈধ হয় কেমন করে?)

এর উত্তর হলো, প্রতিটি টাকার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিটির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যেমন দিনার (অথবা আমাদের দেশে প্রচলিত বড় অংকের নোট) মূল্যমানের কারণে ছোটোখাটো কাজে ব্যবহার করা যায় না। এর বিপরীতে দিরহাম (অথবা আমাদের দেশে প্রচলিত ছোটো অংকের নোট) কত মূল্যবান হওয়ার কারণে সাধারণ কাজও করা যায়। তাই দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম এবং দিনারের বিনিময়ে দিরহাম (ও আমাদের দেশে প্রচলিত টাকা ভাঙ্গানোর রীতি) বাহ্যত বিক্রি মনে হলেও আদতে বিক্রি নয়। কারণ এর মাধ্যমে দুপক্ষের কোনো পক্ষের বাড়তি উপকার হয় না; বরং সমমূল্যেরই লেনদেন হয়। এজন্যই আমরা দেখি ব্যবসায়ীরা সাধারণত ভাংতি দিতে চায় না; বরং তারা একে সময় নষ্ট এবং অনর্থক কাজ মনে করে। তবে ভালো এবং নিম্নমানের মুদ্রা বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু আমরা এর মধ্যে পার্থক্য করি না। কারণ আমাদের মতে মূল্যের বিচারে ভালো এবং নিম্নমানের দুরকম মুদ্রাই সমান। এজন্যই কেউ যদি ছেঁড়াফাড়া নোট দিয়ে ভালো নোট চায় তাহলে সে বরাবরই পাবে। এখানে কমবেশি করার অনুমতি নেই। সুতরাং এ অবস্থায় কেবল নির্বোধই ভালো নোটের পরিবর্তে ছেঁড়াফাড়া নোট গ্রহণ করবে। ভালোমন্দের বিবেচনা তো কেবল তখনই হবে যখন কোনো বস্তু উদ্দেশ্য হবে।

আবার টাকার বিনিময়ে টাকা বাকিতে বিক্রি হলেও কমবেশি করার অনুমতি নেই। তবে পূর্ব আলোচনা ব্যতীত কিছুটা বাড়িয়ে দিলে ক্ষতি নেই। ঋণের ক্ষেত্রে এমনভাবে কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া উত্তম। ফলে প্রশংসা ও সওয়াব মিলবে। কিন্তু বিক্রয়ের মধ্যে এমনটা প্রশংসনীয় ও সওয়াব লাভের কারণ তো হবেই না, উলটো জুলুম হবে। কেননা লেনদেনের ক্ষেত্রে উদারতা ক্ষতিকর।

তদ্রূপ খাবার সৃষ্টির মূল কারণ শরীরের চাহিদা পূরণ এবং তার মাধ্যমে চিকিৎসা করা। সুতরাং খাবারকে তার মৌলিক উদ্দেশ্য থেকে ফেরানো যাবে না। এর মাধ্যমে যদি ব্যবসা শুরু করা হয়, তাহলে তা ব্যক্তি বিশেষের কাছে কুক্ষিগত হয়ে যাবে। যার জন্য খাবার প্রস্তুত করা হয়েছে, তার কাছে পৌঁছতে বিলম্ব হবে। অথচ খাবারের সৃষ্টিই হয়েছে খাওয়ার জন্য। আর খাবারের চাহিদাও অনেক। সুতরাং যার তা প্রয়োজন নেই যার প্রয়োজন তার কাছে দেওয়া হবে।

সুতরাং কারও কাছে খাবার থাকলে তার প্রয়োজন হলে সে খাবে না হয় অপরকে দিয়ে দেবে। ব্যবসার পণ্য বানানো চলবে না। ব্যবসার পণ্য বানালে তা এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করবে যার খাবারের প্রয়োজন। এমন পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করবে যা খাবার নয়। যদি খাবারের বিনিময়ে সমজাতীয় খাবার বিক্রি করে তবে বুঝতে হবে বিক্রেতার মূলত খাবার প্রয়োজন নেই। (সে গুদামজাত করার উদ্দেশ্যে খাদ্য বিক্রি করছে। এতে অপরাপর মানুষ সমস্যায় পড়বে।) এজন্যই শরিয়ত গুদামজাতকারীকে অভিশাপ দিয়েছে। এ ব্যাপারে শরিয়তের কঠোর হুমকি আমরা উপার্জন অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

তবে খেজুরের বিনিময়ে গম বিক্রির বিষয়টি ভিন্ন। কারণ এর মাধ্যমে অন্যকে সমস্যায় ফেলা হয় না। পক্ষান্তরে সমপরিমাণ গমের বিনিময়ে সে পরিমাণ গম বিক্রি করতে ব্যক্তি বাধ্য হয় না। এটা একটা অনর্থক ও ফালতু কাজ। তাই এক্ষেত্রে নিষেধ করা হবে না। কারণ সমজাতীয় বস্তু রদবদলের ক্ষেত্রে তফাত পেলে তবেই মানুষ অসম্মত হয়। ভালো জিনিসের সমপরিমাণ মন্দ জিনিস কেউ নিতে চায় না। তবে কমবেশি করে নেওয়া হলে এক্ষেত্রে মানুষের আপত্তি থাকে না। খাবার যেহেতু মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত তাই এর মধ্যে উৎকৃষ্ট মান এবং নিকৃষ্ট

মান উপকারের ক্ষেত্রে বরাবর। এক্ষেত্রে মূল পার্থক্য হলো রুচি। তাই শরিয়ত সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে সমতা নির্ধারণ রহিত করে দিয়েছে।

সুদ হারাম হওয়ার এটাও অন্যতম রহস্য। এথেকেই সুদের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ি (র)-এর শস্যকে নির্দিষ্ট করার বুঝ সঠিক বলে মনে হয়। তিনি ওজনকৃত বস্তু নির্ধারণ করেননি। কারণ ওজনকৃত বস্তুর মধ্যে চুনও অন্তর্ভুক্ত। যদি চুন অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে কাপড় চোপড় এবং পশু অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিক যৌক্তিক। যদি হাদিসে লবণের উল্লেখ না থাকত তাহলে ইমাম মালেক (র)-এর মত অধিক বিশুদ্ধ হতো। কারণ তিনি খাদ্যকে নির্দিষ্ট করেছেন। শরিয়ত যে অর্থের প্রতি লক্ষ করে তাকে কোনো সীমায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া জরুরি। সীমার সাথে নির্দিষ্ট না করে দিলে মানুষ অর্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়বে। কারণ, ব্যক্তি ও সময়ের পরিবর্তনে অর্থ পরিবর্তন হতে পারে। সুতরাং সীমা জরুরি। এই সীমা সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ.

যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজেরই ওপর অবিচার করে। (সূরা ত্বলাক : ১)

শরিয়তের প্রকৃত বিধান পরিবর্তিত হয় না; বরং সীমার পদ্ধতি পরিবর্তন হয়। যেমন ঈসা (আ)-এর শরিয়ত এবং মুহাম্মদ (স)-এর শরিয়ত উভয় শরিয়তেই মদ পান হারাম করা হয়েছে। ঈসা (আ)-এর শরিয়তে নিষেধাজ্ঞার পরিমাণ হলো নেশা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর মুহাম্মদ (স)-এর শরিয়তে নিষেধাজ্ঞা এসেছে নেশাজাত দ্রব্য হওয়ার ক্ষেত্রে কম হোক কিংবা বেশি।

টাকাপয়সার গোপন রহস্য বোঝার জন্য এটা একটা উপমা। শোকর করা এবং না করার বিষয়টি এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তবে এই রহস্য কেবল সে ব্যক্তিই বুঝবে যাকে এ সম্পর্কিত জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। (সূরা বাকারা : ২৬৯)

কিন্তু রহস্য অনুধাবনের জন্য এমন অন্তর প্রয়োজন যা প্রবৃত্তির অনুসারী ও শয়তানের ক্রীড়নক নয়। এজন্যই নবী কারীম (স) বলেছেন,

لَوْلَا اَنَّ الشَّيَاطِيْنَ يَحُوْمُوْنَ عَلٰى قُلُوْبِ بَنِيْ اٰدَمَ لَنَظَرُوْا اِلٰى مَلَكُوْتِ السَّمَاءِ.

শয়তান যদি আদম সন্তানের অন্তরের উপর চক্কর না দিতো, তাহলে মানুষ ঊর্ধ্বজগৎ অবলোকন করতে পারতো। (মুসনাদে আহমদ : ২ : ৩৫৩)

এই উদাহরণ যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে নিজের নড়াচড়া, স্থিরতা, সরবতা, নিরবতাসহ আপনার যাবতীয় কাজ তুলনা করে দেখুন। সেগুলো হয়তো শোকর হবে, না হয় না-শোকর। প্রতিটি কাজ এই দুই প্রকারের এক প্রকারভুক্ত অবশ্যই হবে। শোকরের কিছু অবস্থাকে ফিকহের ভাষায় অবৈধ আর কিছু অবস্থাকে মাকরূহ বলা হয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মতে সবটাই নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত।

যেমন আপনি যদি ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য করেন তাহলে আপনি দুই হাতের নিয়ামতের না-শোকরি করলেন। কারণ আল্লাহ তাআলা আপনার দুই হাত সৃষ্টি করেছেন। একটির চাইতে অপরটিকে শক্তিশালী করেছেন। যেটি অধিক শক্তিশালী সেটি অধিক মর্যাদা ও সম্মানের উপযোগী। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালীকে সম্মান দেওয়া ন্যায়সঙ্গত কাজ নয়। আর আল্লাহ ন্যায়সঙ্গত কাজ করেন এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ করেন। (সূরা নাহল : ৯০)

তারপর যিনি আপনাকে দুটি হাত দিয়েছেন তিনি সে দুটির কর্মপরিধিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সম্মানিত হাতের কাজ সম্মানিত। যেমন কুরআন মাজীদ ধরা। আর অপর হাতের কাজও তার মান অনুযায়ী। যেমন নাপাকি পরিষ্কার করা। এখন আপনি যদি বাম হাতে কুরআন মাজীদ স্পর্শ করেন আর ডান হাতে নাপাকি পরিষ্কার করেন তাহলে সম্মানিত বস্তুর মাধ্যমে অসম্মানিত কাজ করা সাব্যস্ত হলো। ফলে কাজটি অন্যায় এবং জুলুম হলো।

তদ্রূপ আপনি যদি কিবলার দিকে থুতু ফেলেন অথবা কিবলামুখী হয়ে শৌচ কাজ সম্পাদন করেন তাহলে বিভিন্ন দিক সৃষ্টি এবং জগৎ সৃষ্টির ব্যাপকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার না-শোকরি করলেন। কারণ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে প্রশস্ত করেছেন যাতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারেন এবং যেদিকে ইচ্ছা গমন করতে পারেন। তারপর বিভিন্ন দিক সৃষ্টি করে একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি ঘর বানিয়ে সেটিকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। যাতে মানুষের অন্তর আল্লাহ তাআলার দিকে ঝুঁকে যায়। আর কোনো ইবাদত করার সময় অন্তর যাতে একদিকে নিবন্ধ থাকে। ফলে অন্তরের মাধ্যমে সমগ্র শরীর স্থিরতা ও প্রশান্তির সাথে ইবাদতে মশগুল থাকে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের কাজকর্মকেও দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। উৎকৃষ্ট যেমন তাঁর আনুগত্য করা। নিকৃষ্ট যেমন শৌচ কাজ করা। থুতু ফেলা, সুতরাং কিবলার দিকে থুতু ফেলা, কিবলামুখী হয়ে শৌচ কাজ করা এসবের অর্থ হলো আল্লাহ তাআলার এমন নিয়ামতের নাফরমানি করা যা তিনি ইবাদতের পূর্ণতার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

তদ্রূপ মোজা পরার ক্ষেত্রে প্রথমে বাম পায়ে পরিধান করা এক প্রকার অন্যায় কাজ। কারণ মোজা পরা হয় পা রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য। এজন্য মোজার মধ্যে পায়ের অংশ আছে। আর অংশের ক্ষেত্রেও উৎকৃষ্টের রেয়ায়েত করা জরুরি। তবেই সেটা হবে ন্যায়সঙ্গত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ। এর বিপরীতটা হলো পা এবং মোজার উপর জুলুম করা ও না-শোকরি করার নামান্তর। বাম পায়ে জুতা বা মোজা প্রথমে পরিধান করা আরেফদের মতে হারাম। অবশ্য ফুকাহায়ে কেরাম একে মাকরূহ বলেছেন। এজন্যই কোনো কোনো আল্লাহওয়ালাকে দেখা গেছে, তারা অনেক গম জমা করে তারপর সেগুলো দান করেছেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, 'একবার জুতা পরতে গিয়ে ভুলবশত প্রথমে বাম পায়ে পরে ফেলেছিলাম। তাই সদকার মাধ্যমে এর কাফফারা দিয়েছি।'

অবশ্য ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়টিকে কবিরা গুনাহ বলতে পারেন না। কারণ, তাদের দায়িত্ব জনসাধারণের সংশোধন করা। সাধারণ মানুষ আপাদমস্তক এমনভাবে গুনাহে নিমজ্জিত যে, এসব সাধারণ গুনাহ সেখানে নিতান্তই তুচ্ছ। কেউ বাম হাতে মদের পেয়ালা ধরলে সেটাকে দুই গুনাহ

বলা সঠিক হবে না। ১. মদ পান ২. বাম হাতে পেয়ালা ধরা। তদ্রূপ জুমার আজানের সময় মদ বিক্রি করলে এ কথা বলা যাবে না এক্ষেত্রে দুটি গুনাহ হয়েছে। ১. জুমার আজানের সময় বিক্রয় করা। ২. মদ বিক্রি। আবার কেউ যদি কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয় তাহলে একথা বলা সঠিক হবে না যে কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে ইস্তেঞ্জা করে সে অন্যায় করেছে। তার উচিত ছিল কিবলাকে ডান দিকে রাখা।

সব গুনাহই অন্ধকার। সেটা বড় হোক কিংবা ছোটো। বড় গুনাহের সামনে ছোটো গুনাহ গুরুত্ব রাখে না সেটা ভিন্ন বিষয়। যেমন ভৃত্য যদি মনিবের অনুমতি ছাড়া তার ছুরি ধরে তবে মনিব ভৃত্যকে তিরস্কার করে। কিন্তু ভৃত্য যদি মনিবের অনুমতি ছাড়া তার ছুরিটি নিয়ে তা দিয়ে মনিবের সন্তানকে খুন করে তবে এক্ষেত্রে মনিব তার ছেলেকে খুনের বিচার করবে নাকি অনুমতি ছাড়া ছুরি ধরার কারণে তিরস্কার করবে? আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আল্লাহ তাআলার অলীগণ যেসব আদব ও মুস্তাহাব বিষয়ের প্রতি যত্নশীল হয়েছিলেন ফুকাহায়ে কেরাম জনসাধারণের ব্যাপারে সেসব ক্ষেত্রে উদারতা প্রদর্শনের কারণ হলো আপামর মানুষ বড় বড় গুনাহের কাজে লিপ্ত। এ ধরনের ছোটো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা কীভাবে সম্ভব? অন্যথায় এই সমস্ত মাকরূহ কাজে লিপ্ত হওয়া যে অন্যায় ও নিয়ামতের না-শোকরি এবং বান্দাকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের স্তর থেকে দূরে ঠেলে দেয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অবশ্য কিছু গুনাহ এমন রয়েছে যা (মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও) কেবল নৈকট্যের সীমা থেকে দূরে ঠেলে দেয় এমন নয়; বরং শয়তানের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়।

তদ্রূপ বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া গাছের ডাল ভাঙা মানে গাছের ও হাতের নিয়ামতের না-শোকরি করা।

হাতের না-শোকরি হওয়ার রহস্য হলো, এই হাত আল্লাহ তাআলা অযথা সৃষ্টি করেননি; বরং তাঁর আনুগত্য এবং আনুগত্যের নির্ধারিত কাজের ব্যবহার করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। গাছের না-শোকরি হওয়ার রহস্য হলো, তা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তিনিই এর মধ্যে ডালপালা এবং শেকড় সৃষ্টি করেছেন। যার মাধ্যমে গোটা গাছে পানি পৌঁছে যায়।

তিনিই গাছের মধ্যে খাদ্য যোগাড়ের শক্তি এবং বর্ধন ক্ষমতা দান করেছেন যার মাধ্যমে তাঁর বান্দারা উপকৃত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি অযথাই তা ভেঙে ফেলে সে আল্লাহ তাআলার রহস্যের বিপরীত কাজ করল। আর যদি তার কোনো সদুদ্দেশ্য থেকে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। কারণ গাছপালা এবং জন্তুজানোয়ারকে মানুষের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এসমস্ত কিছু এবং মানুষ সবই ধ্বংসশীল। সুতরাং উত্তমের এক নির্দিষ্ট সময় বহাল থাকার জন্য অধমের ধ্বংস করা উভয়ের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার তুলনায় অধিক ন্যায়সঙ্গত। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ.

তিনি তোমাদের কল্যাণেই আরও নিয়োজিত রেখেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে। (সূরা জাছিয়াহ : ১৩)

অবশ্য অন্যের মালিকানাধীন গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে প্রয়োজনগ্রস্ত হলেও সে গুনাহগার হবে। কারণ গাছ যদিও মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু সকল গাছ যেমন একজন মানুষের জন্য নয়, ঠিক তেমনি একটি গাছ সকল মানুষের জন্য নয়; বরং একটি গাছ দ্বারা একজন মানুষের প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। কোনো প্রকার প্রাধান্য ও বিশিষ্টায়ন ছাড়া একজন মানুষের জন্য একটি গাছ নির্দিষ্ট করে দেওয়া অন্যায়। বিশিষ্টায়ন এবং প্রাধান্য কেবল সে ব্যক্তিরই হতে পারে যে জমিনে বীজ বপণ করেছে, পানি সিঞ্চন করেছে এবং পরিচর্যা করেছে। এই লোকই কেবল এই গাছ থেকে উপকৃত হতে পারে। কোনো অনাবাদি ভূমি কারও পরিচর্যা ছাড়া গজিয়ে উঠেছে এমন গাছ যে আগে দখল করবে তার ভোগ করার অধিকার থাকবে। এটাই ন্যায়পরায়ণতার দাবি। এই বিশিষ্টায়নকে ফুকাহায়ে কেরাম মালিকানা অর্থে ব্যহার করেন। এটা রূপক অর্থে ব্যবহার। অন্যথায় প্রকৃত মালিকানা তো মহান রাজাধিরাজের; আসমান জমিন যার মালিকানাধীন। বান্দা কীভাবে মালিক হতে পারে, অথচ সে নিজেই অন্যের মালিকানাধীন।

অবশ্য সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহ তাআলার দাস। আর জমিন আল্লাহ তাআলা দস্তরখানস্বরূপ। তিনি তাঁর দাসদের তাঁর দস্তরখান থেকে প্রয়োজনমতো

খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এর দৃষ্টান্ত যেমন কোনো বাদশাহ তার ভৃত্যদের জন্য দস্তরখান বিছিয়েছেন। এক ভৃত্য খাবারের লোকমা হাতে নিয়েছে। এমন সময় আরেকজন ভৃত্য এসে তার থেকে সেই লোকমা ছিনিয়ে নিতে চায় তাহলে তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। কারণ, হাতে নেওয়ার দ্বারা লোকমাটি তার হয়ে গেছে। এমন নয় যে, লোকমাটি ধরার কারণে সে তার মালিক হয়ে গেছে। লোকমা এবং লোকমাধারী উভয়ই অধীনস্ত। কিন্তু একটি লোকমা সকল ভৃত্যের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। এজন্যই বিশিষ্টায়ন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর বিশিষ্টায়ন প্রাধান্য দেওয়ার কোনো একটি কারণের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এখানে লোকমা উঠানোর ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া প্রাধান্য দেওয়ার একটি কারণ। এখন একজনের হাত থেকে অপরের ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার নেই।

বান্দার সাথে আল্লাহ তাআলার আচরণও এভাবে বুঝতে হবে। এজন্যই আমরা বলি, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করে সেটা লুকিয়ে রাখে ও আল্লাহ তাআলার অভাবী বান্দাদেরকে বঞ্চিত করে সে ব্যক্তি জালেম। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআন বলেছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.

হে মুমিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসার-বিরাগীদের অনেকেই মানুষের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। (সূরা তাওবা : ৩৪)

এই আয়াতে আল্লাহর রাস্তা বলে তাঁর আনুগত্য উদ্দেশ্য। তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে মানুষের পাথেয় হলো দুনিয়ার সম্পদ। কারণ এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার বান্দাদের প্রয়োজন পূরণ হয়।

যদিও একথা ফিকহি হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ প্রয়োজনের সীমানা গোপনীয়। আর ভবিষ্যতের দরিদ্রতার ব্যাপারে বিভিন্ন লোকের অনুভূতি বিভিন্ন রকম। আর জীবনের শেষক্ষণ সবার অজানা। এখন প্রত্যেক

ব্যক্তিকে মালের ধারাবাহিকতায় এক রকম পরিমাণ নির্ধারণ করা এমন যেমন কোনো শিশুকে গাম্ভীর্য ও স্থিরতার নির্দেশ দেওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে বাধা দেওয়া। শিশু অবুঝ হওয়ার কারণে এসব নির্দেশ মানতে পারবে না। এজন্যই আমরা তাদেরকে হাসি মজা করতে বাধা দিই না। তবে এর মানে এটা নয় হাসিমজা করা ভালো কাজ। তদ্রূপ আমরা সাধারণ মানুষকে সম্পদের যাকাত প্রদান করে সম্পদ রক্ষা করার নির্দেশ দিই। এর মানে এই নয় যে সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা ভালো কাজ। আমরা এ হুকুম এজন্য দিয়েছি কারণ আপামর জনসাধারণ কৃপণস্বভাব, কম সামর্থ্য এবং কম হিম্মতের অধিকারী হয়ে থাকে। তারা আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে যাতীয় সম্পদ খরচ করে ফেলবে এমনটা হবে না।

এদিকে ইশারা করেই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنْ يَسْئَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا.

তিনি তোমাদের কাছে তা চাইলে ও তজ্জন্য তোমাদের বাধ্য করলে তোমরা তো কার্পণ্য করবে। (সূরা মুহাম্মদ : ৩৭)

বরং চূড়ান্ত সত্য ও সর্বাধিক ন্যায়সঙ্গত কথা হলো বান্দা আল্লাহ তাআলার সম্পদ থেকে কেবল ততটুকুই গ্রহণ করবে যতটুকু একজন মুসাফির পাথেয় হিসেবে নিয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজের শরীরে আরোহণ করে পরাক্রমশালী বাদশার উদ্দেশ্যে সফর করে। যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাথেয় বহন করে আর অপর অভাবী সহযাত্রীকে সহায়তা করা থেকে বিরত থাকে, ন্যায়সঙ্গতা পরিহার করার কারণে সে অবিবেচক বলে পরিগণিত হবে। আল্লাহ তাআলার উদ্দিষ্ট রহস্যের বিপরীত কামাইকারী, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের না-শোকরকারী। যে ইলম আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (স) থেকে আমরা পেয়েছি এবং আকল দিয়েও এটাই বুঝে আসে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ কামাই করা দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতেই বিপদের কারণ।

যে ব্যক্তি ইহজগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার রহস্য অনুধাবন করতে পারে সে-ই যথাযথ শোকর আদায় করতে সক্ষম হয়। যথাযথ শোকরের পরিচয় লিখার জন্য অনেকগুলো খণ্ড প্রয়োজন। তারপরও যা

লেখা হবে তা কমই হবে। তবে আমরা যা কিছু লিখেছি এর কারণ হলো কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সত্যতা স্পষ্ট করা।

وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ.

আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ! (সূরা সাবা : ১৩) এবং এটা বুঝতে পারি, বিতাড়িত ইবলিস কেন নিজের কথায় খুশি হয়ে বলেছিল,

وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ.

এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (সূরা আরাফ : ১৭)

পিছনের পৃষ্ঠাগুলোতে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত। যে উপরিউক্ত কথা না বুঝবে, সে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মর্ম বুঝতে পারবে না। যা কিছু আমরা বর্ণনা করেছি এছাড়াও অসংখ্য কথা এমন আছে যার আলোচনা শুরু করতেই জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবে। যেখানে আয়াতের সম্পর্ক প্রত্যেক আরবি জানা ব্যক্তিই তা জানতে পারে। কিন্তু এর তাফসীর সবাই বুঝবে না। এর মাধ্যমেই তাফসীর এবং অর্থের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

এখানে আমাদের বক্তব্যের উপর একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যার সারাংশ হলো, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ রহস্য বা হেকমত রয়েছে। বান্দার কিছু কাজকে তিনি এই হেকমতের পূর্ণতা বা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার মাধ্যম বানিয়েছেন। আবার কিছু কাজকে হেকমতের প্রতিবন্ধকতা বানিয়েছেন। সুতরাং যে কাজ হেকমতের চাহিদানুরূপ হবে এবং যার ফলে হেকমত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে তা হলো শোকর। আর যার মাধ্যমে হেকমত উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত হয় তা হলো না শোকর। এটুকু তো বোঝা গেল। কিন্তু আপত্তি এখনো আছে। তা হলো, বান্দার কাজ হেকমতের পূর্ণতা প্রাপ্তির সহায়ক অথবা প্রতিবন্ধক হয়। এই দুটি কাজই তো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, তাহলে এর মাঝে বান্দা কোথেকে আসে যে কখনো কৃতজ্ঞ হয়, আবার কখনো অকৃতজ্ঞ!

এই আপত্তির উত্তরের জন্য ইলমে মুকাশাফার এক বিশাল মহাসাগরও যথেষ্ট নয়। ইতঃপূর্বে আমরা এদিকে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করেছি। এখন আমরা খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ বিষয়ে আলোচনা করব। যারা পাখির

ভাষা জানে তারাই কেবল এটা অনুধাবন করতে পারবে। দ্রুত চলতে যারা অক্ষম তারা এটা অস্বীকার করতে বাধ্য হবে। আর যারা ঊর্ধ্বজগতে পাখির মতো চক্কর দেয় তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম।

আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব এবং মহত্বের মধ্যে একটি সিফাত আছে যা থেকে সৃষ্টি এবং উদ্ভাবনের কাজ সংঘটিত হয়। এই সিফাত চূড়ান্ত পর্যায়ের বড় এবং মহান। কোনো ভাষাবিদ এই বড়ত্ব ও মহত্বের বর্ণনা দিতে অক্ষম। এই অসীম মহত্ব এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বড়ত্বের বর্ণনা দিতে গেলে এই ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তির সামনে ভাষাবিদের চোখ এমনভাবে মুদে আসে যেমন সূর্যের আলোতে বাদুরের চোখ মুদে আসে। সূর্যের আলোর তো কোনো সমস্যা নেই। প্রকৃত সমস্যা হলো বাদুরের চোখের দুর্বলতা। যারা এই অনন্য গুণের দর্শন লাভ করতে পারে তারা এ বিষয়ের অবস্থা বোঝানোর জন্য কোনো উপমা ব্যবহার করেন ও পরিভাষা নির্ধারণ করেন। তাই তারা 'কুদরত' তথা সক্ষমতা শব্দ ব্যবহার করেন। এর উপর ভিত্তি করে আমরা কলম ধরার দুঃসাহস করেছি এবং এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। তাই আমরা বলছি, আল্লাহ তাআলার কুদরত নামে একটি সিফাত রয়েছে। এই সিফাত থেকেই সৃষ্টি এবং উদ্ভাবন করার কাজ সংঘটিত হয়েছে।

তারপর মাখলুক অস্তিত্বে এসে বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বিভক্তির এই কাজ এবং বিভিন্ন ও বিশেষ গুণে মানুষকে বিভক্ত করা আরেকটি সিফাতের অধীন। যার জন্য জরুরি ভিত্তিতে 'মাশিয়াত' তথা ইচ্ছাধিকার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দ তাদের জন্য ওই সিফাতের কিছুটা তাৎপর্য বহন করে যা ভাষা অর্থাৎ অক্ষর ও আওয়াজের মাধ্যমে আলোচনা করে এবং কথাবার্তা বুঝে। অন্যথায় 'মাশিয়াত' শব্দটি ওই সিফাতের মর্ম বোঝাতে এতটাই অক্ষম যেমন অক্ষম 'কুদরত' শব্দটি সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের মর্ম বোঝাতে।

'কুদরত' থেকে যেসব কার্যাবলি সংঘটিত হয়ে থাকে তার কিছু হেকমতের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে আর কিছু চূড়ান্ত সীমার নিচে অবস্থান করে। এগুলোর প্রতিটির সাথেই 'মাশিয়াত' তথা ইচ্ছাধিকার-এর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ তা এই বিশেষ ক্ষেত্রের দিকে ফিরে যার মাধ্যমে বিভক্তি ও ভিন্নতা পূর্ণতা পায়। ফলে যেসব কার্যাবলি হেকমতের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে

সেগুলোর জন্য 'মহব্বত' তথা পছন্দ আর যেগুলো চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে না সেগুলোর জন্য 'কারাহাত' তথা অপছন্দ শব্দ নির্ধারণ করা হয়। বলা হয়, এ দুটি শব্দ 'মাশিয়াত' তথা ইচ্ছাধিকার-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর প্রত্যেকটিতে সম্পর্কের বিবেচনায় যে বিশেষত্ব রয়েছে তা 'মহব্বত' এবং 'কারাহাত' শব্দ দুটি থেকে সংক্ষেপে বুঝে আসে। তারপর বান্দাও দুপ্রকার। যারা তার সৃষ্টি এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছে তাদের কতক সম্পর্কে অনাদিতে এই 'মাশিয়াত' হয়েছে, তারা এমন সব কাজ করবে যে হেকমত তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছবে না। এটা তাদের ক্ষেত্রে জোরপূর্বক হয়েছে। তাদের মধ্যে এমন প্রেরণা ও কামনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা বাধ্য হয়েই হেকমতের বিপরীত কাজ করে। আবার কতক সম্পর্কে অনাদিতে 'মাশিয়াত' এমনভাবে হয়েছে যে তারা এমন কাজ করবে যে হেকমত পূর্ণতায় পৌঁছবে। উভয় দলের 'মাশিয়াত' তথা ইচ্ছায় এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

যে সম্পর্কের মাধ্যমে হেকমত চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে তার নাম 'রেজা' তথা সন্তুষ্টি আর লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধা দেয় তার নাম 'গযব' তথা অসন্তুষ্টি। যে ব্যক্তির ওপর অনাদিতে 'গযব' লেখা হয়ে গেছে তার থেকে এমন কাজ সংঘটিত হয় যা হেকমতকে তার লক্ষ্যে পৌঁছার পূর্বেই থামিয়ে দেয়। এর নামকরণ করা হয়েছে 'কুফরি'। অভিশাপ, তিরস্কার আর নিন্দা হয় এমন ব্যক্তির উপরি পাওনা। আর যার জন্য অনাদিতে 'সন্তুষ্টি' স্থির হয়েছে তার মাধ্যমে এমন কাজ সংঘটিত হয় যা হেকমতকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। এর নামকরণ করা হয়েছে 'শোকর'। প্রশংসা, উত্তরোত্তর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি এবং কবুল করা হলো তার অতিরিক্ত পাওনা।

সারকথা হলো, আল্লাহ তাআলাই সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন তারপর এর প্রশংসা করেছেন। আবার অসৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন তারপর তার নিন্দা করেছেন। এর দৃষ্টান্ত হলো যেমন কোনো বাদশাহ তার অপরিচ্ছন্ন ভৃত্যকে পরিষ্কার করলেন। তারপর উত্তম কাপড় পরালেন সুন্দর করে সাজালেন। সাজানো শেষ হলে তাকে লক্ষ করে বললেন, 'তুমি খুব সুশ্রী! তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে।' বাস্তবে বাদশাহ নিজেই ভৃত্যকে সাজিয়েছেন আবার তিনিই তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করছেন। বাহ্যত ভৃত্যের প্রশংসা করলেও আসলে তিনি নিজেরই প্রশংসা করছেন।

এমনই হলো অনাদি ব্যবস্থাপনা। উপকরণ এবং মাধ্যমের ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা চলে আসছে রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। যিনি সমস্ত মাধ্যম এবং উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন। এসব কিছুই হুট করে ঘটেনি। কোনো ঘটনাই মাধ্যম ছাড়া ঘটে না। বরং প্রতিটি বাস্তবতার পিছনে একটি অমোঘ বিধান, নিশ্চিত হেকমত ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি কাজ করে যা বোঝানোর জন্য ভাষাবিদগণ 'কাযা' তথা ফয়সালা শব্দ ব্যবহার করেন। কথিত আছে, এই ফয়সালা চোখের পলক ফেলতে যে পরিমাণ সময় লাগে তার থেকেও দ্রুত সংঘটিত হয়। তাকদীর বা ভাগ্যের সমুদ্রের মধ্যে এই 'ফয়সালা'-এর কারণেই জোয়ার-ভাটা, প্রবাহ এবং তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঘটনার এই ধারাবাহিকতা 'কদর' তথা ভাগ্য বলা হয়। যেমন 'কাযা' বা ফয়সালা হলো একটি সামগ্রিক বিষয়। আর ভাগ্য হলো তার বিশদ আলোচনা। যার অনিঃশেষ ধারাবাহিকতা আমাদের সামনে বিস্তৃত। বলা হয়েছে, দুনিয়ার কোনো বিষয় 'কাযা' এবং 'কদর'-এর বাইরে নয়। এজন্যই কোনো কোনো আবেদের এই চিন্তা এসেছে, এতো বিশদভাবে বণ্টন করার কী প্রয়োজন? এতো পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইনসাফ কীভাবে বহাল থাকে? আবার কিছু ব্যক্তি বুঝের স্বল্পতা আর অক্ষমতার কারণে বিষয়টির বাস্তবতা বুঝে উঠতে পারে না। বিষয়টি বিশদভাবে বোঝার যোগ্যতা তাদের থাকে না। বিধায় তাদেরকে এ বিষয়ে আলোচনা করতে বাধা দেওয়া হয়। তাদের বলা হয়, চুপ থাকো! এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়নি। তিনি যা করেছেন এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে না, কিন্তু তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

কিছু লোকের অন্তরে ঐশী নূরের আলো থাকে। তাদের অন্তর আগে থেকেই এই নূর গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে। এজন্যই তাদের উপর যখন খোদায়ী তাজাল্লি প্রতিভাত হয় তখন তা নূরের ওপর নূর হয়ে যায়। তাদের চোখের সামনে আসমান জমিনের সাম্রাজ্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ফলে তারা সকল বিষয়কে তার স্বরূপসহ বুঝতে পারে। তাই তাদের বলা হয় তোমরা আল্লাহ তাআলার শিষ্টাচারের সাজে সজ্জিত হও এবং চুপ থাকো। তাকদীরের কথা আলোচনা হলে এড়িয়ে যাও। কারণ দেওয়ালেরও কান আছে। তোমাদের আশেপাশে অনেক দুর্বল দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি রয়েছে। তোমরা যদিও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন তথাপি

এমনভাবে চলবে যেন তোমাদের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। বাদুড়ের চোখের সামনে সূর্যের সামনে থাকা পর্দা সরিয়ে দিয়ো না। ফলে তা তাদের জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। আল্লাহ তাআলার চরিত্রে চরিত্রবান হও। নিজেদের উঁচু স্থান থেকে নিচে নেমে এসো যাতে দুর্বলরা তোমাদের সঙ্গ নিতে পারে, আড়াল থেকে তোমাদের অন্তরের নূর গ্রহণ করতে পারে। বাদুড় যেমন সূর্যের অবশিষ্ট আলো আর রাতের অন্ধকারে তারকার আলো গ্রহণ করে। কেবল ততটুকু আলোই গ্রহণ করে যা সে সহ্য করতে পারে। এমন লোকদের মতো হও যাদের সম্পর্কে কবি বলেছেন,

شَرِبْنَا شَرَابًا طَيِّبًا عِنْدَ طَيِّبٍ * كَذَاكَ شَرَابُ الطَّيِّبِيْنَ يَطِيْبُ.

شَرِبْنَا وَ أَهْرَقْنَا عَلَى الْأَرْضِ فَضْلَةً * وَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيْبُ.

আমরা ভালো লোকের কাছে ভালো পানীয় পান করেছি। ভালো লোকদের পানীয় ভালোই হয়ে থাকে। আমরা পানীয় পান করেছি আর মাটির উপর পানীয়ের উচ্ছিষ্টাংশ ঢেলে দিয়েছি। মহান ব্যক্তিদের পানপাত্রে জমিনেরও একটা অংশ থাকে।

সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের প্রথম ও শেষ এমনটাই যা আমরা উল্লেখ করেছি। তবে কেবল উপযুক্ত লোকই তা বুঝতে পারবে। আপনি যদি উপযুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে চোখ খুলে দেখে নিতে পারেন। আপনাকে দেখিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। এটা ঠিক যে অন্ধকে পথ চলতে সাহায্য করতে হয় কিন্তু একটি সীমা পর্যন্ত। যদি রাস্তা হয় সংকীর্ণ, তরবারি অপেক্ষা অধিক ধারালো এবং চুল থেকে অধিক সরু তাহলে পাখি ওই রাস্তার উপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে, কিন্তু তার পিছনে কোনো অন্ধকে পার করানো যাবে না। কখনো কখনো রাস্তার মাঝে নদী পড়ে যা পার হওয়ার জন্য সাঁতার জানা লাগে। সাঁতারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিজে পার হতে পারলেও অন্যকে পার করতে পারে না।

এ অঙ্গনে চলায় পারদর্শী ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির তুলনায় পানির উপর দিয়ে চলতে সক্ষম ব্যক্তি জমিনের উপর দিয়ে চলার মতো। সাঁতার কাটা তো একটি শাস্ত্র মাত্র; যা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রপ্ত করা যায়। পক্ষান্তরে পানির উপর দিয়ে চলা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রপ্ত করা যায় না; বরং এর জন্য

প্রয়োজন ইয়াকিনের শক্তি। এজন্যই নবী কারীম (স)-এর কাছে কেউ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শোনা যায় আল্লাহ তাআলার নবী ঈসা (আ) নাকি পানির উপর দিয়ে চলতে পারতেন? নবী কারীম (স) বললেন, ইয়াকিন আরও বেশি হলে তিনি শূন্যের উপর দিয়েও চলতে পারতেন। (তাযীমু কদরিস সালাহ : ৪৮৭; নাওয়াদিরুল উসূল : ৩০৩)

মহব্বত-কারাহাত, রেজা-গযব, শোকর-কুফরি-এর অর্থের ধারাবাহিকতায় এসব কথা ইঙ্গিত মাত্র। ইলমুল মুআমালার মধ্যে তা অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

মানুষের বোঝার সুবিধার্থে আল্লাহ তাআলা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

আর আমি জিন এবং মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমারই ইবাদত করার জন্য। (সূরা যারিয়াত : ৫৬)

ইবাদত হলো বান্দার ক্ষেত্রে হেকমতের চূড়ান্ত সীমা। তারপর আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন তাঁর দুজন বান্দা আছে। এদের একজনকে তিনি পছন্দ করেন। তার নাম জিবরাঈল, রুহুল কুদুস এবং আল আমিন। সে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয়, মান্য, বিশ্বস্ত এবং মর্যাদাবান। আর তিনি আরেকজন বান্দাকে অপছন্দ করেন যার নাম ইবলিস। সে অভিশপ্ত এবং কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশপ্রাপ্ত।

তারপর বলেছেন, জিবরাঈল সত্যের পথ প্রদর্শন করে। ইরশাদ করেন,

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ.

বলুন, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পবিত্র আত্মা জিবরাঈল সত্যসহ এটা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছে। (সূরা নাহল : ১০২)

আরেক আয়াতে বলেছেন,

يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ.

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহি প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ। (সূরা মুমিন : ১৫)

আর ইবলিস ভ্রষ্টতার পথ দেখায় বলে ইরশাদ হয়েছে,

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ.

তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। (সূরা যুমার : ৮)

ভ্রষ্ট করার অর্থ হলো বান্দাকে হেকমতের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছতে না দেওয়া। ভেবে দেখুন, ভ্রষ্টতাকে আল্লাহ তাআলা তার অভিশপ্ত বান্দার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। পথ-প্রদর্শন অর্থ বান্দাকে হেকমতের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছানো। এখানেও লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ তাআলা এটাকেও তাঁর প্রিয় বান্দার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। সমাজে এরকম সম্পর্কের উদাহরণ মিলে। যেমন বাদশার দুজন ভৃত্য প্রয়োজন। একজন পানি পান করাবে অপরজন রক্তমোক্ষণ করাবে এবং ঘরবাড়ি ঝাঁট দিবে। এজন্য তিনি দুজন ভৃত্য নিয়োগ দিলেন। স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত ভালো ভৃত্যটিকে তিনি পান করানোর দায়িত্ব এবং কম ভালো ব্যক্তিটিকে তিনি রক্ত মোক্ষণ ও ঝাড়ু দেওয়ার দায়িত্ব দেবেন।

এখন আপনি কোনো কাজ করার পর এটা বলতে পারেন না যে তা আপনার কাজ; আল্লাহ তাআলার কাজ নয়। ভালো কিংবা মন্দ যে কাজই মানুষ করে কোনোটাই সে নিজে নিজেই করে এমনটা নয়। মানুষের দিকে কাজের সম্পর্ক করা হয় মাত্র। প্রকৃত অনুঘটক হলেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনি মানুষকে শক্তি দেন বলেই সে করে। মানুষ তো ফেরেশতা নয় যে তাকে যে অবস্থায় সৃষ্টি করা হয় সে অবস্থাতেই সে স্থির থাকে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ তাদের আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তা-ই করে। (সূরা তাহরীম : ৬)

মূলত মানুষকে ভালো মন্দ উভয় প্রকার কাজ করার ক্ষমতা দিয়ে রাখা হয়েছে, সে যে কাজ করবে সে অনুসারেই তার বিচার-বিবেচনা হবে। এটাই হলো ইলমুল মুকাশাফার মূলকথা। এসমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা আল্লাহ এবং জ্ঞানে সুগভীর বান্দারা ছাড়া কেউ জানেন না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) 'জ্ঞানে সুগভীর' বান্দাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে

বলেছেন, তারা এমন জ্ঞানের ধারক যা আপামর সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না। এরপর তিনি কুরআনের আয়াত, يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ এগুলোতে (সপ্ত আকাশ ও জমিন) তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, (সূরা ত্বলাক : ১২) এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বললেন, 'এই আয়াতের এমন ব্যাখ্যা আমি জানি যা বললে তোমরা আমাকে পাথর মেরে হত্যা করবে।' অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমাকে কাফের বলবে।'

আমরা আপাতত এখানেই এ সংক্রান্ত কথার ইতি টানছি। কারণ কথা যথেষ্ট লম্বা হয়ে গেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইলমুল মুআমালার সাথে অন্য কথার সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাই আমরা পিছনে রেখে আসা শোকরের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করছি।

আমাদের আলোচনা চলছিল শোকরের উদ্দেশ্য নিয়ে। শোকরের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বলা হয়েছে, বান্দার মধ্যে যে সর্বাধিক শোকরকারী সে আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় এবং আল্লাহ তাআলার সে-ই অধিক নিকটবর্তী হলেন ফেরেশতাগণ। তাদেরও স্তরগত বিন্যাস রয়েছে। কারও কারও এক বিশেষ অবস্থা রয়েছে। সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হলেন ইসরাফিল (আ)। ফেরেশতাদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হলো তারা সম্মানিত এবং পূতপবিত্র। নবীগণ পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাদের ইসলাহ করেছেন।

এই ফেরেশতাদের পরবর্তী স্তর হলো নবীগণের স্তর। কারণ তাঁরা সত্তাগতভাবেই উত্তম। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানুষকে পথের দিশা দিয়েছেন। নিজের হেকমত পূর্ণ করেছেন।

নবীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন আমাদের নবী (স)। কারণ তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দীনকে পূর্ণ করেছেন। নবীগণের সমাপ্তি টেনেছেন।

নবীগণের পরের স্তর হলো সাহাবায়ে কেরাম, তারপর ওলামায়ে কেরামের স্তর। তাঁরা হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। তাঁরা সত্তাগতভাবে সৎ। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষকে সংশোধন করেন।

সমস্ত আলেমের স্তর সমান নয়; বরং প্রত্যেকের স্তরগত পার্থক্য নিজের সংশোধন এবং অপরের সংশোধন করার যোগ্যতা হিসেবে নিরূপিত।

ওলামায়ে কেরামের পরবর্তী স্তরে আছেন ন্যায়পরায়ণ শাসকগণ। কারণ ওলামায়ে কেরাম মানুষের দীনি সংশোধন করে থাকেন আর ন্যায়পরায়ণ শাসক মানুষের দুনিয়াবি সংশোধন করেন।

আমাদের নবী কারীম (স)-এর কাছে দীনও ছিল সাম্রাজ্যও ছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে দীন এবং দুনিয়া উভয়ের সংশোধনের পূর্ণতা দিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে কোনো নবী অহি এবং রাজত্ব একত্রে পাননি।

আলেম এবং নেককার বাদশাহগণ এর পরবর্তী স্তরের। এরা নিজের দীন ও নফসের সংশোধন করে থাকেন। এই লোকদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার হেকমত পূর্ণতা পায় না। তবে তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এছাড়া অন্য লোকেরা কোনো দলেই নেই।

মুসলমান শাসক দীনে মুহাম্মদিকে শক্তিশালী করার ভিত্তি। এজন্য তারা জালেম বা ফাসেক হলেও তাদেরকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেছেন, জালেম শাসক স্থায়ী ফেতনা থেকে উত্তম। (কূতুল কুলূব : ২ : ১২৫)

নবী কারীম (স) বলেছেন,

سَيَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ يُفْسِدُوْنَ وَمَا يُصْلِحُ اللهُ بِهِمْ اَكْثَرُ، فَإِنْ اَحْسَنُوْا فَلَهُمُ الْاَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَإِنْ اَسَاؤُوْا فَعَلَيْهِمُ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ.

অচিরেই তোমাদের উপর কিছু শাসক নিযুক্ত হবে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, অবশ্য আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে সংশোধনের কাজ নিবেন অধিক। তারা ভালো কাজ করলে প্রতিদান পাবে। তোমাদের কাজ হবে শোকর আদায় করা। আর মন্দ কাজ করলে প্রতিফল তারা পাবে। তোমাদের কর্তব্য হবে সবর করা। (কূতুল কুলূব : ২ : ১২৫; আল কামিল : ২ : ২২০; শুআবুল ঈমান : ৬৯৮৩; মুজামে কাবীর : ১০ : ১৩২)

সাহল তস্তরী (র) বলেছেন, যে ব্যক্তি শাসকের নেতৃত্ব অস্বীকার করে, সে যিন্দীক বা অবিশ্বাসী। আর যে শাসকের দাওয়াত কবুল করে না, সে বিদআতী। আর যে দাওয়াত ছাড়াই শাসকের দরবারে উপস্থিত হয়, সে মূর্খ। (কূতুল কুলূব : ২ : ১২৫)

সাহল তস্তরী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বত্তোম মানুষ কে? তিনি উত্তর দিলেন, শাসক। বলা হলো, আমরা তো শাসককে নিকৃষ্টতম মানুষ বলেই জানি। তিনি বললেন, এমনটা বলো না। আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন শাসকদের দুটি কথা লক্ষ করেন। প্রথম কথা হলো, মুসলমানদের সম্পদ যেন নিরাপদ থাকে। দ্বিতীয় কথা হলো, মুসলমানদের জান যেন নিরাপদ থাকে। এদুটি কথাই তাদের আমলনামায় থাকে। ফলে আল্লাহ তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন। (কূতুল কুলূব : ২ : ১২৫)

সাহল তস্তরী (র) বলতেন, শাসকদের দরজায় ঝুলানো কালো লাঠি সত্তরজন নসিহতকারী অপেক্ষা উত্তম। (কূতুল কুলূব : ২ : ১২৫)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
শোকরযোগ্য বস্তু

শোকরযোগ্য বস্তু হলো নিয়ামত, এখানে নিয়ামতের স্বরূপ, প্রকার এবং স্তর বর্ণনা করা হবে। এটাও বর্ণনা করা হবে যে, কোনটি সাধারণ নিয়ামত আর কোনটি নিশেষ নিয়ামত।

নিয়ামতের স্বরূপ ও প্রকারভেদ

মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহ গণনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا.

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। (সূরা নাহল : ১৮)

আমরা এখানে প্রথমে কয়েকটি সামগ্রিক বিষয় উল্লেখ করব, যা নিয়ামতসমূহ চেনার মূলনীতি হিসেবে কাজ করবে। এরপর পৃথক পৃথক নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করব।

প্রসঙ্গত, প্রত্যেক কল্যাণ, আনন্দ, বরং প্রত্যেক কাঙ্ক্ষিত বিষয়কেই নিয়ামত বলা যায়। কিন্তু বাস্তবে পরকালীন সৌভাগ্যের নামই নিয়ামত।

এছাড়া অন্যগুলোকে নিয়ামত হিসেবে আখ্যায়িত করা ভুল, না হয় রূপক হিসেবে। যেমন— যে দুনিয়াবি সৌভাগ্যের দ্বারা আখেরাতে সহায়তা হয় না, তাকে নিয়ামত বলা বোকামি। সুতরাং যে বিষয় পরকালীন সৌভাগ্য পর্যন্ত পৌছে দেয় কিংবা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে তাতে সহায়ক হয়, তার নাম নিয়ামত রাখা সঠিক। কেননা, এর কারণে সত্যিকার নিয়ামত অর্জন করা যায়। এসব বিষয়কে আমরা কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি।

১. যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে কল্যাণকর। যেমন, ইলম ও সচ্চরিত্র।

২. যা উভয় জগতে ক্ষতিকর। তা হচ্ছে, অজ্ঞতা ও অসচ্চরিত্র।

৩. যা দুনিয়ায় উপকারী কিন্তু আখেরাতে ক্ষতিকর, যেমন কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে আনন্দ লাভ করা।

৪. যা দুনিয়ায় অপকারী এবং আখেরাতে উপকারী। যেমন, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা।

এগুলোর মধ্যে প্রথম প্রকারই হচ্ছে, প্রকৃত নিয়ামত। কারণ, এটা দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণকর। আর দ্বিতীয় প্রকার, যা উভয়কালে ক্ষতিকর, তা সত্যিকার বিপদ। যা দুনিয়াতে উপকারী কিন্তু আখেরাতে ক্ষতিকর, তা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের নিকট একান্ত বিপদ। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা একে নিয়ামত মনে করে। যেমন কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি বিষ বিশ্রিত মধু পেল। সে বিষ সম্পর্কে না জানলে এই মধুকে নিয়ামত মনে করবে। কিন্তু অসুস্থ হওয়ার পর বুঝতে পারবে, এটা ছিল তার জন্য বিপদ। যে বিষয় দুনিয়াতে ক্ষতিকর এবং আখেরাতে উপকারী, তা বুদ্ধিমানদের মতে নিয়ামত এবং মূর্খদের মতে বিপদ। এটা বিস্বাদ ওষুধের মতো, যা বর্তমানে তিক্ত; কিন্তু পরিণামে উপকারী। অবুঝ শিশুকে এই ওষুধ সেবন করালে সে একে বিপদ মনে করে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এটাকে নিয়ামত মনে করে এবং যে এই ওষুধ দেয়, তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। তদ্রূপ মা সন্তানকে শিঙ্গা লাগাতে (শরীর থেকে দুষিত রক্ত বের করতে) বাধা দিলেও বাবা এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কারণ বাবা পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে কাজের পরিণতি আন্দাজ করতে পারেন। পক্ষান্তরে মা অপরিপক্কতা ও সন্তানের প্রতি ভালোবাসার আধিক্যের কারণে বর্তমান অবস্থা লক্ষ করেন। আর ছোট সন্তান অজ্ঞতার কারণে বাবার পরিবর্তে

মায়ের প্রতি অনুরক্ত হয়। ভাবে, বাবা তার ভালো চায় না। অথচ বিষয়টি জানলে সে উপলব্ধি করতো যে, মা তার আপাত কষ্ট দেখলেও বাবা তাকে ভবিষ্যতের কষ্ট থেকে রেহাই দিতে চান। এজন্যই প্রবাদ আছে, মূর্খ বন্ধু থেকে জ্ঞানী শত্রু ভালো। প্রতিটি মানুষ তার নফসের বন্ধু। কিন্তু সে হলো মূর্খ বন্ধু। তাই তাকে দিয়ে এমন সব কাজ করায় যা শত্রুও তাকে দিয়ে করায় না।

মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার সকল বস্তুতে ভালোমন্দ অবশ্যই রয়েছে। এমন ভালো বিষয় খুব কম, যা সার্বিকভাবে পবিত্র। যেমন— ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন। এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে, যার ক্ষতি অধিকাংশ লোকের জন্য উপকারের চেয়ে বেশি। যেমন— ধনাঢ্যতা। আবার কিছু বিষয়ের উপকার ও ক্ষতি একই রকম। এগুলো বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অনেক ভালো মানুষ ধনসম্পদের মাধ্যমে অনেক উপকার লাভ করে এবং সম্পদ বেশি হয়ে গেলে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে। এরূপ তাওফিকসহ কেউ এরকম ধনসম্পদ পেলে তা তার জন্য অবশ্যই নিয়ামত। অনেক মানুষ অল্প সম্পদে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ, সব সময় একে কম মনে করে, আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে এবং অধিক সম্পদ তালাশ করে। এ ধরনের সম্পদ তার জন্য শুধুই বিপদ।

মনে রাখতে হবে, অপরের বিবেচনায় ভালো বস্তুসমূহ তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমত যা সত্তাগতভাবে উত্তম, দ্বিতীয়ত যা অন্য সৃষ্টির জন্য উদ্দিষ্ট, তৃতীয়ত যা সত্তাগত এবং অপরের উপায় উভয় দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট। সত্তাগত দিক দিয়ে উত্তম বিষয়গুলোর কোনো কোনোটি সরাসরি উদ্দিষ্ট ও পছন্দনীয় হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলার দীদার ও সান্নিধ্যের আনন্দ। এরূপ আখেরাতের সৌভাগ্য কখনো পৃথক হয় না। এ সৌভাগ্যকে অন্য কোনো সৌভাগ্য অর্জনের উপায় হিসেবে তালাশ করা হয় না সত্তাগত দিক দিয়ে; বরং এটাই সরাসরি কাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে।

কিছু উত্তম বিষয় অন্য বিষয় সৃষ্টি করার জন্য উদ্দিষ্ট হয়, যেমন সোনা-রুপা। মানুষের প্রয়োজন না মিটলে সোনা-রুপা ও পাথরের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। যেহেতু এগুলো অনেক আনন্দ লাভের উপায়, সেজন্য

এগুলো মানুষের নিকট খুবই প্রিয়। তারা এগুলো সঞ্চয় করে পুঁতে রাখে এবং লৌকিকতার সাথে খরচ করে। ধীরে ধীরে তারা এগুলোর বেড়াজালে আটকে পড়ে প্রকৃত নিয়ামতদাতাকে ভুলে যায় এবং এগুলোকেই মূল উদ্দেশ্য মনে করতে থাকে। আর এটা চরম অজ্ঞতা ও গোমরাহি।

সত্তাগত এবং অপরের উপায়, উভয় দিক দিয়ে কোনো কোনো উৎকৃষ্ট জিনিসের উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন, সুস্থতা ও নিরাপত্তা। মানুষ আল্লাহর যিকিরে মগ্ন হওয়ার জন্য এগুলো আশা করে অথবা পার্থিব আনন্দ পুরোপুরি লাভ করার উপায় হিসেবে আশা করে। আবার মাঝে মধ্যে সুস্থতা তার পায়ের সত্তাগত দিকে থেকে সরাসরি কাম্য হয়ে থাকে। যেমন কোনো ব্যক্তির পায়ে হাঁটার দরকার না থাকলেও সে তার পায়ের নিরাপত্তা আশা করে।

উল্লিখিত তিন প্রকার উৎকৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে প্রকৃত নিয়ামত হচ্ছে প্রথম প্রকার; অর্থাৎ, যা সত্তাগত দিক থেকে সরাসরি উদ্দিষ্ট ও পছন্দনীয়। তৃতীয় প্রকারও নিয়ামত তবে প্রথম প্রকারের চেয়ে কম। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার যা শুধু অন্য বিষয়ের উপায় হিসেবেই কাঙ্ক্ষিত হয়। যেমন— সোনা-রুপা, একে খনিজ পদার্থ হওয়ার দিক থেকে নিয়ামত বলা যায় না। উপায় ও মাধ্যম হওয়ার দিক থেকে বলা যায়। এ অবস্থায় সোনা-রুপা এমন ব্যক্তির জন্যই নিয়ামত হবে, যে এগুলো ব্যতীত উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে না। যদি তার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন ও ইবাদত হয় এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তার নিকট থাকে, তবে তার নিকট সোনা ও মাটির মধ্যে পার্থক্য নেই। সোনা-রুপা থাকার কারণে যদি ইবাদতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তবে ইবাদতকারীর জন্য এগুলো নিয়ামত নয়— আযাব।

অন্য এক দিক থেকে কল্যাণ তিন প্রকার। যথা:

১. উপকারী। যার ফলাফল শেষে পাওয়া যায়।

২. আনন্দদায়ক। যার উপকার তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়।

৩. সুন্দর। যা সব দিক থেকেই উত্তম।

যখন এই তিনটি বৈশিষ্ট্য একসাথে পাওয়া যাবে তখন তা পরিপূর্ণ কল্যাণকর হবে। যেমন, ইলম ও হেকমত (প্রজ্ঞা)। যা ইলম ও হেকমতের অধিকারী ব্যক্তির নিকট উপকারী, আনন্দদায়ক ও সুন্দর।

এমনিভাবে অকল্যাণ তিন প্রকার। যথা :

১. ক্ষতিকর। ২. ঘৃণ্য। ৩. যন্ত্রণাদায়ক। যেমন, মূর্খতা। এটা ক্ষতিকর, ঘৃণ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক। মূর্খ ব্যক্তি যখন জানতে পারে সে মূর্খ, তখন সে মূর্খতার যন্ত্রণা অনুভব করে। কারণ তার উপলব্ধি হয় সে মূর্খ আর সবাই জ্ঞানী। তখন অসম্পূর্ণতার যন্ত্রণা তাকে পেয়ে বসে। ফলে তার মধ্যে জ্ঞানের আকর্ষণীয় স্বাদ আস্বাদনের আগ্রহ জেগে ওঠে। তারপর কখনো কখনো হিংসা, অহংকার এবং শারীরিক চাহিদা তাকে বাঁধা দেয়। ফলে দুটি শক্তি তাকে দুদিকে টানতে থাকে। ফলে তার যন্ত্রণা বেড়ে যায়। শিক্ষা ছেড়ে দিলে অজ্ঞতা এবং অসম্পূর্ণতার যন্ত্রণা ভোগ করে। আবার শিখতে গেলে প্রবৃত্তি এবং অহংকার ছেড়ে শেখার জন্য নীচ হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করে। এমন ব্যক্তি সর্বদা যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে।

কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যেখানে কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়টি থাকে। কিছু উপকারী বস্তু যন্ত্রণাদায়ক হয়। যেমন, নষ্ট আঙুল কেটে ফেলা। শরীরের ফোঁড়া অপারেশন করা। এগুলো কষ্টদায়ক হলেও উপকারী।

আবার কোনো কোনো উপকারী বস্তু ঘৃণ্য হয়ে থাকে। যেমন, নির্বুদ্ধিতা। এ অবস্থা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপকারী। প্রবাদ আছে, 'নির্বোধ ব্যক্তি শান্তিতে থাকে।' কারণ, ভবিষ্যত নিয়ে তাকে চিন্তা করতে হয় না। তাই মৃত্যু পর্যন্ত সে নিশ্চিন্তে থাকে। আবার কিছু বস্তু একদিক থেকে উপকারী কিন্তু আরেক দিক থেকে ক্ষতিকর।

নদীতে দুর্ঘটনায় পতিত হলে নৌকা থেকে ভারি মাল ফেলে দেওয়া। এতে করে মালসম্পদ নষ্ট হলেও ডুবে যাওয়া থেকে নিজের জান বেঁচে যাবে।

উপকারী বস্তু দুই ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার তো আবশ্যক। আরেক প্রকার আবশ্যক নয়। প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো ঈমান এবং উত্তম চরিত্র যা পরকালীন সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। আর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো সাকানজাবিন (ওষুধ বিশেষ), যা জন্ডিস নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। কারণ জন্ডিস নিরাময়ের বিকল্প ওষুধ আছে।

জ্ঞাতব্য, প্রত্যেক আনন্দদায়ক বস্তুই নিয়ামত। আর এই আনন্দ মানুষ এবং অন্য সকল প্রাণির দিক থেকে তিন প্রকার।

১. বুদ্ধিনির্ভর। ২. এমন আনন্দ যা কতক প্রাণির সাথে সম্পৃক্ত। ৩. যা সকল প্রাণির সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো, ইলম ও হিকমতের আনন্দ। এই আনন্দ শুধু অন্তরে লাভ হয়। অন্য কোনো ইন্দ্রিয়ের তা লাভ হয় না। অন্তরে এই আনন্দ লাভ হয় আকলের মাধ্যমে। আর এই প্রকার আনন্দ খুব কম মানুষই লাভ করে থাকে। কেননা, আলেম ও হাকিম ব্যতীত এই আনন্দ অন্য কেউ লাভ করতে পারে না। তা ছাড়া এই আনন্দ অনেক সম্মানের। কারণ, মানুষ তা সর্বদা অনুভব করতে থাকে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই। তা কখনো দূর হয় না।

পেট ভরে যাওয়ার পর খাবারের প্রতি অনীহা চলে আসে। আবার জৈবিক চাহিদা মিটে যাওয়ার পর সহবাস করা কষ্টকর মনে হয়। পক্ষান্তরে ইলম ও হিকমতের আনন্দ থেকে না কখনো তৃপ্তি আসে, আর না কখনো অনীহা চলে আসে।

যে ব্যক্তি এমন চিরস্থায়ী ও সম্মানিত জিনিস করতে সক্ষম হয়েও ক্ষণস্থায়ী ও তুচ্ছ জিনিসের প্রতি সন্তুষ্ট হয় তার মস্তিষ্কে সমস্যা আছে। তাকে হতভাগা ছাড়া আর কী বলা যায়! ইলমের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কথা হলো, ইলম ও বুদ্ধিমত্তার নিরাপত্তার জন্য কোনো পাহারাদার প্রয়োজন হয় না। স্বয়ং ইলমই তার অধিকারীকে পাহারা দেয়। পক্ষান্তরে সম্পদ পাহারা দিয়ে রাখতে হয়। ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে সম্পদ খরচ করলে হ্রাস পায়। সম্পদ চুরি হতে পারে, পদ হতে অব্যহতি মিলে, পক্ষান্তরে ইলম চুরি করা যায় না এবং ইলম থেকে কাউকে অব্যহতি দেওয়া যায় না। ইলমের বাহক সদা নিশ্চিন্ত থাকে। পক্ষান্তরে সম্পদ ও খ্যাতির বাহক সর্বদা আশঙ্কা ও আতঙ্কের মধ্যে থাকে।

এছাড়াও ইলম সবসময় উপকারী, আনন্দদায়ক ও সুন্দর হয়ে থাকে। আর সম্পদ দিয়ে কখনো মুক্তি পাওয়া যায় আবার কখনো বিপদে পড়তে হয়। একারণেই আল্লাহ তাআলা সম্পদকে কিছু জায়গায় 'খায়ের' বা কল্যাণ বললেও অধিকাংশ স্থানেই এর নিন্দা করেছেন।

অধিকাংশ ব্যক্তি ইলমের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ কয়েকটি হতে পারে। হয়তো তাদের রুচিই নেই। রুচি না থাকার কারণে তারা ইলমের বিষয়ে জানে না এবং এ ব্যাপারে তাদের আগ্রহ নেই। রুচি থাকলেই মানুষ

আগ্রহ বোধ করে। অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করার ফলে মেজায নষ্ট হয়ে গেছে এবং অন্তকরণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে বিধায় তারা ইলমের স্বাদ উপভোগ করতে পারে না। যেমন অসুস্থ ব্যক্তি মধুর স্বাদ তো পায়ই না, উলটো তিতা মনে করে, অথবা সৃষ্টিগতভাবে অসম্পূর্ণ থাকার কারণে তারা ইলমের স্বাদ উপভোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। যেমন দুধের শিশু মধু বা মজাদার খাবারের স্বাদ বুঝতে পারে না। সে শুধু মাত্র দুধের স্বাদই বুঝতে পারে। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না উক্ত খাবার মজাদার নয়। কিংবা দুধই একমাত্র মাজাদার খাবার এমনটাও নয়।

মোটকথা, ইলমের স্বাদ বুঝতে অক্ষম এমন ব্যক্তি তিন প্রকার।

১. অন্তর শিশুর মতো হওয়ায় যাদের মধ্যে ইলমের চাহিদাই তৈরি হয়নি।

২. প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে যাদের চাহিদার মৃত্যু ঘটেছে।

৩. প্রবৃত্তি অনুসরণের ফলে যাদের অন্তঃকরণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

আল্লাহ তাআলা فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ (তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে [সূরা বাকারা : ১০]) বলে উক্ত ব্যধির দিকে এবং لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا (যাতে আপনি জীবিতদের সতর্ক করতে পারেন [সূরা ইয়াসীন : ৭০]) বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যার অন্তর জীবিত নয় সে ব্যক্তি জীবন্মৃত। শরীর জীবিত থাকা সত্ত্বেও যদি অন্তঃকরণ মৃত থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ তাআরার নিকট মৃত বলেই গণ্য হবে। যদিও মূর্খরা তাদের জীবিত বলে। তদ্রূপ শহিদদের অন্তর জীবিত বলেই আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ. فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের কাছে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের অনুবর্তী যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এজন্য যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এ কারণে যে, আল্লাহ কখনোই মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। (সূরা আলে ইমরান : ১৬৯-১৭১)

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, যা মানুষসহ কতক প্রাণির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, নেতৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্ব ইত্যাদি। যা মানুষের সাথে সাথে বাঘ, সিংহের মধ্যেও থাকে।

তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ, যা সকল প্রাণির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, উদর ও যৌনাঙ্গের আনন্দ। এই প্রকার আনন্দ সবচেয়ে নিম্নমানের এবং সকল প্রাণির মধ্যেই তা পাওয়া যায়। দীন থেকে উদাসীন ব্যক্তির মাঝে এমন অবস্থা অধিক পরিলক্ষিত হয়। যে এই স্তর ছাড়িয়ে যায় সে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে আক্রান্ত হয়ে যায়। আর গাফেলদের এটাই অতিমাত্রায় হয়ে থাকে। আর যে এইগুলো অতিক্রম করতে পারে সে প্রথম স্তরে উপনীত হয়। ফলে সে ইলম, হিকমত এবং সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার সত্তা, গুণাবলি এবং কর্মের মারেফাত লাভে সক্ষম হয়। এটা হলো সিদ্দীকগণের স্তর। অন্তর থেকে নেতৃত্ব এবং পদের মোহ বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এই স্তর পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জিত হয়। আর সিদ্দীকগণের মস্তিষ্ক থেকে সর্বশেষে বের হয় এই নেতৃত্বের মোহ। আর উদর ও প্রবৃত্তির চাহিদা তো সালেহগণই দমন করতে পারেন। কিন্তু নেতৃত্বের মোহ সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ দমন করতে পারেন না। আর এ মোহের সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করা এমনভাবে যাতে মনের মধ্যে এর চিন্তাও না আসে, তা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত। তবে এমন হওয়া সম্ভব যে, আল্লাহ তাআলার মারেফাতের স্বাদ এমনভাবে অন্তরে ছেয়ে যাবে যে নেতৃত্ব ও পদের মোহ ঠাঁই পাবে না। কিন্তু সারা জীবন এমন অবস্থা থাকে না; বরং কিছুটা ত্রুটি দেখা দেয়। এই অবস্থায় মনের মধ্যে মানবিক দুর্বলতা ফিরে আসতে পারে। কখনো তা বিদ্যমান থাকে আবার কখনো অবদমিত থাকে। নফসকে কখনো সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা যায় না।

এই বিবেচনায় অন্তর চার প্রকার।

এক প্রকার অন্তর কেবল আল্লাহ তাআলাকেই ভালোবাসে। আল্লাহ তাআলার মারেফাত বৃদ্ধি এবং তাঁর ফিকিরের মাধ্যমেই কেবল স্বস্তি লাভ করে। আরেক প্রকার অন্তর আল্লাহ তাআলার মারেফাত ও আল্লাহ তাআলার প্রতি গভীর ভালোবাসার মর্মই বুঝে না। তা কেবল যশখ্যাতি, পদ, সম্পদ এবং জৈবিক লিপ্সার প্রতিই লালায়িত থাকে। এক প্রকার অন্তর অধিকাংশ সময় আল্লাহ তাআলার মারেফাত, মহব্বত এবং ফিকির নিয়েই থাকে। তবে কখনো কখনো তা মানবিক দুর্বলতারও শিকার হয়ে যায়। আরেক প্রকার অন্তর অধিকাংশ সময় মানবিক চাহিদা নিয়েই মজে থাকে। তবে কখনো কখনো ইলম ও মারেফাত নিয়েও সচেষ্ট হয়।

প্রথম প্রকার অন্তর তো পাওয়াই যায় না। কখনো পাওয়া গেলেও এর সংখ্যা অতি নগণ্য। দ্বিতীয় প্রকার অন্তর তো দুনিয়া দিয়ে পূর্ণ। তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকার অন্তর বিদ্যমান আছে, কিন্তু খুবই বিরল। কিঞ্চিতই সন্ধান মিলে। অবশ্য সব যুগেই তার কম বেশি অস্তিত্ব থাকে। এর আধিক্য ছিল নবীদের যুগের কাছাকাছি যুগে। নবীযুগ থেকে দূরত্ব যতো বাড়ছে এবং কিয়ামত ঘনিয়ে আসছে ততো দু'প্রকার অন্তর বিশিষ্ট লোকদের সংখ্যা কমে আসছে।

এই সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ হলো, এমন অন্তর হলো আখেরাতের রাজত্বের সূচনা। রাজত্ব অনেক মূল্যবান হলেও রাজার সংখ্যা কম। রাজত্ব আর সৌন্দর্যের গুণে গুণান্বিত মানুষের সংখ্যা কমই হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের সংখ্যই বেশি হয়। আখেরাতের ক্ষেত্রেও বিষয়টা এমনই। (দুনিয়া আখেরাতের উভয় জগতেই অগ্রগামী হবে এমন লোকের সংখ্যা নগণ্য।)

এর কারণ, দুনিয়া হলো আখেরাতের নমুনা। দুনিয়া হলো দৃশ্য জগৎ আর আখেরাত হলো অদৃশ্য জগৎ। আর দৃশ্য জগৎ হলো অদৃশ্য জগতের অনুগামী। যেমন আয়নায় দেখা প্রতিবিম্ব হলো দর্শকের অনুগামী। আয়নায় দেখা প্রতিবিম্ব দ্বিতীয় অস্তিত্ব হলেও তা দর্শকের দেখার উপর নির্ভরশীল। কারণ কেউ নিজেকে দেখতে পায় না। আয়নার মধ্যেই চিত্র প্রথম দেখা যায়। আয়ানার মধ্যেই গঠন দেখা হয় যা পরবর্তীতে বর্ণনা করা যায়। ফলে অস্তিত্বের মধ্যে যা অনুসারী, পরিচয় জানার ক্ষেত্রে তা অনুসৃত হয়ে গেল। যা ছিল অগ্রগামী তা হয়ে গেল পশ্চাদগামী। এটা

একটা প্রতিফলন। এই প্রতিফলন এ জগতের অপরিহার্য অংশ। তদ্রূপ দৃশ্যমান হলো অদৃশ্য জগতের প্রতিফলন বা প্রতিচ্ছবি।

কারও কারও জন্য চিন্তাভাবনার দৃষ্টি সহজ করে দেওয়া হয়েছে। তারা ইহজগতের সব কিছুই পরকালের কথা চিন্তা করে করেন। আল্লাহ তাআলা এভাবেই চলার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

فَاعْتَبِرُوْا يٰأُولِي الْأَبْصَارِ.

অতএব, হে দৃষ্টিবান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। (সূরা হাশর : ২)

আবার কেউ কেউ অন্তর্দৃষ্টি না থাকায় শিক্ষা নেয় না। তার দৃষ্টি কেবল দৃশ্যমান জগতেই আবদ্ধ থাকে। এই দুনিয়াতেই তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এই দুনিয়া এমন আগুন দ্বারা ভর্তি থাকে যা তার অন্তরের উপর উঁকি দেয়। তবে তার এবং যন্ত্রণার মাঝে একটি আবরণ থাকে। মৃত্যুর মাধ্যমে সেই আবরণ সরে গেলে সে যন্ত্রণা উপলব্ধি করবে।

একারণেই আল্লাহ তাআলা একদল সত্যান্বেষী মানুষের মাধ্যমে সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তারা বলেছেন, 'জান্নাত এবং জাহান্নাম দুটি সৃষ্ট বস্তু।' কিন্তু জাহান্নাম কখনো জানার মাধ্যমে উপলব্ধি হয় আবার কখনো কখনো ভোগ করার মাধ্যমে উপলব্ধি হবে। ভোগ করার মাধ্যমে উপলব্ধি হবে কেবল আখেরাতে। আর জানার মাধ্যমে উপলব্ধি দুনিয়াতেই হওয়া সম্ভব। তবে এটা তাদের জন্য যারা আখেরাতের জন্য নিজেদের অংশ সংরক্ষণ করে রেখেছে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ.

সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে (তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না)। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে। (সূরা তাকাসুর : ৫-৬)

এটা হলো দুনিয়ার ক্ষেত্রে। আর ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ তোমরা তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে (সূরা তাকাসুর : ৭) এখানে বলেছেন আখেরাতের ক্ষেত্রে।

মোটকথা, আখেরাতের রাজত্বের উপযুক্ত অন্তর দুনিয়ার শাসনকার্যের উপযুক্ত ব্যক্তির মতোই কঠিন।

আরেকটি বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, লক্ষ্য ও উদ্দিষ্ট হিসেবে নিয়ামত দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার : সত্তাগতভাবে যা উদ্দিষ্ট, তা হলো আখেরাতের সৌভাগ্য অর্জন করা। এতে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। যথা, ১. স্থায়িত্ব, যার কোনো শেষ নেই। ২. আনন্দ, সেখানে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। ৩. জ্ঞান, যাতে কোনো অজ্ঞতা নেই। ৪. সচ্ছলতা, যার পর আর দারিদ্র্য আসবে না। আর এটাই প্রকৃত নিয়ামত।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ. অর্থাৎ আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। (সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)

একথা নবী কারীম (স) একবার বলেছেন কষ্টের সময়, সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। সেটা ছিল পরিখা খনন করার সময়। ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করছিলেন তখন। আরেকবার বলেছেন আনন্দের সময়। দুনিয়ার প্রতি যাতে নির্ভরশীল না হয়ে পড়েন সেজন্য। সময়টা ছিল বিদায় হজের সময়। তখন মানুষ তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছিলেন।

এক ব্যক্তি তার দুআয় বলল হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পরিপূর্ণ নিয়ামত প্রার্থনা করছি। নবী কারীম (স) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো পরিপূর্ণ নিয়ামত কী? সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, تَمَامُ النِّعْمَةِ دُخُوْلُ الْجَنَّةِ. অর্থাৎ পরিপূর্ণ নিয়ামত হচ্ছে, জান্নাতে প্রবেশ করা। (জামে তিরমিযী : ৩৫২৭)

দ্বিতীয় প্রকার : উপকরণ। এটি চার প্রকার যথা, ১. আত্মিক গুণাবলি। ২. দৈহিক গুণাবলি। ৩. দেহ বহির্ভূত উপকরণ। যেমন, সম্পদ, পরিবার ইত্যাদি। ৪. নফস বহির্ভূত উপকরণ অর্জনে সহায়ক। যথা, তাওফিক ও হেদায়াত।

আলোচ্য প্রকারসমূহের একটি অপরটির মুখাপেক্ষী।

প্রথম প্রকার তথা আত্মিক গুণাবলি অর্জিত হয় ঈমান ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে।

ঈমান আবার দুইভাগে বিভক্ত। ইলমুল মুকাশাফা ও ইলমুল মুয়ামালা। ইলমুল মুকাশাফা হলো আল্লাহ তাআলা, তাঁর গুণাবলি, ফেরেশতা এবং রাসূলগণ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। আর ইলমুল মুআমালা হলো পারস্পরিক আচরণ কেমন হবে সে সম্পর্কিত জ্ঞান। উত্তম চরিত্রও দুই ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার হলো প্রবৃত্তি এবং ক্রোধের চাহিদা দমন করা। এর নাম হলো সংযম। আরেক প্রকার হলো প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ এবং দমনের মাঝে নিয়ন্ত্রণ রাখা। অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, যেখানে ইচ্ছা হলো করল আবার যেখানে ইচ্ছা হলো বিরত থাকল। আল্লাহ তাআলার আদেশ

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ. وَ أَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ.

যেন তোমরা পরিমাণে কমবেশি না করো। পরিমাপের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত করো এবং ওজনে কম দিয়ো না। (সূরা আর রহমান : ৮-৯) এর কোনো তোয়াক্কা না করা।

সুতরাং যে ব্যক্তি বিবাহের আগ্রহ দূর করার জন্য খোজা হয়ে গেল কিংবা ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ থেকে বিরত থাকল, অথবা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে দুর্বল হয়ে গেল ফলে ইবাদত করতে অক্ষম হয়ে পড়ল সে সীমালঙ্ঘন করল। আবার যে ব্যক্তি উদর ও প্রবৃত্তির পূজায় লেগে যাবে সেও সীমালঙ্ঘন করবে। ইনসাফ হলো সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা থেকে মুক্ত থাকা।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হয় চারটি গুণের মাধ্যমে। যথা, ইলমে মুকাশাফা, ইলমে মুয়ামালা, সংযম ও ন্যায়পরায়ণতা। এই চারটি বিষয় সাধারণত দ্বিতীয় প্রকার তথা শারীরিক গুণাবলি ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করে না। শারীরিক গুণাবলি চারটি যথা, সুস্থতা, শক্তি, সৌন্দর্য ও দীর্ঘায়ু। এসব বিষয় তৃতীয় প্রকার নিয়ামত ব্যতীত সম্ভব নয়। আর আলোচ্য সব কিছু চতুর্থ প্রকার তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিকের মাধ্যমে হেদায়াত, রুশদ, তাসদীদ ও তায়ীদ ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়।

এই সমস্ত নিয়ামত আবার একে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী। একটির প্রতি অপরটির প্রয়োজন হয়তো অপরিহার্য হবে, না হয় উপকারী হবে। অপরিহার্য প্রয়োজনের উদাহরণ যেমন আখেরাতের সুখের জন্য ঈমান ও

উত্তম চরিত্র প্রয়োজন। এ দুটি ছাড়া আখেরাতের প্রয়োজন কোনোভাবেই মিটবে না। মানুষ যার জন্য চেষ্টা করে তা-ই পায়। আর দুনিয়াতে যা সংগ্রহ করবে আখেরাতে তাই তার সঙ্গী হবে। তদ্রূপ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ইলম অর্জন করা ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধতার জন্য শারীরিক সুস্থতা অপরিহার্য।

আর সামগ্রিকভাবে উপকারী প্রয়োজনের উদাহরণ হলো আত্মিক ও শারীরিক নিয়ামতসমূহের বাহ্যিক নিয়ামতের প্রয়োজনীয়তা। যেমন সম্পদ সম্মান এবং পরিবার এগুলো হলো বাহ্যিক নিয়ামত। এগুলো না থাকলে অভ্যন্তরীণ নিয়ামতের পথে বাঁধা সৃষ্টি হতে পারে।

প্রশ্ন আসতে পারে, আখেরাতের পথে বাহ্যিক নিয়ামত যেমন সম্পদ, পরিবার, খ্যাতি এবং আত্মীয়স্বজনের কী প্রয়োজন?

এর উত্তর হলো, এগুলো উদ্দিষ্ট লক্ষ্য এবং অভীষ্ট গন্তব্যে পৌছার মাধ্যম মাত্র। যেমন সম্পদের কথাই ধরা যাক। এর মাধ্যমে খাওয়া দাওয়াসহ অন্যান্য চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা যায়। কোনো অভাবী যদি ইলম অর্জন করতে চায় কিংবা সম্মান অর্জনে সচেষ্ট হয় আর তার কাছে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ না থাকে তাহলে তার অবস্থা হবে অস্ত্রবিহীন যোদ্ধার মতো। অথবা এমন বাজ পাখির মতো যে শিকার ধরতে চায় কিন্তু উড়তে পারে না।

এজন্যই নবী কারীম (স) বলেছেন,

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ.

নেককার লোকের উত্তম সম্পদ উত্তম বস্তু। (মুসনাদে আহমদ : ৪ : ১৯৭; সহিহ ইবনে হিব্বান : ৩২১০)

আরেক হাদিসে এসেছে,

نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى اللهِ الْمَالُ.

আল্লাহভীতির উত্তম সঙ্গী হলো সম্পদ। (মুসনাদুল ফিরদাউস : ৬৭৫৬)

সম্পদ না থাকলে ব্যক্তিকে সর্বক্ষণ খোরাকের খোঁজ করতে হবে, কীভাবে খাবার, পোশাক এবং জীবনধারণের অন্যান্য ব্যবস্থা করা যায়? এছাড়াও

নানাবিধ সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে, যার প্রতিরোধে সম্পদই একমাত্র অস্ত্র। এছাড়াও সম্পদ না থাকলে হজ, যাকাত, দান সদকাসহ নানারকম কল্যাণের কাজ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

এক দার্শনিকের কাছে নিয়ামতের স্বরূপ জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, 'সচ্ছলতা, আমি তো দরিদ্রের জীবনকে জীবনই মনে করি না।' বলা হলো, আরও কিছু বলুন। বললেন, 'নিরাপত্তা। অনিরাপদ ব্যক্তির জীবন তো জীবনই নয়।' বলা হলো, আরও কিছু বলুন। বললেন, 'সুস্থতা। অসুস্থ ব্যক্তির বাঁচা-মরা বরাবর।' আরও কিছু বলতে বলা হলে তিনি বললেন, 'যৌবন। কারণ বৃদ্ধ ব্যক্তি তো জীবন্মৃত।' (কূতুল কুলূব : ১ : ২০৯)

এখানে দার্শনিক যা কিছু বলেছেন সব হলো দুনিয়ার বিবেচনায়। আখেরাতের বিবেচনায় সব কিছুই তো নিয়ামত হিসেবে গণ্য। এজন্যই ঈসা (আ) বলেছেন,

مَنْ أَصْبَحَ اٰمِنًا فِيْ سِرْبِهٖ، مُعَافًى فِيْ بَدَنِهٖ، عِنْدَهٗ قُوْتُ يَوْمِهٖ، فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا.

ঘরের মধ্যে সে নিরাপদ যার শরীর সুস্থ এবং যার কাছে একদিনের খাবার রয়েছে, তার জন্য সমস্ত দুনিয়াকে কেন্দ্রীভূত করে দেওয়া হয়েছে। (জামে তিরমিযী : ২৩৪৬; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৪১)

পরিবার পরিজন ও সন্তানের বিষয়টি তো স্পষ্ট। নবী কারীম (স) বলেছেন,

نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّيْنِ اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

নেককার স্ত্রী দীন পালনের ক্ষেত্রে উত্তম সহায়তাকারী। (মুসলিম : ১৪৬৭)

আর সন্তানের ক্ষেত্রে নবী কারীম (স) বলেছেন,

اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهٗ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْلَهٗ...

মানুষ মারা গেলে তিনটি মাধ্যম ছাড়া অন্য সকল মাধ্যমে তার কাছে সওয়াব পৌঁছার পথ বন্ধ হয়। (তন্মধ্যে একটি হলো) এমন নেককার সন্তান যে তার জন্য দুআ করে। (সহিহ মুসলিম : ১৬৩১)

পরিবার এবং সন্তানের উপকারিতা আমরা বিবাহ পর্বে আলোচনা করেছি।

আর আত্মীয়স্বজনের ক্ষেত্রে বলতে হয়, আত্মীয়স্বজন মানুষের চোখ এবং হাতের মতো। (অর্থাৎ মানুষ চোখের সাহায্যে দেখে এবং হাতের সাহায্যে ধরে। তদ্রূপ আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে মানুষ খবরাখবর সংগ্রহ করে ও বিপদাপদ প্রতিহত করে।) ফলে তাদের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়াবি সহযোগিতা লাভ করে যা একাকী করতে অনেক কষ্ট হতো। দুনিয়াবি প্রয়োজন থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখতে যেই সহায়তা করবে সে-ই দীনের ক্ষেত্রে সহায়ক বলে গণ্য হবে। সুতরাং সেটা নিয়ামত হওয়ার মধ্যে সন্দেহ নেই।

সম্মান ও খ্যাতির মাধ্যমে মানুষ অপমান এবং জুলুম প্রতিহত করে। মুসলমান মাত্রই এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে। কারণ তার পিছনে এক পীড়াদায়ক শত্রু সর্বদা লেগেই রয়েছে। এক অত্যাচারী তার ইলম আমল এবং অবসর সময়ের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য সদা তৎপর। সেই শত্রু তার অন্তরকে আল্লাহ তাআলা থেকে বিমুখ করে দেয়। অথচ অন্তর হলো ঈমানের প্রধান কেন্দ্র। এই কুমন্ত্রণা প্রতিহত করতে প্রয়োজন সম্মান ও খ্যাতি। এজন্যই কেউ কেউ বলেন, দীন এবং প্রতিপত্তি উভয়টিই অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ.

আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দল দিয়ে অন্য দলকে প্রতিহত না করতেন, পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। (সূরা বাকারা : ২৫১)

সম্মান ও প্রতিপত্তির অর্থ হলো, মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করা। যেমন ধনাঢ্যতার অর্থ হলো অর্থবিত্তের অধিকারী হওয়া। মানুষ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ছাদের আশ্রয় নেয়, শীত থেকে গরম কাপড় পরে। গবাদি পশুকে নেকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে কুকুর পালে তেমনি যে ব্যক্তি অপরের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে, হৃদয়বান ব্যক্তি তার থেকে কষ্ট দূর করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

একইভাবে নবীগণের কাছে কোনো রাজত্ব বা সাম্রাজ্য ছিল না। তথাপি তারা শাসকদের কাছে গমন করতেন না এবং তাদের কাছে সম্মান কামনা করতেন না। তদ্রূপ আলেমগণও শাসকের দরবারে হাদিয়া তোহফা প্রাপ্তির বা তাদের অনুসরণ করে দুনিয়াবি লাভে লাভবান হওয়ার জন্য গমন করেন না।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (স)-কে সাহায্য করেছেন, তাঁর দীনকে পূর্ণ করেছেন, শত্রুর উপর বিজয়ী করেছেন এবং তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে মানুষের মনে তাঁর প্রভাব সৃষ্টি করেছেন এটাই কেবল নিয়ামত নয়; বরং কাফেররা তাঁকে কষ্ট দেওয়া, প্রহৃত হওয়া, এমনকি পলায়ন করে দেশ ছাড়তে বাঁধ্য হওয়াটাও ছিল তাঁর প্রতি ন্যূনতম নিয়ামত।

প্রশ্ন আসতে পারে, বংশ উন্নত ও সম্ভ্রান্ত হওয়াও কি নিয়ামত হবে?

উত্তর হলো, অবশ্যই, বংশ উন্নত এবং সম্ভ্রান্ত হওয়া আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান। এজন্যই নবী কারীম (স) বলেছেন,

اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ.

নেতা হবে কুরাইশ থেকে। (সুনানে নাসায়ী : ৫৯০৯)

কুরাইশ হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বংশ। এই বংশেই রাসূলুল্লাহ (স) জন্মগ্রহণ করেছেন। নবী কারীম (স) আরও বলেছেন, تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ اَلْأَكِفَّاءَ.

তোমরা তোমাদের শুক্রানুর জন্য উত্তম জায়গা বাছাই করো। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯৬৮; মুস্তাদরাকে হাকেম : ২ : ১৬৩)

অন্য এক হাদিসে এসেছে, নবী কারীম (স) বলেছেন, তোমরা আবর্জনা থেকে উৎপন্ন সবজি এড়িয়ে চলো। সাহাবায়ে কেরাম (রা) জানতে চাইলেন, আবর্জনা থেকে উৎপন্ন সবজি বলতে কী বোঝায়? নবী কারীম (স) বললেন, 'নীচ বংশের (অসৎ) সুন্দরী মহিলা।' (মুসনাদুল ফিরদাউস : ১৫৩৮)

মোটকথা, বংশ উন্নত ও সম্ভ্রান্ত হওয়াও এক প্রকার তবে 'উন্নত বংশ' বলতে দুনিয়াবি বিচারে উন্নত হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং নবী কারীম (স), আলেম ও সৎ লোকদের বংশ উদ্দেশ্য। যারা ইলম ও আমলের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সময় দীনদারি দেখতে হবে এবং সেটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।)

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, শারীরিক গুণাবলির উপকারিত কী? উত্তর হলো এর অনেক উপকারিতা আছে। সুস্থতা, শক্তি এবং দীর্ঘায়ু ছাড়া ইলম ও আমল পূর্ণ হয় না। (অর্থাৎ ইলম অর্জন করতে ও তদানুযায়ী আমল করতে সুস্থতা ও শক্তির প্রয়োজন অপরিহার্য। আর দীর্ঘ জীবন লাভ করলে ভালো কাজে দীর্ঘ সময় ব্যয় হবে। ফলে সওয়াব অনেক মিলবে।)

এজন্যই নবী করীম (স) বলেছেন,

أَفْضَلُ السَّعَادَاتِ طُوْلُ الْعُمُرِ فِيْ طَاعَةِ اللهِ.

সর্বত্তোম সৌভাগ্য হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে দীর্ঘ জীবন লাভ করা। (মুসনাদুশ শিহাব : ৩১২; জামে তিরমিযী : ২৩২৯)

সৌন্দর্য নিয়ামত কি না এ নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। কারও কারও মতে, শরীর রোগমুক্ত হওয়াটাই নিয়ামত; সৌন্দর্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, সৌন্দর্যের উপকারিতা কম হলেও তা নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াতে তো এর উপকারিতা স্পষ্ট। আখেরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপকারিতা দুরকম।

১. কুশ্রী মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। মন তার প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করে। পক্ষান্তরে সুন্দর ব্যক্তির কাজ দ্রুত সমাধা হয়। মনের মধ্যে এর প্রভাব পড়ে। সুদর্শন ব্যক্তির সৌন্দর্য এদিক থেকে সম্পদ ও সম্মানের মতো সহায়কের ভূমিকা রাখে। একেও তার এক প্রকার শক্তি বলা চলে। এ কারণেই সুশ্রী ব্যক্তি এমন সব কাজ করে ফেলে অসুন্দর ব্যক্তি যার ধারে কাছেও যেতে পারে না। যা কিছু দুনিয়ার প্রয়োজন মিটানোর জন্য নির্ধারিত তা আখেরাতের প্রয়োজন মিটানোর জন্যও নির্ধারিত। (অর্থাৎ দুনিয়াবি প্রয়োজন আখেরাতের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম।)

২. সৌন্দর্য অনেক সময় আত্মিক গুণাবলির প্রমাণ বহন করে। কারণ আত্মার ঔজ্জ্বল্য অনেক সময় ভিতরকে ছাপিয়ে বাইরে এসে পড়ে। আর ভিতর বাহির অনেক সময়ই একরকম হয়।

এজন্যই অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ শরীরের বাহ্যিক গঠন দেখে নফসের শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচনা করে থাকেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, চেহারা এবং চোখ হচ্ছে মনের দর্পণ বিশেষ। এজন্যই মনের মধ্যে থাকা রাগ, আনন্দ এবং দুশ্চিন্তার ছাপ চেহারায় প্রতিফলিত হয়।

এজন্য কথায় বলে, চেহারার প্রসন্নতা হলো অন্তরের অবস্থার শিরোনাম। বলা হয়, কুশ্রী ব্যক্তির চেহারা তার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে বেশি সুন্দর।

খলিফা মামুন একবার সৈন্য বাহিনী পরিদর্শন করছিলেন। এক সময় এক কুশ্রী ব্যক্তি তার সামনে পড়লো। তিনি তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে

দেখলেন, লোকটি তোতলা। তখন তিনি তালিকা থেকে লোকটির নাম কেটে দিলেন এবং বললেন, আত্মার ঔজ্জ্বল্য দেহের উপর প্রতিফলিত হলে ব্যক্তি সুদর্শন হয়, আর দেহের অভ্যন্তরে হলে ব্যক্তি সুস্পষ্টভাষী হয়। এই লোকের না বাহ্যিক দিক আলোকিত আর না আভ্যন্তরীণ।

নবী কারীম (স) বলেছেন,

اُطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوْهِ.

তোমরা সুদর্শন ব্যক্তিদের কাছে কল্যাণের প্রত্যাশা করো। (মুসনাদে আবু ইয়ালা : ৪৭৫৯; মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ : ৭৫২; মুজামে কাবীর : ১১ : ৮১)

ওমর (রা) বলেছেন, তোমরা কোনো দূত পাঠানোর পূর্বে দেখে নিও, তার চেহারা সুদর্শন এবং নাম সুন্দর কি না। (আখলাকুন নবী : ৭৫৯)

ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মুসল্লীদের সবাই সমস্তরের হলে সর্বাধিক সুদর্শন ব্যক্তি ইমামতির অধিক যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকী : ৩ : ১২১)

আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ বর্ণনা করে বলেছেন,

وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ.

এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। (সূরা বাকারা : ২৪৭)

এসব স্থানে সৌন্দর্য বলে এমন সৌন্দর্য উদ্দেশ্য নয় যা কামভাবের উদ্রেক করে। এরকম সৌন্দর্য তো মহিলাদের হয়ে থাকে। বরং উদ্দেশ্য হলো আকর্ষণীয় দেহবিশিষ্ট, অপরূপ চেহারার অধিকারী হওয়া। যার দিকে চোখ পড়লে ফেরানো যায় না। (অর্থাৎ, সর্বোপরি চরিত্র সুন্দর হওয়া)

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, উপরিউক্ত বক্তব্যের মধ্যে সম্পদ, সম্মান, বংশ, পরিবার এবং সন্তানকে নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, অথচ আল্লাহ তাআলা সম্পদ ও সম্মানের নিন্দা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ.

তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। (সূরা তাগাবুন : ১৪)

আরও ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

নিশ্চয় তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (সূরা তাগাবুন : ১৫)

তদ্রূপ নবী কারীম (স) নিন্দা করেছেন। এমন কি আলেমগণও এর নিন্দা করেছেন। এরপরও এসব নিয়ামত হয় কী করে?

এর উত্তরে বলা হবে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইলমের নূর প্রাপ্ত না হয়ে কেবল শব্দগত ইলম হাসিল করতে গেলে ভ্রষ্টতার আশঙ্কা থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে ইলমের নূর প্রাপ্ত হয় সে কখনো ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানে আবার কখনো বিশিষ্টায়নের মাধ্যমে জানতে পারে। এটা আখেরাতের বিষয়ে আল্লাহ তাআলার এক অনস্বীকার্য নিয়ামত, যাতে পরীক্ষা ও ভয়ের বিষয় রয়েছে।

সম্পদের উদাহরণ হলো এমন সাপের ন্যায় যাতে উপকারী ওষুধ এবং মারাত্মক বিষ দুটোই রয়েছে। বিষ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং উপকারী ওষুধ বের করতে পারে এমন ওঝার জন্য সাপটি নিয়ামত। আবার অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য সাপটি বিপজ্জনক ও মৃত্যুর কারণ।

সম্পদ হলো এমন সমুদ্রের ন্যায় যার তলদেশে মণিমুক্তা রয়েছে। সাঁতার জানে, মণিমুক্তা তুলে আনতে পারে এবং সমুদ্রের তলদেশের বিপদাপদ সম্পর্কে অবগত এমন ডুবুরিই কেবল সমুদ্রে নামতে পারবে। অন্যথায় অজ্ঞ ব্যক্তি নামলে প্রাণ হারাতে হবে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা প্রশংসা করে সম্পদকে খায়ের (কল্যাণ) নামে অভিহিত করেছেন। রসূলুল্লাহ (স)-ও সম্পদের প্রশংসা করে বলেছেন,

نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى اللهِ تَعَالَى الْمَالُ.

সম্পদ আল্লাহ তাআলার ভীতির ক্ষেত্রে উত্তম সহায়ক। (মুসনাদুল ফিরদাউস : ৬৭৫৬; মুসনাদুশ শিহাব : ১৩১৭)

এমনিভাবে সম্মান ও প্রতিপত্তিরও প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (স)-এর উপর অনুগ্রহ করে সকল ধর্মের উপর তাঁকে বিজয় দান করেছেন এবং সৃষ্টিজগতের কাছে তাঁকে প্রিয় বানিয়েছেন। এটাই

সম্মানের অর্থ বা উদ্দেশ্য। কিন্তু এগুলোর প্রশংসা করে বর্ণনা কম এসেছে। কিন্তু নিন্দা করা হয়েছে অনেক। যেখানে ব্যক্তি দেখানো কাজ তথা রিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে মূলত যশখ্যাতির নিন্দাই করা হয়েছে। কারণ রিয়ার উদ্দেশ্য হলো অন্তরকে আকৃষ্ট করা আর সম্মানের উদ্দেশ্য হলো অন্তরে আধিপত্য বিস্তার করা। এর ক্ষতি অধিক হারে বর্ণনা ও উপকার কম বর্ণনার কারণ হলো অধিকাংশ মানুষ সম্পদ নামধারী সাপের বিষ নামানো ও খ্যাতির সাগরে ডুব দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে অনবহিত। তাই তাদেরকে সতর্ক করা প্রয়োজন। না হয় তারা সম্পদ নামক সাপের ওষুধের নাগাল পাওয়ার আগেই বিষ দ্বারা আক্রান্ত হবে এবং খ্যাতির সাগরে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা আহরণ করার আগেই কুমিরের শিকারে পরিণত হবে। সম্পদ এবং সম্মান সত্তাগতভাবেই নিন্দনীয় হলে সুলাইমান (আ)-এর সম্পদ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাদশাহি অসম্ভব বিষয় হতো।

মোটকথা মানুষ হলো শিশুর মতো, সম্পদ হলো সাপের মতো এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) এবং আল্লাহর অলীগণ হলেন বিজ্ঞ ওঝার মতো। সাপ শিশুর ক্ষতি করলেও ওঝার ক্ষতি করতে পারে না।

তবে হ্যাঁ, ওঝার যদি কোনো সন্তান থাকে আর সে যদি সন্তানের ভালো চায় তাহলে সে কোনো সাপ দেখলেও ওষুধ বানানোর লোভ সংবরণ করবে। কারণ সে যদি সন্তানের সামনে সাপ ধরে তাহলে সন্তানও সাপ ধরতে উৎসাহিত হবে। ওঝা তো সাপ ধরবে বিচক্ষণতার সাথে, ওষুধ বানানোর জন্য। পক্ষান্তরে সন্তান সাপ ধরবে অজ্ঞতার সাথে, খেলার জন্য। ফলে পরিণাম হবে ভয়াবহ। সুতরাং ওঝার কর্তব্য হলো অবুঝ সন্তানের সামনে সাপ না ধরে পলায়ন করা ও সন্তানকেও পলায়ন করতে নির্দেশ দেওয়া এবং এর ভয়াবহতা তার সামনে তুলে ধরা।

তদ্রূপ ডুবুরিও যদি জানতে পারে, সে তার সন্তানের সামনে ডুব দিলে সন্তান তার অনুসরণ করবে এবং (সাঁতার না জানার কারণে) মারা যাবে, তাহলে তার কর্তব্য তাকে সাগর ও নদীর তীর সম্পর্কে সতর্ক করা। কেবল সতর্ক করার মাধ্যমে সন্তান সতর্ক না হলে তার কর্তব্য হবে সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও তীর থেকে দূরে থাকা এবং তার সামনে ডুব দিতে না যাওয়া।

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ)-এর তত্ত্বাবধানে উম্মতের দৃষ্টান্ত পিতার সঙ্গে অবুঝ শিশুর মতো। এজন্যই নবী কারীম (স) বলেছেন,

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ.

আমি তোমাদের জন্য তেমন সন্তানের জন্য পিতা যেমন। (সুনানে আবি দাউদ : ৮; সুনানে নাসায়ী : ১ : ৩৮; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩১৩)

আরেক হাদিসে এসেছে,

إِنَّكُمْ تَتَهَافَتُوْنَ عَلَى النَّارِ تَهَافَتِ الْفِرَاشُ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ.

পতঙ্গ পাল যেভাবে (আগুনে) ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমরাও সেভাবে জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়ছ আর আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে প্রতিহত করছি। (সহিহ বুখারী : ৬৪৮৩; সহিহ মুসলিম : ২২৮৪)

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ)-কে প্রেরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক উদ্দেশ্য হলো তাদের সন্তান অর্থাৎ উম্মতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। সম্পদের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ ছিল না। দিন চলে যায় এতটুকু সম্পদের ওপরই তারা তুষ্ট ছিলেন। এর অতিরিক্ত সম্পদ তারা দান করে দিতেন। কারণ সম্পদ খরচ করা হলো ওষুধ আর সঞ্চয় করা হলো বিষতুল্য। মানুষকে যদি সম্পদ উপার্জন করতে উৎসাহিত করা হয় তাহলে দেখা যাবে, তারা ওষুধতুল্য খরচ করা বাদ দিয়ে বিষতুল্য সঞ্চয় করা নিয়ে মেতে উঠবে। এজন্যই সম্পদের নিন্দা করে মূলত সঞ্চয়ের নিন্দা করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে নিন্দনীয় বিষয় হলো দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে সম্পদ জমা করতে থাকা। না হলে প্রয়োজন পরিমাণ রেখে অতিরিক্তটুকু দান করতে নিষেধাজ্ঞা নেই। মুসাফির চাইলে কেবল প্রয়োজন পরিমাণ পাথেয় নিয়ে সফর করতে পারে। আবার কেউ যদি উদারমনা হয়ে সফরসঙ্গীদের মাঝে বিতরণ করার জন্য অধিক পরিমাণে পাথেয় গ্রহণ করে তাতেও কোনো সমস্যা নেই। এটা একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার। যদিও নবী কারীম (স) বলেছেন,

لِيَكُنْ بَلَاغُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ.

দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের পাথেয় এমন হওয়া চাই যেমন মুসাফিরের পাথেয় হয়ে থাকে। (জামে তিরমিযী : ১৭৮০; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১০৪)

এই হাদিসের মর্ম হলো এতটুকু পাথেয় যেন নিজের জন্য অবশ্যই থাকে। অন্যথায় এই হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন মনীষীও আছেন, যারা এ হাদিসের ওপর এমনভাবে আমল করেছেন যে, কোনো জায়গা থেকে এক হাজার দিরহাম সংগ্রহ করে সেই স্থানেই তা বিলিয়ে দিয়েছেন। নিজের জন্য কিছুই রাখেননি। (এ মনীষী হলেন আম্মাজান আয়েশা (রা)। কৃপণতার নিন্দাপর্বে তাঁর আলোচনা করা হয়েছে।)

একবার রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ধনী ব্যক্তিরা জান্নাতে কষ্ট করে প্রবেশ করবে। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সমস্ত সম্পদ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বিলিয়ে দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। তৎক্ষণাৎ জিবরাঈল (আ) আগমন করে নবী কারীম (স)-কে বললেন, আবদুর রহমানকে আদেশ করুন তিনি (সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে) যেন অসহায়কে খাবার খাওয়ান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করেন এবং মেহমানদারি করেন। (এটাই তার জন্য জান্নাতে প্রবেশে সহায়ক হবে।) (মুস্তাদরাকে হাকেম : ৩ : ৩১১; হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১ : ৯৯; শুআবুল ঈমান : ৩০৬৪)

মোটকথা, দুনিয়াবি নিয়ামত দুধরণের সংমিশ্রণে তৈরি। ওষুদের সঙ্গে রোগ মিশ্রিত। আশার সঙ্গে ভয়, লাভের সঙ্গে ক্ষতি। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের অন্তর্দৃষ্টি এবং জ্ঞানের ওপর আস্থা রাখে সেই কেবল এর কাছাকাছি গিয়ে রোগ থেকে বেঁচে ওষুধ বের করতে পারে। আর যার নিজের ওপর ভরসা নেই তার উচিত দুনিয়া থেকে দূরে থাকা। বিপজ্জনক অবস্থান থেকে দূরত্বে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাওফিকের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিয়ামতসমূহের অর্থ কী?

স্মর্তব্য, আল্লাহ তাআলার তাওফিক এক অপরিহার্য বিষয়। এটাই বান্দার ইচ্ছা ও আল্লাহ তাআলার ফয়সালাকে একত্রে যুক্ত করে দেয়। ভালোমন্দ দুটোই এর অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্য-সৌভাগ্য উভয়টিই এর অন্তর্গত। কিন্তু প্রচলন এমন হয়ে গেছে যে, তাওফিক বলতে কেবল সৌভাগ্য ও ভালো জিনিসই বোঝায়। শুধু প্রচলনের কারণে শব্দের অর্থের মধ্যে বিশিষ্টতা চলে আসে এর অনেক উদাহরণ আছে। যেমন মুলহিদ-এর শাব্দিক অর্থ হলো, এমন

ব্যক্তি, যে এক দিকে ঝুঁকে পড়ে। অথচ মুলহিদ বললে সমাজে এমন ব্যক্তিকেই বোঝানো হয় যে হক ছেড়ে বাতিলের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তদ্রূপ 'ইরতিদাদ' বলতে শুধু ধর্ম থেকে ফিরে যাওয়া বোঝায়।

সুতরাং বোঝা গেল, সর্বাবস্থায় তাওফিকের অবদান অনস্বীকার্য। কবির ভাষায়,

إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللهِ لِلْفَتٰى * فَأَكْثَرُ مَا يَجْنِيْ عَلَيْهِ اِجْتِهَادُهٗ.

আল্লাহ তাআলার সাহায্য শামিলেহাল না হলে মানুষের সদিচ্ছাও গুনাহের কারণ হয়ে যায়।

হেদায়েত এমন এক বাস্তবতা যা ছাড়া মানুষ সৌভাগ্য অন্বেষণ করতে পারে না। মানুষ এমন জিনিসেরই মুখাপেক্ষী হয় যা আখেরাতে তার উপকারে আসবে। আখেরাতের সফলতা কীসে নিহিত এটা না জানা থাকলে মানুষ বিশৃঙ্খলাকে সৎকর্মভাবে। শুধু ইচ্ছা দিয়ে কী লাভ হবে? ইচ্ছা, সক্ষমতা এবং মাধ্যম কেবল হেদায়েতের পরই কাজে আসে।

এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

رَبُّنَا الَّذِیْٓ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰی.

আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন। (সূরা ত্বহা : ৫০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّ لٰكِنَّ اللهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ.

তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন। (সূরা নূর : ২১)

নবী কারীম (স) বলেছেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالٰى، فَقِيْلَ : وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا.

আল্লাহ তাআলার রহমত অর্থাৎ হেদায়াত ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম (রা) জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি পারবেন না? নবী কারীম (স) বললেন, আমিও না। (সহিহ বুখারী : ৫৬৭৩; সহিহ মুসলিম : ২৮১৬)

হেদায়েতের স্তর তিনটি

প্রথম স্তর : ভালোমন্দের পথ চিনতে পারা। এসম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ هَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ.

আর আমি তাকে দুটি পথই দেখিয়েছি। (সূরা বালাদ : ১০)

আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত বান্দাকে হেদায়েতের এই প্রকারটি দান করেছেন। কাউকে দিয়েছেন বুদ্ধির মাধ্যমে, আবার কাউকে নবী-রাসূল (আ)-এর মাধ্যমে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى.

আর সামূদ সম্পদায়ের ব্যাপার হলো, আমি তাদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথে থাকাকেই বেশি পছন্দ করল। (সূরা হা-মীম সাজদাহ : ১৭)

সুতরাং হেদায়েতের মাধ্যম হলো তিনটি, আসমানি কিতাব, নবী-রাসূল এবং অন্তর্দৃষ্টি। হেদায়েতের এই মাধ্যমগুলো সহজলভ্য। যাদের অন্তরে হিংসা, অহংকার এবং দুনিয়ার মোহ থাকে তাদের চক্ষু খোলা থাকলেও অন্তর্চক্ষুর ওপর পর্দা পড়ে যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ.

বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়; বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (সূরা হজ : ৪৬)

অন্তর্দৃষ্টির ওপর পর্দা পড়ে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে ভালোবাসা, অভ্যাস এবং বাপদাদাদের কাজ সংরক্ষণের চাহিদা অন্যতম।

কুরআনের ভাষায়,

اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ.

আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী। (সূরা যুখরুফ : ২২)

অহংকার ও হিংসার বশবর্তী হয়ে তাদের উক্তি কুরআনের ভাষায়,

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ.

এবং তারা বলে, 'এ কুরআন কেন নাযিল হলো না দুই জনপদ থেকে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির ওপর?' (সূরা যুখরুফ : ৩১)

فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗ.

তখন তারা বলেছিলো, 'আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করব? (সূরা ক্বমার : ২৪)

এসব হলো হেদায়েত লাভের প্রতিবন্ধক। এসবের কারণেই হেদায়েত গ্রহণ সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয় স্তর : হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তর প্রথম স্তরের পরবর্তী ধাপ। মুজাহাদার মাধ্যমে এই স্তর অর্জিত হয়। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে (মুজাহাদার ভিত্তিতে) সবসময় এই স্তরে উপনীত করেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.

যারা আমার উদ্দেশ্যে চেষ্টা চালায় আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। (সূরা আনকাবূত : ৬৯)

আরেক আয়াতে এসেছে,

وَ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى.

যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি আরও বৃদ্ধি করেন। (সূরা মুহাম্মদ : ১৭)

এই আয়াতে হেদায়েত বলে হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তর উদ্দেশ্য।

তৃতীয় স্তর : এই হোদায়েত এমন এক নূর যা পরিপূর্ণ মুজাহাদার পর নুবুওয়াত ও বেলায়েতের জগতে চমকাতে থাকে। এই নূরের মাধ্যমে মানুষ এমন সব বিষয় জানতে পারে যা বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে জানতে পারে না। অথচ এই বুদ্ধিমত্তার উপরই শরিয়তের আদেশ নিষেধের ভিত্তি এবং

এর মাধ্যমেই যাবতীয় ইলম অর্জিত হয়। এই প্রকার হেদায়েত হলো নিরঙ্কুশ হেদায়েত। এছাড়া অন্যান্য হেদায়েত হলো এই হেদায়েতের আচ্ছাদন ও ভূমিকা। সমস্ত হোদায়েতই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তথাপি আল্লাহ তাআলা এই হেদায়েতের সম্পর্ক নিজের দিকে করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى.

বলুন, 'আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।' (সূরা বাকারা : ১২০)

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই হেদায়েতকে জীবন বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَ جَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ.

যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর তাকে জীবন দান করেছি এবং তাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি। (সূরা আনআম : ১২২)

আরেক আয়াতে এসেছে,

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ.

আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তার প্রতিপালক প্রদত্ত (হেদায়াতের) আলোয় রয়েছে, (সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়?) (সূরা যুমার : ২২) এই আয়াতেও হেদায়েতের এই প্রকার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

'রুশদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত এমন সহায়তা, যা সৎ উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক এবং অসৎ উদ্দেশ্য পূরণে বাধা প্রদানকারী। (অর্থাৎ ভালো কাজ করতে চাইলে মনের ভিতরে যে প্রেরণা আসে এবং মন্দ কাজ করার ইচ্ছা হলে মনের ভিতরে যে বাধা আসে সেটাই হলো 'রুশদ'।)

এই রুশদ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ.

আমি এর আগে ইবরাহিমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছি এবং আমি তার সম্পর্কে ছিলাম পরিপূর্ণ অবগত। (সূরা আম্বিয়া : ৫১)

মোটকথা, 'রুশদ' এমন হেদায়েতকে বলে যা সৌভাগ্য ও সুখের নিকটবর্তী করে এবং এই প্রেরণায় উজ্জীবিত করে। সুতরাং কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক যদি এই অবস্থায় সাবালক হয় যে, সে সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারে এবং ব্যবসার পদ্ধতিতে তা বৃদ্ধি করার উপায় জানে তা সত্ত্বেও সে অপচয় করতে অভ্যস্ত এবং সম্পদ বৃদ্ধি করতে আগ্রহী না হয় তাহলে তার মধ্যে 'রুশদ' আছে তা বলা হবে না। তদ্রূপ কোনো ব্যক্তি যদি জেনে বুঝে নিজের জন্য ক্ষতিকর কোনো কাজ করে তার সম্পর্কেও বলা হবে, এমন ব্যক্তির মধ্যে রুশদ নেই। সে শুধু ক্ষতিকর বস্তু সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পেয়েছে। ব্যস, এতটুকুই। এই বিবেচনায় 'রুশদ' হেদায়েত অপেক্ষা বড় নিয়ামত। কারণ হেদায়েত হলো ভালোমন্দের পার্থক্য নিরূপণকারী, আর রুশদ হলো ভালো পথে চলতে উদ্বুদ্ধকারী।

তাসদীদ অর্থ বান্দা যে উদ্দেশ্য পূরণে আগ্রহী হয়েছে তা বান্দার জন্য সহজ করে দেওয়া যাতে সে দ্রুত উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। শুধু হেদায়েতই যথেষ্ট নয়; বরং সাথে সাথে রুশদও জরুরি। তদ্রূপ শুধু রুশদ যথেষ্ট নয়; বরং সাথে সাথে যাবতীয় উপায় উপকরণ সহজকরণের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সহজ হয়।

সুতরাং বোঝা গেল, হেদায়েত হলো কেবল (ভালোমন্দের) পরিচয় জানা। রুশদ হলো প্রেরণা। আর তাসদীদ হলো যাবতীয় উপায় উপকরণ সহজকরণ।

তায়ীদ হলো পূর্বোল্লিখিত সকল কাজের সমন্বয়ক। তায়ীদ বলা হয় বান্দার অভ্যন্তর থেকে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শক্তি জোগানো ও বাইরে থেকে উপকরণের মাধ্যমে সহায়তা করাকে।

আল্লাহ তাআলার বাণী,

إِذْ أَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ.

যখন আমি পবিত্র আত্মা দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম। (সূরা মায়েদা : ১১০)-দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

তায়ীদ হলো ইসমত (পাপ থেকে মুক্ত থাকা)-এর নিকটবর্তী। এর অর্থ হলো বান্দা এমন ঐশী শক্তি অর্জন করে যার মাধ্যমে সে ভালো কাজে অগ্রসর হওয়ার এবং মন্দ কাজের ইচ্ছা প্রতিহত করার ক্ষমতা লাভ

করে। অবস্থা এমন হয় যেন সে নিজের অভ্যন্তরে অদৃশ্য শক্তি অনুভব করে যা মন্দকে প্রতিহত করে। আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী এদিকেই ইঙ্গিত করে।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ.

সেই রমণী তো তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতো। (সূরা ইউসুফ : ২৪)

এই সমস্ত নিয়ামত সে-ই ব্যক্তিই প্রাপ্ত হবে যাকে আল্লাহ তাআলা সচ্ছ ধীশক্তি, তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হৃদয়, বিনয়ী অন্তর এবং কল্যাণকামী ও উপদেশদাতা শিক্ষক দিয়েছেন। যাকে এতো পরিমাণ সম্পদ দেওয়া হয়েছে যে, দীনি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় তা কম পড়ে না, আবার দীন থেকে বিমুখ করে দেয় এত বেশিও না। তাকে আল্লাহ তাআলা এমন সম্মান দিয়েছেন যা তাকে নির্বোধদের নির্বুদ্ধিতা এবং শত্রুর নির্যাতন থেকে রক্ষা করে।

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত অবিরাম বর্ষিত হয়েই চলছে। যা গুণে শুমার করা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। ইরশাদ হয়েছে,

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا.

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। (সূরা নাহল : ১৮)

* * *

আহার ও খাদ্য আল্লাহ তাআলার বড় নিয়ামত

আল্লাহ তাআলার নিয়ামত অফুরন্ত, অগণিত। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতরাজিকে আমরা ষোলো শ্রেণিতে বিভক্ত করেছি। তন্মধ্যে সুস্থতা সর্বশেষ স্তরের। যেসমস্ত উপকরণের মাধ্যমে এই নিয়ামত পূর্ণ হয়, সেগুলো গণনা করা সম্ভব নয়। এর উপকরণসমূহের মধ্যে আহার একটি। আহারের নিয়ামত পূর্ণ হওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন, তার কিয়দংশ এখানে তুলে ধরা হলো। এটা সবারই জানা কথা যে, আহার একটি কর্ম। এর জন্য ইচ্ছা এবং উদ্দিষ্ট বস্তুর জ্ঞান জরুরি। এছাড়া আহারের জন্য খাদ্য, খাদ্য আহরণের স্থান এবং খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রয়োজন। আমরা এগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ তাআলা পাথর, লোহা, মণিমুক্তা ইত্যাদি বস্তুকে পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন। এগুলো বৃদ্ধি পায় না এবং খাদ্যরূপে কিছুই গ্রহণ করে না। তবে উদ্ভিদের মধ্যে এমন এক শক্তি দান করেছেন, যে তার মূল শিকড় ও শিরা-উপশিরার সাহায্যে নিজের দিকে খাদ্যকে টেনে আনে। শিকড়ে খাদ্য না পৌঁছলে কিংবা শিকড়ের সাথে যুক্ত না থাকলে গাছ-গাছালি শুকিয়ে যায়। অন্য জায়গা থেকে খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা তার নেই। কেননা, সে খাদ্যের জ্ঞানও রাখে না এবং খাদ্য পর্যন্ত যেতেও পারে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে এই ক্ষমতা দান করেছেন। মানুষ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে খাদ্য ও খাদ্যের স্থান জেনে সে পর্যন্ত যেতে পারে। এ ছাড়া মানুষকে বিবেকবুদ্ধি দান করা হয়েছে, এর মাধ্যমে সে খাদ্যের উপকার ও ক্ষতি সম্পর্কে জানতে পারে। তাছাড়া খাবার প্রস্তুত করা, রান্না করা ও তার আসবাবপত্র সংগ্রহের কাজেও বিবেকবুদ্ধি কাজে লাগে। এমনিভাবে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ধারাবাহিকতার মধ্যেও আল্লাহ তাআলার রহস্য নিহিত রেখেছেন।

প্রথম ইন্দ্রিয় হলো ত্বক। এটা সৃষ্টি করার কারণ হলো, দগ্ধকারী আগুন অথবা ধারালো তরবারি অনুভব করে তা থেকে বাঁচার জন্য। প্রাণীর ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে এই ইন্দ্রিয় প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা ছাড়া কোনো প্রাণী অস্তিত্বেই আসতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়ের সর্বনিম্ন স্তর হলো শরীরে কোনো কিছু স্পর্শ করলে টের পাওয়া। আর দূরবর্তী জিনিস

উপলব্ধি করা নিশ্চিতভাবেই পূর্ণাঙ্গ অনুভব। ইন্দ্রিয়ের সর্বনিম্ন স্তর সকল প্রাণীর মধ্যেই পাওয়া যায়। এমনকি কেঁচোর মধ্যেও। কেঁচোকেও সুই দিয়ে খোঁচা দেওয়া হলে সে কুঁকড়ে যায়। তবে উদ্ভিদের অবস্থা ব্যতিক্রম। তার অনুভুতি শক্তি নেই বিধায় কাটলেও ব্যাথা অনুভব করে না এবং কুঁকড়ে যায় না।

এই ইন্দ্রিয় না থাকলে মানুষ অসম্পুর্ণ হয়ে যেত। দূরে থাকা জিনিস সে উপলব্ধি করতে পারতো না। বরং শরীরের স্পর্শ পেলেই কেবল অনুভব করতো এবং তা নিজের দিকে টেনে নিতো। তাই দূরের জিনিস অনুভব করার জন্য একটি ইন্দ্রিয় প্রয়োজনীয় বলেই আল্লাহ তাআলা ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা নাসিকা তৈরি করেছেন।

আবার দেখা গেল এই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঘ্রাণ পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু কোত্থেকে ঘ্রাণ আসছে তা নির্ণয় করা যায় না। ফলে ঘ্রাণের উৎসের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় চক্কর দিতে হবে। কখনো উৎসের সন্ধান মিলবে আবার কখনো মিলবে না। ফলে এ ব্যাপারে সহায়ক একটি ইন্দ্রিয় না হলেই নয়। তাই আল্লাহ তাআলা একটি ইন্দ্রিয় তৈরি করেছেন যার মাধ্যমে দূরের জিনিস সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। ঘ্রাণের দিক নির্ণয় করে সেদিকে অভিমুখী হওয়া যাবে। তা হলো দৃষ্টিশক্তি।

এই ইন্দ্রিয় না থাকলে অসম্পূর্ণ হতে হবে। কারণ, দেওয়াল ও পর্দার আড়ালের জিনিস টের পাওয়া যাবে না। আড়ালে থাকা খাবার টের পাওয়া গেলেও আড়ালে থাকা শত্রু সম্পর্কে অবগতি লাভ সম্ভব হবে না। ফলে শত্রু একদম নিকটে না এসে পড়া অবধি অবগত হওয়া যাবে না। আর শত্রু একদম নিকটে এসে পড়লে সতর্ক হওয়া সম্ভব হয় না। তাই আল্লাহ তাআলা শ্রবণেন্দ্রিয় সৃষ্টি করেছেন যা দ্বারা দেওয়ালের ওপাশে এবং আড়ালের শব্দ পাওয়া যায়। দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে কেবল উপস্থিত বিষয়ে অবগত হওয়া যায়। আর দূরের বস্তুর আওয়াজ শ্রবণশক্তির মাধ্যমে অনুভব করা যায়। কিন্তু কারও সাথে কথা বলা ছাড়া পরিচিত হওয়া অসম্ভব। তাই আল্লাহ অপর একটি ইন্দ্রিয় দান করে মানুষকে অন্য সমস্ত প্রাণী থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে দিলেন। সেটা হলো বাকশক্তি। এসব কিছুই কাজে আসবে না যদি রুচিবোধ না থাকে। খাবার খেতে গেলে ভালো না মন্দ যদি জানা না যায় তাহলে খাবারই মৃত্যুর কারণ হতে

পারে। যেমন গাছের রুচিবোধ বলতে কিছু নেই। তার গোড়ায় যাই ঢালা হয় তাই সে টেনে নেয়। ফলে সে শুকিয়ে যায়। সুতরাং জিহ্বা বা রসনার গুরুত্ব অপরিসীম।

আবার এসব ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করার মতো একটি ইন্দ্রিয় প্রয়োজন। এটা না থাকলে জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়বে। যেমন কেউ হলুদ রঙের কিছু খাওয়ার পর সেটা বিস্বাদ হওয়ায় ফেলে দিল। এখন যদি বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয় না থাকে তাহলে একই প্রকার বস্তু পুনরায় সামনে পড়লে পার্থক্য করা যাবে না। কারণ দৃষ্টিশক্তি দিয়ে বস্তুটি প্রত্যক্ষ করা যাবে। স্বাদ উপভোগ করা যাবে না। আবার জিহ্বার মাধ্যমে এর স্বাদ উপভোগ করা যাবে কিন্তু প্রকার জানা যাবে না। সুতরাং এমন একটি নির্ধারক প্রয়োজন যা দ্বারা স্বাদ ও প্রকার উভয়টিই জানা যাবে। ফলে আগের দেখা কোনো বস্তুর অনুরূপ বস্তু দেখলে উক্ত নির্ধারক জানিয়ে দেবে যে তা বিস্বাদ। ফলে তা গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।

এই নির্ধারক ইন্দ্রিয় ছাড়া সমস্ত প্রাণীই বরাবর। কারণ ছাগলেরও ইন্দ্রিয় রয়েছে। এই ইন্দ্রিয় না থাকলে অসম্পূর্ণতা থেকেই যাবে। যেমন পশুকে ফাঁদ পেতে ধরা হয়। এই ফাঁদ থেকে মুক্তি পাওয়ার পদ্ধতি তার অজানা। আবার অবলা প্রাণী পানি দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু পানিতে যে ডুবে মরার সম্ভাবনা আছে সেটা তার জানা নেই। অনেক প্রাণী কখনো কখনো একই খাবার মজা পেয়ে খেতে থাকে। ফলে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। এসবের কারণ একমাত্র এটাই যে তার কেবল উপস্থিত জ্ঞানই আছে; পরিণাম সম্পর্কে সে অজ্ঞ। এজন্যই আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দান করে এক বিশেষ ইন্দ্রিয় প্রদান করেছেন। তা হলো বুদ্ধি। এর মাধ্যমে মানুষ খাবারের বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপকারিতা-অপকারিতা জানতে পারে। এর দ্বারা রন্ধন প্রণালি জানা যায়। ফলে সে বুঝতে পারে কোন খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং কোনটা অস্বাস্থ্যকর। এগুলো হলো বুদ্ধির সর্বনিম্ন উপকারিতা এবং সবচেয়ে সাধারণ রহস্য। বুদ্ধির সর্বোচ্চ উপকারিতা হচ্ছে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার মারেফাত, তাঁর কর্মের হিকমত ও বিশ্বজগতে তাঁর রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

এই পদ্ধতিতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের তুলনা করা হয় গুপ্তচর এবং সংবাদ সংগ্রহকারীর সাথে যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে।

প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট খবর সংগ্রহেরে দায়িত্ব আছে। কেউ সংবাদ দেয় রং সম্পর্কে, কেউ খবর দেয় আওয়াজ সম্পর্কে, কারও দায়িত্ব ঘ্রাণ নির্ধারণ আবার কারও দায়িত্ব স্বাদ সম্পর্কে অবহিত করা। আবার কোনোটার কাজ ঠাণ্ডা-গরম, শক্ত-নরম নির্ণয় করা।

এই সংবাদবাহক ও গুপ্তচররা রাজ্যের সীমানা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে। তারপর সেটা যৌথ অনুভূতির কাছে পৌছে দেয়। যৌথ অনুভূতির অবস্থান হলো মস্তিষ্কের অগ্রভাগে। যেমন পেয়াদা ও সচিবরা বাদশার দরজায় অবস্থান করে। তারা বাদশার আসা সমস্ত চিঠিপত্র জমা করে। সবগুলো চিঠি হয় মুখবন্ধ। তারা সেগুলো বাদশার কাছে পৌছে দেয়। তারপর বাদশাহর পক্ষ থেকে বিধিবিধান জারি হয়। সচিব ও পেয়াদার দায়িত্ব হলো চিঠি পত্র একত্র করে সংরক্ষণ করা ও বাদশার নিকট পৌছে দেওয়া। চিঠিতে কী লেখা রয়েছে এসম্পর্কে অবগত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মুখবন্ধ চিঠি বাদশার কাছে পৌছামাত্র তিনি রাজ্যের বিষয়াদি অবগত হন এবং সে মোতাবেক যেসব নির্দেশনা প্রদান করেন, তার বর্ণনা এখানে প্রদান করা সম্ভব নয়। যেখানে প্রয়োজন মনে করেন সেখানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কখনো তালাশের হুকুম দেন আবার কখনো পলায়নের নির্দেশ দেন। আবার কখনো ব্যবস্থাপনার কাজে তাদের সহায়তা গ্রহণ করেন।

উপলব্ধির কাজে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহের উপর এটি একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। এমন নয় যে এতে সামগ্রিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের বিস্তারিত লিখতে বসলেই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বিষয়বস্তু শেষ হবে না। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটি হলো দৃষ্টিশক্তি। চোখ হলো তার মাধ্যম। এই মাধ্যম হলো দশটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সমষ্টি। এই স্তরগুলোর কোনোটি আর্দ্র আবার কোনোটি আচ্ছাদন। কিছু পর্দা মাকড়শার জালের মতো, আবার কিছু পর্দা গর্ভফুলের মতো। আর আর্দ্রর মধ্যে কতক ডিমের সাদা অংশের মতো আর কতক যেন বরফ। আবার এই দশটি স্তরের প্রতিটিরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও আকার-আকৃতি আছে। প্রতিটির গঠনপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। এই দশটি স্তরের কোনো একটি ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়লে কিংবা কোনো বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়ে গেলে দৃষ্টিশক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। চিকিৎসকরা পর্যন্ত এর চিকিৎসা করতে পারে না।

এ হলো কেবল এক ইন্দ্রিয়ের অবস্থা। শ্রবণশক্তিসহ অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে এর উপর অনুমান করে দেখা যেতে পারে। অবশ্য শুধু এক চোখের গঠন প্রণালি ও স্তরের আলোচনা বড় বড় খণ্ডে লিখলেও শেষ হবে না। অথচ চোখ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে ছোটো একটি অঙ্গ মাত্র। অন্যান্য বড় বড় অঙ্গের বর্ণনা না হয় বাদই দিলাম।

এগুলো উপলব্ধির জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত নিয়ামতের বর্ণনা।

ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামত

যে দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই আমাদের যদি এটা ভিন্ন অন্য নিয়ামত যেমন ইচ্ছাশক্তি বা চাহিদা দান না করা হতো তাহলে চোখের কোনো উপকারিতাই থাকতো না। এমনিভাবে খাদ্যের প্রতি আগ্রহও একটি বড় নিয়ামত। কেননা, অনেক রোগী খাদ্য দেখে, কিন্তু খায় না। কারণ, তাদের মনে খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকে না।

সুতরাং যা স্বভাবের অনুকূলে হয় তার প্রতি আগ্রহ জন্মে। এই আগ্রহের নাম চাহিদা। আর স্বভাবের প্রতিকূলে যা হয় তার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। এই অনীহার নাম 'বিতৃষ্ণা'। 'চাহিদা'-এর প্রয়োজন হয় উপকারী বস্তু খোঁজ করার জন্য। আর 'বিতৃষ্ণা'-এর প্রয়োজন পড়ে ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচার জন্য। আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে খাওয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। এই আগ্রহ আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। যাতে সে খেতে বাধ্য হয়। খেয়ে বেঁচে থাকে। খাবারের প্রতি আগ্রহ বোধ করা এটা উদ্ভিদ ছাড়া অন্য সমস্ত প্রাণীর মধ্যে স্বভাবজাতভাবে বিদ্যমান।

আল্লাহ তাআলার কুদরত বড় বিস্ময়কর। তিনি কেবল আগ্রহই সৃষ্টি করেননি; বরং এক নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছার পর তিনি অনীহা সৃষ্টি করেছেন। যদি তিনি এই অনীহা সৃষ্টি না করতেন তাহলে মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে অনেকের মৃত্যু ঘটতো। যেমন খেতের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ পানি সিঞ্চন করতে হয়। মাত্রাতিরিক্ত পানি সিঞ্চন করলে উদ্ভিদ সেগুলো টেনে নিতে পারে না বিধায় মরে যায়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে এমন পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন যে, প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলে আপনা আপনিই খাওয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা চলে আসে। আবার প্রয়োজন হলে খাবারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়।

তদ্রূপ আল্লাহ তাআলা মানুষের যৌন চাহিদা সৃষ্টি করেছেন। এই চাহিদা অনুভূত হলে মানুষ সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে তা নিবারণ করে। এর মাধ্যমে তার বংশ বৃদ্ধি পায়।

মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সূচনার প্রতি লক্ষ করলে বিস্ময়কর সব অবস্থা জেনে মানুষ অবাক হয়ে যাবে। গর্ভাশয়ের আকৃতি কেমন? হায়েজের সৃষ্টি হয় কীভাবে? হায়েজের রক্ত এবং পুরুষের শুক্রের সম্মিলনে ভ্রূণ সুষ্টি হয়। মহিলার বীর্য বক্ষের তলদেশের রগ থেকে বের হয়ে গর্ভাশয়ে জমা হয়। বীর্যের ফোঁটা থেকে কখনো ছেলে আবার কখনো মেয়ের জন্ম নেয়। তারপর সেই বীর্যের ফোঁটা কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে। জমাট বাঁধা রক্ত থেকে মাংসপিন্ড হয়। সেই মাংসপিন্ডের মধ্যে হাড় দেওয়া হয়। তারপর গোশত দেওয়া হয়। এরপর উপরে চামড়া পরানো হয়। তারপর মাথা, পা, পেট, পিঠসহ বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি করা হয়। আল্লাহ তাআলার অনুপম সৃষ্টিশৈলী দেখলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। তবে যেহেতু এখানে শুধু আহারের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তাই অন্য প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করা থেকে বিরত থাকছি।

মোটকথা খাবারের প্রতি আগ্রহ মানবিক চাহিদার অন্যতম। কিন্তু কেবল এই চাহিদাই যথেষ্ট নয়। কারণ চতুর্দিক থেকে শত্রুর আক্রমণ আসতে পারে। এমতাবস্থায় যদি ক্রোধের অনুভূতি না থাকে তাহলে বিপদাপদের আক্রমণের শিকার হতে হবে। ক্রোধ থাকলে স্বভাবের প্রতিকূলতার মোকাবেলা করা যায়। অন্যথায় খাবারের জন্য সংগৃহিত খাদ্য অপরে নিয়ে যাবে। কারণ প্রত্যেকেই অপরের কাছে থাকা বস্তুর প্রতি লালায়িত হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান ঠিক রাখার জন্য ক্রোধের প্রয়োজন।

আবার খাদ্যের ব্যবহার ও তা সংরক্ষণের জন্যই কেবল চাহিদা ও ক্রোধের প্রয়োজন, বিষয়টি এমন নয়। কারণ, এ দুটির প্রয়োজন কেবল বর্তমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরিণতির জন্য কেবল এ দুটিই যথেষ্ট হয় না। তাই আল্লাহ তাআলা আরও একটি ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টি করেছেন, যা বুদ্ধির নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হয়। বুদ্ধির মাধ্যমে কাজের পরিণতি আন্দাজ করা যায়। আল্লাহ তাআলা উপস্থিত কাজের জন্য চাহিদা ও ক্রোধকে সৃষ্টি করে বুদ্ধির অধীন বানিয়ে দিয়েছেন। ফলে বুদ্ধির মাধ্যমে এ দুটি থেকে ভালো উপকারিতা পাওয়া যায়। বুদ্ধি ছাড়া এ দুটির ব্যবহার কেবল

ক্ষতিই করে। তদ্রূপ অপর যেই ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ তাআলা দান করেছেন বুদ্ধির মাধ্যমে এর যথার্থ ব্যবহার হয়। এই ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ তাআলা মানুষকে সম্মানসূচক দান করেছেন। আমরা যার নামরকরণ করেছি দীনি প্রেরণা। এই নিয়ামত মানুষকে এককভাবে দেওয়া হয়েছে, যেমন পরিণতি চিন্তা করার ক্ষমতা মানুষকে এককভাবে দেওয়া হয়েছে।

সবরের আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

শক্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত

শক্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গও আল্লাহর বড় নিয়ামত। মানুষের যদি বিবেকবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি থাকে কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শক্তি না থাকে তাহলে বিবেকবুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তির কোনো মূল্য নেই। মনে করুন, এক অসুস্থ ব্যক্তি দূরবর্তী এক বস্তুর প্রতি আগ্রহী, কিন্তু তার পা নেই অথবা পা আছে কিন্তু তাতে চলার শক্তি নেই। সুতরাং তার এই ইচ্ছা ও আগ্রহ অনর্থক। মহান আল্লাহ মানুষসহ সকল প্রাণিকে তার উপকারার্থে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সেগুলো ব্যবহারের ক্ষমতা দান করেছেন।

অঙ্গগুলোর বাহ্যিক দিক সবাই দেখতে পায় কিন্তু রহস্য জানতে পারে না। কিছু অঙ্গ আছে চাহিদার জন্য আর কিছু অঙ্গ আছে বেঁচে থাকার জন্য। যেমন মানুষের জন্য পা, পাখির জন্য ডানা, পশুর জন্য পা। আবার কিছু দিয়েছেন আত্মরক্ষার জন্য। যেমন মানুষের জন্য হাতিয়ার, পশুর জন্য শিং। এই আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে প্রাণীর অবস্থাভেদে পার্থক্য হয়ে থাকে। কারও শত্রু বেশি এবং খাবার দূরবর্তী হওয়ায় তার দ্রুত গমন করা প্রয়োজন হয়। তাই তার জন্য ডানা সৃষ্টি করেছেন যাতে সে দ্রুত উড়ে যেতে পারে। আবার কোনো প্রাণীর পা চারটি, কোনোটির দুটি, আবার কোনোটি জমিনের ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা সকল ক্ষেত্রে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। যা লিখে শেষ করা যাবে না। তাই আমরা কেবল সে সমস্ত অঙ্গের কথা উল্লেখ করব, যার মাধ্যমে আহার সম্পন্ন হয়। এর উপর ভিত্তি করে অন্যান্য নিয়ামতকে অনুমান করে নেওয়া যাবে।

আপনি দূর থেকে খাবার দেখলেন। সেদিকে অগ্রসর হলেন। কেবল এতটুকুই যথেষ্ট নয়; বরং খাবার ধরতে হবে। এই ধরার জন্য একটি অঙ্গ প্রয়োজন। তাই আল্লাহ তাআলা দুটি হাত প্রদান করে অনুগ্রহ করলেন। এই হাত দুটি লম্বা হওয়ায় সব দিকে প্রসারিত করা যায়। কয়েকটি জোড়াবিশিষ্ট হওয়ায় সহজে বিভিন্ন দিকে নড়াচড়া করা যায়। ভাঁজ করা ও খোলা যায়। স্থির কাঠের মতো নয়। আবার তালু সৃষ্টির মাধ্যমে হাতের মাথাকে চ্যাপটা করেছেন। আবার হাতের তালুকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে পাঁচটি আঙুল বানিয়েছেন। এই পাঁচটি আঙুল আবার দুটি সারিতে বিভক্ত করেছেন। এক সারিতে বৃদ্ধাঙুল আর অপর সারিতে পাশাপাশি চারটি আঙুল বিন্যস্ত। এই পাঁচটি আঙুল যদি একদিকে হতো অথবা একটি অপরটির তুলনায় বেশি বড় ছোট হতো তাহলে উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো। আঙুলগুলো স্বভাবিকভাবে রেখে বিছিয়ে দিলে বেলচার কাজ করে। আবার মিলিয়ে দিলে চামচ হয়ে যায়। আবার একত্র করে মুঠি পাকালে প্রহারের হাতিয়ার অর্থাৎ ঘুষি হয়ে যায়। ছড়িয়ে দিয়ে কোনো বস্তুর ওপর রেখে তারপর বন্ধ করলে উক্ত বস্তু গ্রহণ করা যায়। আঙুলগুলোর মাথায় নখ তৈরি করেছেন। নখকে আঙুলের মাথায় স্থাপনের কারণ হলো যাতে আঙুলের মাথা ফেটে না যায়, আর চিকন কোনো বস্তু যাতে নখ দিয়ে ধরা যায়।

তারপর মনে করুন, আপনি খাবার হাতে নিলেন কিন্তু সেটাকে শরীরের অভ্যন্তরে ঢোকাবেন কেমন করে? সুতরাং একটি পথ প্রয়োজন যেদিক দিয়ে আপনি খাবার প্রবেশ করাবেন। তাই আল্লাহ তাআলা মুখকে পাকস্থলীতে খাবার পৌঁছানোর মাধ্যম বানিয়ে দিলেন। অবশ্য পাকস্থলীতে খাবার পৌঁছানো ছাড়াও মুখের আরও রহস্য বরং কাজ আছে।

তারপর খাবার মুখে দিলেই গিলে ফেলা যাবে এমন নয়; বরং সেগুলো পিষতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা দুটি চোয়াল সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোর ওপরে সুবিন্যস্তভাবে দাঁত সাজিয়ে দিয়েছেন। খাবার পেষার জন্য নিচের পাটি দাঁতের ওপর আরেক পাটি দাঁত স্থাপন করেছেন।

খাবার কখনো ভাঙ্গতে হয়, আবার কখনো ছিড়তে হয়, তারপর পিষতে হয়। তাই কিছু দাঁতকে চেপ্টা বানিয়েছেন যাতে পেষা যায়। যেমন মাড়ির দাঁত। আবার চারটি দাঁত এমন ধারালো বানিয়েছেন যেগুলো দিয়ে খাবার

ছেড়া যায়। আবার কিছু দাঁত এমন বানিয়েছেন যা খাবার ভাঙার কাজে আসে। যেমন মুখের সম্মুখভাগস্থ বড় দাঁত চারটি।

এছাড়াও দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জায়গা ফাঁকা রেখেছেন যাতে নিচের অংশ সামনে আসতে পারে। এমনটি না হলে একটির সঙ্গে অপরটি কাজ করতে পারবে না। ফলে পেষার কাজ সম্পাদন হবে না। যেমন দুই হাতে তালি বাজানো। আল্লাহ তাআলার অনুপম সৃষ্টি হলো চোয়ালের উপরের অংশ স্থির থাকে আর নিচের অংশ পেষার কাজ করে। পক্ষান্তরে যাঁতার মধ্যে নিচের অংশ স্থির আর উপরের অংশ কাজ করে। সুবহানাল্লাহ! কত মহান আল্লাহ তাআলার কুদরত!

এরপর ধরুন, আপনি খাবার মুখের খালি অংশে রাখলেন। দাঁতের নিচে খাবার কীভাবে নাড়াবে? দাঁতের তো এই ক্ষমতা নেই যে তা নিজের দিকে টেনে নিবে অথবা কীভাবে মুখের ভেতরে হাত কাজ করবে? আল্লাহ তাআলা জিহ্বা সৃষ্টি করে অনুগ্রহ করলেন। তা সমস্ত মুখে ঘুরে প্রয়োজন মাফিক খাবার মুখের মাঝখান থেকে দাঁতের নিচে পৌঁছে দেয়। হাত যেমন খাবারকে যাঁতার কাছে পৌঁছে দেয়। এছাড়াও জিহ্বা রুচিবোধ তৈরি করে এবং কথা বলার শক্তি জোগায়, যার আলোচনা আমরা করছি না। তারপর ধরুন, আপনি খাবার ছিড়লেন এবং পিষলেন কিন্তু সেটা শুকনা হওয়ায় আপনি গিলতে পারছেন না। গলার ভেতর দিয়ে খাবার নামতে হলে সেটা ভেজানো দরকার। আল্লাহ তাআলার কুদরত দেখুন, তিনি জিহ্বার নিচে একটি প্রস্রবণ তৈরি করে দিয়েছেন। যাকে লালাগ্রন্থি বলা হয়। এই লালাগ্রন্থি প্রয়োজন পরিমাণ লালা উৎসারিত করে। ফলে খাবারের সাথে তা মিশ্রিত হয়। লক্ষ করে দেখুন, এই লালাগ্রন্থিকে আল্লাহ তাআলা কীভাবে আপনার কাজে নিয়োজিত করেছেন। আপনি দূর থেকে খাবার দেখতে পান। তখনই বেচারা আপনার সেবায় তৎপর হয়ে উঠে। মুখে লালা ছড়িয়ে দেয়। ফলে আপনি মুখে একরকম স্বাদ অনুভব করেন। অথচ খাবার তখন পর্যন্ত আপনি মুখেই তুলেননি।

তারপর এই লালামিশ্রিত খামির আকৃতির খাবার মুখ থেকে পাকস্থলীতে পৌঁছাবে কেমন করে? হাত দিয়ে ঠেলে পাকস্থলীতে পৌঁছানো যাবে না। আবার পাকস্থলীতে কোনো হাত নেই যা খাবারকে টেনে নেবে। লক্ষ করুন, আল্লাহ তাআলা কীভাবে খাদ্যনালী এবং কণ্ঠনালী সৃষ্টি করেছেন।

এর অগ্রভাগে কয়েকটি স্তর তৈরি করেছেন যা খাদ্য গ্রহণের জন্য খুলে যায়। খাবার গ্রহণ করার পর সেটি বন্ধ হয়ে যায় এবং চাপ প্রদান করে। সেই চাপের সাথে সাথে খাবার ভিতরে খাদ্যনালীর মাধ্যমে পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়। খাবার যে অবস্থায় পাকস্থলীতে পৌঁছে সে অবস্থায় রক্ত, মাংস ও হাড়ে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়; বরং তা পরিপূর্ণ পরিশোধিত হওয়া দরকার, যাতে তার অংশগুলো সব একরকম হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা পাকস্থলীকে ডেগের আকৃতিতে তৈরি করেছেন। খাবার তাতে পৌঁছালে সে তা ভালো মতো ঢেকে নেয়। তারপর পাকস্থলীর আশেপাশে থাকা আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তার পরিশোধন চলতে থাকে। পাকস্থলীর ডানে হলো যকৃৎ, বামে প্লিহা, সামনে ভুড়ির ঝিল্লি, আর পিছনে পিঠের গোশত। এই সমস্ত অঙ্গের চতুর্দিক থেকে আসা তাপে খাবার পরিশোধিত হয়ে একরকম তরলে পরিণত হয়। যা শিরা উপশিরায় চলার উপযোগী। অংশ ও তরলতার দিক থেকে তা যবের পানির মতো হয়। তবে তখন পর্যন্ত তা শরীরের অংশ হওয়ার উপযুক্ত হয়নি। তাই আল্লাহ তাআলা পাকস্থলী ও যকৃতের মাঝে অনেকগুলো রগ সৃষ্টি করেছেন। যার মধ্যে অনেকগুলো ছিদ্র রেখেছেন যা দিয়ে খাবার যকৃতে পৌঁছে যায়।

যকৃৎ হলো রক্তের সমষ্টি বরং বলা ভালো, তা একটি রক্তপিণ্ড। এর মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রগ আছে, তরল হয়ে যাওয়া খাদ্যগুলো এই সমস্ত রগের মাধ্যমে যকৃতে ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে যকৃৎ সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের রঙে রঞ্জিত করে। (অর্থাৎ সেগুলোকে রক্তে পরিণত করে) তারপর তা কিছু সময় যকৃতের মধ্যে অবস্থান করে পুনরায় পরিশোধিত হয়। এই পরিশোধনের দ্বারা রক্তটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপযোগী হয়। সাথে সাথে রক্ত থেকে দুটি বর্জ্য পৃথক হয়ে যায়। যেমন সবুজ সবজি হতে রান্নার সময় পানি ইত্যাদি বের হয়। এক প্রকার বর্জ্য হলো গাদের মতো ঘণ, আরেক প্রকার হলো ফেনার মতো। প্রথম প্রকারকে 'দেহরস' এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'পিত্ত' বলে। এ দুটি বর্জ্য পৃথক না হলে দেহের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ তাআলা পিত্তকোষ ও প্লিহা সৃষ্টি করেছেন। এ দুটির নালী যকৃতের ভিতরভাগ পর্যন্ত প্রলম্বিত করেছেন। পিত্তকোষ পিত্তকে আর প্লিহা দেহরসকে টেনে নেয়। ফলে সচ্ছ রক্ত অবশিষ্ট থাকে। যার মধ্যে তরলতা ও আর্দ্রতার পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বেশি থাকে।

কারণ রক্ত পাতলা রগ দিয়ে চলাচল করতে এবং উপরের দিককার অঙ্গসমূহে পৌঁছানোর জন্য তরল হওয়া প্রয়োজন। তবে রক্ত বেশি পাতলা হয়ে যাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বিধায় আল্লাহ তাআলা দুটি কিডনি সৃষ্টি করেছেন। এ দুটি থেকে যকৃৎ পর্যন্ত একটি দীর্ঘ নালি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত যে, উক্ত নালি যকৃতের অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রলম্বিত নয়; বরং যকৃতের উপর থেকে উত্থিত রগের সাথে সংযুক্ত। যা যকৃতের চিকন রগসমূহ দিয়ে রক্ত উঠে যাওয়ার পর তার তরলতাকে শুষে নেয়। এর পূর্বেই শুষে নেওয়া হলে রক্ত ঘন হয়ে যেতো বিধায় রগ দিয়ে বের হতে পারত না। অতএব, তরলতা বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে রক্ত তিন ধরনের অতিরিক্ত বস্তু থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আল্লাহ তাআলা যকৃৎ থেকে অসংখ্য রগ বের করেছেন। তারপর প্রতিটি রগকে বহু ভাগে বিভক্ত করেছেন। তারপর সেগুলোকে মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে সচ্ছ রক্ত চলাচল করে গোটা শরীরে পৌঁছে যায়। কিছু রগ এতটাই সূক্ষ্ম যে (খালি) চোখে দেখা যায় না। এই রগগুলো গাছের লতাপাতার মধ্যে থাকা রগের মতো। যার মাধ্যমে গাছের সজীবতা বহাল থাকে। এই রগগুলোই পানি শুষে নিয়ে সমস্ত ডাল পালায় পৌঁছে দেয়।

পিত্তকোষে কোনো সমস্যা হলে তার কাজ ব্যহত হয়। রক্ত নষ্ট হয়ে যায়। ফলে জন্ডিস, ফুসকুড়িসহ নানারকম রোগ দেখা দেয়। আবার প্লিহায় কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা দেহরস টেনে নিতে পারে না। ফলে শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগসহ নানান রোগ সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ রক্তের আর্দ্রতা যদি কিডনি শুষে নিতে না পারে তাহলে শরীরে পানি জমে যাওয়াসহ নানান রোগ দেখা দেয়।

পরম কুশলী এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকুশলতা লক্ষ করুন, তিনটি শারীরিক সুস্থতাকে তিনটি তুচ্ছ স্থানে নিহিত রেখেছেন। পিত্তকোষ এক নালি দিয়ে দেহরস টেনে নেয় আর অপর নালি দিয়ে নাড়িভূঁড়ির ওপর ফেলে। যাতে খাবারের নিচে পিচ্ছিল আর্দ্রতা সৃষ্টি হয়। এবং নাড়িভূঁড়িতে এমন চাপ সৃষ্টি করে যাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং পিচ্ছিলতার কারণে মল ত্যাগ সহজে সম্পাদন করা যায়। মানুষের মল হলুদ বর্ণের হওয়ার কারণ এই হলদে পদার্থ।

প্লিহার মাধ্যমে যেসব বর্জ্য যকৃৎ থেকে বের হয় তার মধ্যে প্লিহার প্রভাবে অম্লতা ও ঘনত্ব থাকে। তারপর এর মধ্যে প্রতিদিন এই অংশগুলো প্রয়োজন অনুপাতে পাকস্থলীর মুখ পর্যন্ত পৌঁছে এবং ক্ষুধার চাহিদা তৈরি করে। আর অবশিষ্টাংশ মলের সাথে নির্গত হয়ে যায়। আর কিডনি কেবল রক্তকেই টেনে নেয় আর অবশিষ্ট অংশকে মূত্রথলির দিকে পাঠিয়ে দেয়।

আমরা খাদ্যের জন্য প্রস্তুতকৃত মাধ্যম সমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের বর্ণনা এখানেই সীমিত করেছি। যদিও এ ব্যপারে অনেক কিছু লেখার অবকাশ আছে। এমন অনেক প্রশ্ন আছে, যার সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখলেও পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু উত্তর সম্পূর্ণ হবে না। যেমন যকৃতের সাথে হৃৎপিন্ড ও মস্তিষ্কের সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, আবার এই তিন মৌলিক অঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক, হৃৎপিন্ড থেকে অসংখ্য রগ বের হয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ার পদ্ধতি, আবার মস্তিষ্ক থেকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়া স্নায়ুর পদ্ধতি, যার মাধ্যমে অনুভূতি সৃষ্টি হয়, যকৃৎ থেকে সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে থাকা শান্ত রগসমূহের মাধ্যমে যেভাবে খাদ্যপৌঁছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন পদ্ধতি, হাড়, মাংসপেশী, শিরা-উপশিরাসহ শরীরের যাবতীয় আলোচনা করতে গেলে কথা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যাবে। আর খাদ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ছাড়াও এই সমস্ত অঙ্গের অন্যান্য কাজ আছে।

শুধু এতটুকুই নয় বরং মানুষের দেহের বড় থেকে বড় এবং ছোটো থেকে ছোটো প্রতিটি অঙ্গের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এক, দুই, তিন, চার, এমনকি দশ বা ততোধিক রহস্য রেখেছেন। আবার প্রতিটি রহস্যের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার নিয়ামত রয়েছে। ধমনি যদি শিরার কাজ শুরু করে কিংবা শিরা যদি ধমনির কাজ করতে আরম্ভ করে তাহলে শরীরের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে।

সুতরাং প্রথমে নিজের প্রতি বর্ষিত আল্লাহ তাআলার নিয়ামতরাজির প্রতি লক্ষ করুন, তাহলে আপনি শোকর আদায় করতে পারবেন। আল্লাহ তাআলার নিয়ামত অসংখ্য। এর মধ্যে আপনি কেবল খাওয়ার নিয়ামত সম্পর্কেই অবগত। অথচ এটা সামান্য এক নিয়ামত। আবার এই নিয়ামত সম্পর্কে আপনি কেবল এতটুকু জানেন যে, খাবার ক্ষুধা নিবারণ করে। এ ছাড়া আপনি আর কিছু জানেন না। এতটুকু জ্ঞান তো গাধারও আছে।

ক্ষুধা লাগলে গাধাও খাবার খায়। বোঝা উঠিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেলে ঘুমিয়ে পড়ে। যৌন চাহিদা অনুভব করলে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। ধীরে ধীরে চলে আবার হাঁকিয়ে নিলে দ্রুত গতিতে চলে। সুতরাং আপনার ও একটি গাধার জ্ঞানের পরিধি যদি বরাবর হয়, তাহলে কীভাবে আপনি আপনার উপর বর্ষিত হয়ে চলা নিয়ামতের শোকার আদায় করবেন?

আমরা এতক্ষণ যে সামান্য আলোচনা করলাম তা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতরাজির মহাসাগর থেকে সামান্য এক ফেঁটামাত্র। যা আমরা আলোচান করেছি তার উপর নির্ভর করে দীর্ঘসূত্রতার আশংকায় ছেড়ে দেওয়া অন্যান্য নিয়ামত বিবেচনা করে দেখুন। আমরা যা জানি এবং সমগ্র সৃষ্টি যতটুকু জানে, তা যতটুকু অজানা এবং আল্লাহ তাআলার অবারিত নিয়ামতের তুলনায় সাগর থেকে তোলা এক ফোঁটা পানিরও কম হবে। যে একথা জানবে সে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবে,

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا.

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। (সূরা ইবরাহিম : ৩৪)

তারপর লক্ষ করুন, আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত অঙ্গ, এর উপকারিতা, অর্জন এবং শক্তির ভিত্তি রেখেছেন এমন সূক্ষ্ম বাষ্পের উপর যা দেহরস থেকে উত্থিত হয়। এর অবস্থানস্থল হলো হৃৎপিণ্ড। সেখান থেকে এই বাষ্প ধমনির সাহায্যে গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। যে অঙ্গেই এই বাষ্প প্রবেশ করে তাতেই অনুভূতি শক্তি, স্পন্দন প্রভৃতি ছড়িয়ে পড়ে। যেমন ঘরের মধ্যে বাতি ঘুরানো হলে আনাচে কানাচে সব জায়গায় আলো পৌঁছে যায়। যদিও এই বাতি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, তথাপি তিনি আপন কুদরতে অন্যকে আলোকিত করার মাধ্যম বানিয়েছেন।

এই সূক্ষ্ম বাষ্পকেই চিকিৎসকদের পরিভাষায় আত্মা বা রূহ বলা হয়। এর অবস্থানক্ষেত্র হলো হৃৎপিণ্ড। এর দৃষ্টান্ত প্রদীপের অগ্নিশিখা। হৃৎপিণ্ড হলো দীপাধারতুল্য। হৃৎপিণ্ডে থাকা কালো রক্ত হলো সলতে। খাদ্য হলো তেল। শরীর জুড়ে থাকা প্রাণের স্পন্দন হচ্ছে ঘর জুড়ে থাকা প্রদীপের আলো। তেল ফুরিয়ে গেলে প্রদীপ যেমন নিভে যায় তেমনি খাদ্য না পেলে প্রাণ নিভে যায়।

কখনো কখনো দেখা যায় প্রদীপে তেল অনেক আছে বটে, কিন্তু সলতে তেল টানতে না পারার কারণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তদ্রূপ হৃৎপিণ্ডে থাকা এই বাষ্পের সাথে সম্পৃক্ত রক্তও কখনো কখনো হৃৎপিণ্ডের উষ্ণতায় পুড়ে যায়। তখন খাদ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও প্রাণ প্রদীপ নিভে যায়। কারণ তার অবস্থা হয় ওই পুড়ে যাওয়া সলতের মতো যা তেল টানতে পারে না।

প্রদীপ অভ্যন্তরীণ অসুবিধার কারণে নিভে যাওয়ার পাশাপাশি ঝড়ো বাতাসের মতো বাহ্যিক কারণেও নিভে যায়। তদ্রূপ অভ্যন্তরীণ কারণে জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার পাশাপাশি নিহত হওয়ার মতো বাহ্যিক কারণেও জীবন প্রদীপ নিভে যায়। প্রদীপ নিভে যাওয়ার কারণ হলো তেল ফুরিয়ে যাওয়া কিংবা সলতে নষ্ট হওয়া অথবা ঝড়ো হাওয়া কিংবা মানুষ নিভিয়ে দেওয়া। এসব হলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি। তদ্রূপ জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার পদ্ধতিও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। তিনি যেমন নির্ধারণ করে রেখেছেন তেমনটাই ঘটে থাকে। সময় ফুরিয়ে গেলে বাতি যেমন নিভে যায় তেমনি জীবনের অবসান ঘটে। প্রদীপ নিভে গেলে যেমন ঘর অন্ধকার হয়ে যায় তেমনি জীবন প্রদীপ নিভে গেলে গোটা শরীর অন্ধকার হয়ে যায়। শরীর থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাধ্যমে শরীর অনুভূতিশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তিসহ জীবনের মূল আবেদনই হারিয়ে ফেলে।

মোটকথা, রূহ হলো আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, তাঁর কর্মকুশল এবং রহস্যের প্রতি একটি ইঙ্গিত মাত্র। যাতে নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর সত্যতার ঘোষণা বান্দার সামনে প্রতিভাত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا.

আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে— আমরা তার অনুরূপ (আরও সমুদ্র) আনলেও। (সূরা কাহফ : ১০৯)

সুতরাং এই সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে অবগতি লাভ করার পরও যে অস্বীকার করে এবং শোকার আদায় থেকে বিরত থাকে সে হতভাগা এবং আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত।

রূহের বিবরণ ও দৃষ্টান্ত প্রদানের কারণে এখানে কারও মনে প্রশ্নের উদয় হতে পারে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি আল্লাহ তাআলার শেখানো মতো বলেছিলেন,

الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ.

রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশবিশেষ। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৫)

তাহলে আপনারা নবীজি (স)-এর অনুসরণ না করে কেন এই দৃষ্টতা দেখাতে গেলেন?

উত্তরে আমরা বলব, এই প্রশ্নের উদয় হওয়ার কারণ হলো, রূহ শব্দের একাধিক অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা। বাস্তবে রূহ শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। যার দীর্ঘ আলোচনা করে আমরা সময়ক্ষেপণ করবো না। উপরে আমরা যেই সূক্ষ্ম দেহকে রূহ নামে অভিহিত করেছি, যাকে চিকিৎসকদের পরিভাষায় রূহ বলা হয়। চিকিৎসকরা এর বর্ণনা, অস্তিত্ব, অঙ্গের মধ্যে চলাচলের পদ্ধতি এবং এর মাধ্যমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শক্তি এবং অনুভূতি অর্জিত পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত আছেন। এমনকি কোনো অঙ্গ প্যারালাইজড হয়ে গেলে তারা বলেন, এই প্যারালাইজড হওয়া অঙ্গটি প্রাণশক্তি পাচ্ছে না। ফলে তারা প্যারালাইজড হওয়া অঙ্গের চিকিৎসা না করে মূল শিরা ও ব্লক দূর করতে সচেষ্ট হয়ে থাকেন। এই রূহ সূক্ষ্মদেহের হওয়ায় শিরা ও ধমনি দিয়ে চলাচল করতে পারে। ফলে হৃৎপিণ্ড থেকে গোটা দেহে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং চিকিৎসকরা যাকে রূহ বা প্রাণশক্তি বলেন তা অনুধাবন করা সহজ বিষয়।

আর প্রকৃত রূহ সম্পর্কে বলতে হয় সেটা হলো মূল চালিকাশক্তি। এই রূহ নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। এটা আল্লাহ তাআলার রহস্যসমূহের মধ্যে একটি। যার বর্ণনা দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক একথা বলা, তা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মাত্র। আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বর্ণনা দেওয়া বুদ্ধির মাধ্যমে সম্ভব নয়; বরং স্বাভাবিকভাবে মানুষ এই কাজে লিপ্ত হলে দিশাহারা হয়ে যাবে। ধারণা আর কল্পনা করে তো এই জ্ঞান লাভ এমন অসম্ভব যেমন চোখের মাধ্যমে আওয়াজ শোনা অসম্ভব। বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে কেবল বস্তুবাদী জ্ঞানই উপলব্ধি করা সম্ভব। এই জ্ঞান

উপলব্ধি করতে হলে একটি নূর প্রয়োজন। যার স্থান বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। যে নূরের সম্পর্ক নবুওয়াতের জগৎ এবং বেলায়েতের জগতের সঙ্গে। এর সামনে বুদ্ধির অবস্থান, বুদ্ধির সামনে ধারণা আর কল্পনার মতোই তুচ্ছ।

আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টিকে এক রকম করে সৃষ্টি করেননি। বরং বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেছেন। একটি নাবালক অনুভবের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে, বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ, সে উক্ত পর্যায়ে উপনীত হয়নি। আবার সাবালক ব্যক্তি বুদ্ধির মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু এর পরবর্তী ধাপটি উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ তা উচ্চতর ও সম্মানিত বিষয়। এই স্তর উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন ঈমান ও ইয়াকিনের নূর। এই স্তরের অবস্থান এতটাই ঊর্ধ্বে যে, সকলের পক্ষে তাতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। অল্প মানুষই কেবল তাতে উপনীত হয়। এই স্তরের একটি শীর্ষস্থান রয়েছে। যার ওপর একটি বিশাল বিস্তৃত ময়দান রয়েছে। যে ময়দানের শুরুতেই একটি দরজা আছে যাতে প্রহরী নিযুক্ত আছে। প্রহরী হলো ঐশী নির্দেশ। যে ব্যক্তি দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে অথবা দরজার প্রহরীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে সে ওই ময়দানে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি প্রবেশই করতে না পারে তাহলে দরজার ওপাশে যা আছে সে সম্পর্কে অবগত হবে কেমন করে?

এজন্যই কথিত আছে, যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেনি সে তার রবকে চিনেনি। আমাদের আলোচ্য বিষয় চিকিৎসকদের বিষয়বস্তু নয়। তাই তাদের বইপত্রে এসংক্রান্ত আলোচনা পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সামনে চিকিৎসকদের পরিভাষার রূহের দৃষ্টান্ত এমন, যেন বাদশার বিড়াল তার খেলার বলটি গড়িয়ে দিল, আর কোনো দর্শক তা দেখে আত্মতৃপ্তি অনুভব করল, সে বাদশাহকে দেখে ফেলেছে। এই ভাবনা সন্দেহাতীতভাবে ভুল। তদ্রূপ চিকিৎসকদের পারিভাষিক রূহকে ঐশী আদেশ রূহের সাথে মিলিয়ে ফেলা আরও বড় ভুল।

মানুষের আকল ও বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতার পরিধি সীমাবদ্ধ এবং তার মাধ্যমে কেবল দুনিয়াবি বিষয় অনুধাবন করা যায় বিধায় আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (স)-কে রূহ সম্পর্কে আলোচনা করার অনুমতি দেননি। বরং মানুষের উপলব্ধি করার ক্ষমতা অনুযায়ী কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে কোনো জায়গাতেই আল্লাহ তাআলা রূহের হাকিকত বা স্বরূপ

নিয়ে আলোচনা করেননি। তবে এর সম্পর্ক এবং কাজ বর্ণনা করেছেন। রূহের সম্পর্ক যে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ.

বলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ বিশেষ। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৫)

আর রূহ-এর কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِیْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً. فَادْخُلِیْ فِیْ عِبٰدِیْ. وَادْخُلِیْ جَنَّتِیْ.

হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে আসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, এবং আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে। (সূরা ফাজর : ২৭-৩০)

আমরা এখন মূল আলোচ্য বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। আলোচনা চলছিল আহারের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত প্রসঙ্গে। সুতরাং আমরা আহার কাজে সহায়ক কয়েকটি অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছি।

যে সমস্ত মৌলিক নিয়ামতের মাধ্যমে আহার লাভ হয়

দুনিয়াতে অনেক রকম খাদ্য আছে। এই খাদ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার কুদরত অসংখ্য। আবার খাবারের উপাদান অগণিত। সমস্ত কুদরত আর খাবারের উপাদান বর্ণনা করা দুঃসাধ্য বিষয়। তাই আমরা সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করবো। খাবার তিন ভাগে বিভক্ত। ওষুধ, ফল আর পথ্য। আমরা কেবল পথ্য নিয়ে আলোচনা করবো। কারণ এটাই মূল। আবার পথ্যের মধ্যে আমাদের আলোচনা হবে কেবল গমের দানা নিয়ে।

আপনি একটি বা একাধিক গমের দানা পেয়ে সেটা খেয়ে ফেললে ভবিষ্যতের জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আবার আপনার ক্ষুধাও নিবারণ হবে না। এজন্যই গমের দানার মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন দেখা দিল। যাতে তা আপনার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা গমের দানার মধ্যে পথ্য হওয়ার ক্ষমতা দিলেন। আপনার ভিতরও তিনি এই ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন। আপনি এবং

উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, আপনি অনুভূতিপ্রবণ ও নড়াচড়া করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে উদ্ভিদ অনুভূতিপ্রবণ নয় এবং নড়াচড়া করতে পারে না। আর পথ্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উদ্ভিদ আর আপনি বরাবর। উদ্ভিদ শেকড়ের মাধ্যমে পানি টেনে নেয়, আপনিও এমনটাই করে থাকেন। আমরা খাদ্য টেনে নেওয়ার জন্য উদ্ভিদের মাধ্যমগুলোর আলোচনা করে কথা দীর্ঘ করবো না। তবে আমরা উদ্ভিদের খোরাকের দিকে ইঙ্গিত করছি।

কাঠ ও মাটি মানুষের খাদ্য হতে পারে না। বরং তার প্রয়োজন এক বিশেষ খাদ্য। তদ্রূপ শস্য দানাও যে কোনো কিছু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না; বরং তার প্রয়োজন বিশেষ কিছু। যেমন শস্যদানাকে ঘরে ফেলে রাখলেই সে বৃদ্ধি পায় না। কারণ তার চারিদিকে তখন থাকে কেবল বাতাস। আর শুধু বাতাস খাদ্য হওয়ার উপযোগী নয়। তদ্রূপ শস্য দানা পানিতে ফেলে রাখলেও বৃদ্ধি পায় না। আবার পানিবিহীন জমিতে ফেলে রাখলেও বৃদ্ধি পায় না; বরং এর জন্য প্রয়োজন পানি ও মাটির মিশ্রণে তৈরি কাদামাটি। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا.

অতঃপর মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক। আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করেছি, অতঃপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদীর্ণ করেছি। (সূরা আবাসা : ২৪-২৬)

আবার কেবল মাটি ও পানিই যথেষ্ট নয়। শস্যদানা কাদামাটির সাথে মিশিয়ে বন্ধ এবং শুষ্ক কোনো স্থানে ফেলে রাখলেই উদ্ভিদ জন্মাবে না; বরং খোলামেলা কোনো জমিতে রাখতে হবে। যেখানে বাতাস চলাচল করতে পারে।

আবার কেবল বাতাসই যথেষ্ট নয়; বরং প্রয়োজন সবেগে বয়ে চলা বাতাস যা তার মধ্যে প্রবেশ করে। আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَ اَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ.

আমি বৃষ্টিবাহী বাতাস পাঠাই। (সূরা হিজর : ২২) এদিকেই ইঙ্গিত করছে। পরাগায়ন ঘটে বাতাস, মাটি এবং পানির সংমিশ্রণের মাধ্যমে।

আবার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও শীতকালে উদ্ভিদ অঙ্কুরোদগম হওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালের উত্তাপ।

মোটকথা, উদ্ভিদের খাদ্য হওয়ার জন্য এই চারটি জিনিস (পানি, মাটি, বাতাস এবং তাপ) প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রতিটি বস্তুই অপর তিনটি ব্যতীত কাজ করতে পারে না। সুতরাং আপনি চিন্তা করলেই পৃথিবীতে সাগর, নদী, খালবিলের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন। আমাদের সুবিধার্থেই আল্লাহ তাআলা সাগর সৃষ্টি করেছেন। ঝরনা জারি করেছেন, এর থেকে নদনদী বইয়ে দিয়েছেন। আবার পানি উঁচু স্থানে উঠতে পারে না বিধায় আল্লাহ তাআলা এক্ষেত্রেও অনুগ্রহ করেছেন। বৃষ্টিবাহী মেঘকে বাতাসের মাধ্যমে দূরদূরান্তে পাঠিয়ে দেন। সেগুলো থেকে বসন্ত এবং শরৎকালে প্রয়োজন অনুপাতে অবিরাম বারি বর্ষণ করেন।

আবার দেখুন, পাহাড় পানিকে কীভাবে আটকে রাখে। ঝরনা থেকে সেসব পানি ক্রমান্বয়ে উৎসারিত হয়। একবারেই সব পানি বেরিয়ে গেলে সমস্ত দেশ তলিয়ে যেতো। খেতখামার এবং গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যেতো। প্রকৃতপক্ষে পাহাড়, মেঘমালা, সাগর ও বৃষ্টির মাঝে আল্লাহ তাআলার অগণিত নিয়ামত রয়েছে।

আবার জমিন ও পানির মধ্যে উত্তাপ পাওয়া যায় না। কারণ, দুটিই ঠান্ডা। দেখুন, আল্লাহ তাআলা এই সূর্যকে উত্তাপ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করেছেন। সূর্য বহু দূরে অবস্থান করেও বিভিন্ন সময় পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে তোলে। শীতের সময় শীত আর গরমের সময় গরম হওয়া এটা সূর্যের অন্যতম রহস্য। সূর্যের এমন অনেক অগণিত রহস্য রয়েছে।

তারপর জমিনের ওপর উদ্ভিদ বড় হয়ে যখন তাতে ফল ধরে সে ফল প্রাথমিক পর্যায়ে শক্ত হয় এবং অপরিপক্ক থাকে। এর মধ্যে পরিপক্কতা আনয়ন ও নরম করার জন্য একরকম স্নিগ্ধতা প্রয়োজন। আল্লাহ চাঁদ সৃষ্টি করেছেন এবং তার আলোর মধ্যে স্নিগ্ধতা দিয়েছেন। যেমন সূর্যের আলোর মধ্যে প্রখরতা দিয়েছেন। চাঁদের আলোতে ফল পরিপক্ক হয় এবং তাতে রঙ আসে। এজন্যই দেখা যায়, কোনো গাছ যদি এমন জায়গায় থাকে যেখানে চাঁদ-সূর্যের আলো পৌঁছে না, তাহলে সে গাছ বেড়ে উঠতে পারে না। এ ব্যাপারে আলোচনা দীর্ঘ করব না।

চাঁদ-সূর্যের মতো অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রও এক বা একাধিক রহস্য ধারণ করে। এমনটা না হলে এগুলোর সৃষ্টি অনর্থক হয়ে যেতো। আল্লাহ তাআলার বাণী,

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا.

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। (সূরা বাকারা : ১৯১)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ.

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এদুয়ের মধ্যে কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (সূরা দুখান : ৩৮)

এসব আয়াত ভুল প্রমাণিত হতো। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেমন উপকারিতা মুক্ত নয়, তেমনি জগতের প্রতিটি অংশও উপকারিতা শূন্য নয়। গোটা বিশ্ব হলো একটি দেহের মতো। এর একেকটি অংশ দেহের একেকটি অঙ্গের মতো। শরীরের একেকটি অঙ্গ যেমন অপর অঙ্গকে সহায়তা করে তেমনি বিশ্ব জগতের এক অংশ অপর অংশকে সহায়তা করে থাকে। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে।

এটা বলা সঠিক নয় যে, আল্লাহ তাআলা চাঁদ, সূর্য এবং গ্রহ-নক্ষত্রকে যেই বিশেষ কাজে নিয়োজিত করেছেন এই নিয়োগের ওপর ঈমান আনা শরিয়তবিরোধী ! কারণ শরিয়ত জ্যোতিষী এবং জ্যোতির্বিদ্যা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। (যেমন আবু দাউদ শরিফের ৩৯০৫ নং হাদিস, ইবনে মাজাহর ৩৭২৬ নং হাদিস ও মুসনাদে আহমদ-এর ১ : ৭৮ দেখা যেতে পারে।) প্রকৃতপক্ষে এ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা এসেছে দুই কারণে।

১. একথা বিশ্বাস করা যে, চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র এসব কোনো মহাশক্তির অধীনে নয়, বরং নিজে নিজেই কাজ করে চলছে। এমন বিশ্বাস সুস্পষ্ট কুফরি।

২. জ্যোতিষীরা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে যেসমস্ত কথা বলে সেসব বিশ্বাস করা। তাদের কথাবার্তা হয় অজ্ঞতাপ্রসূত। বাস্তবে এই গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সংক্রান্ত ইলম ছিল আল্লাহ তাআলার এক নবীর মুজিযা। (কারও মতে তিনি ছিলেন ইদরীস (আ)। আবার কারও মতে তিনি ছিলেন দানিয়াল (আ)) তাঁর পর এই ইলম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমানে এই

ইলমের হযবরল দশা। সঠিক তথ্য এবং ভুল তথ্যের মাঝে পার্থক্য করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সঠিক বলে মনে করা এবং এই বিশ্বাস রাখা, সেগুলোর প্রভাব আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি জমিন, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে পাওয়া এটা দীনের ক্ষেত্রে দূষণীয় নয়; বরং তা সত্য; বরং না জানা সত্ত্বেও এই প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকার দাবি করাই দূষণীয়।

যেমন আপনি কাপড় ধুয়েছেন এখন তা শুকাতে চাইছেন তখন কেউ আপনাকে বলল, কাপড় বাইরে ছড়িয়ে দিন। রোদে আপনার কাপড় শুকিয়ে যাবে। সে লোকের কথা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। আবার বাইরে থেকে আসা কোনো লোকের চেহারা কালো দেখে কারণ জানতে চাইলে সে বলল, রোদে চেহারা ঝলসে গেছে। এলোকের কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। (কারণ, এসব প্রভাবের কথা সবাই জানে।)

তবে কিছু প্রভাব জানা আর কিছু প্রভাব অজানা। অজানা যেসব প্রভাব আছে সেগুলো জানার দাবি করা বৈধ নয়। আর জানা প্রভাবের কিছু এমন যা সবাই জানে। যেমন সূর্যের আলো আর উত্তাপ সম্পর্কে সবাই অবগত। আবার কিছু প্রভাব সম্পর্কে সবাই অবহিত নয়। যেমন চাঁদের আলোয় শীতলতা অনুভব করা।

মোটকথা, গ্রহ-নক্ষত্র খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এর পেছনে এমন অসংখ্য রহস্য রয়েছে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে এ আয়াত পড়লেন,

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি পবিত্র, আপনি আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। (সূরা আলে ইমরান : ১৯১)

অতঃপর বললেন, যারা এই আয়াত পাঠ করেও অহংকারে লিপ্ত থাকে তাদের জন্য দুর্ভোগ। (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৬২০) অর্থাৎ চিন্তাভাবনা না করে কেবল পড়েই যায়, মর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করে না। আসমানের রং ও নক্ষত্ররাজির আলো সম্পর্কেই কেবল অবগতি রাখে। চতুষ্পদ প্রাণীর জ্ঞানও তো এ পর্যন্তই। এ পর্যন্ত জেনেই যারা পরিতৃপ্ত হয়ে যায় তারাই অহংকারে লিপ্ত হয়।

আল্লাহ তাআলার সত্যিকারের প্রেমিক যারা তারা আসমান, দিগন্ত, প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার অপার কুদরত সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। কারণ যে ব্যক্তি কোনো আলেমকে মুহাব্বত করে সে উক্ত আলেমের রচনাবলি অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকে। যাতে সে উক্ত আলেমের প্রতি ক্রমাগত বর্ধমান ভালোবাসার কারণে তার ইলম সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতের বিষয়টিও এমনই। গোটা বিশ্ব আল্লাহ তাআলার লেখা বইয়ের মতো। সেসমস্ত লেখকরাও আল্লাহ তাআলার লিখিত বইয়ের মতো যারা আশ্চর্যজনক বিষয় লেখার মাধ্যমে তুলে ধরে। কোনো বই ভালো লাগলে উক্ত বইয়ের লেখকের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ না করে ওই পবিত্র সত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, যিনি এমন লেখক তৈরি করেছেন এবং এই লেখকের মাধ্যমে অজানা বিষয়ের ওপর থেকে পর্দা সরিয়েছেন। যেমন পুতুল নাচ দেখে কেউ পুতুলের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করে না। কারণ তা কাপড়ের স্তূপমাত্র। বরং যে পুতুলকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজের কৌশল প্রয়োগ করে তার প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করে।

সুতরাং বোঝা গেল উদ্ভিদের খাদ্য হলো মাটি, বাতাস এবং চাঁদ-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের আলো। চাঁদ এবং সূর্যের জন্য রয়েছে নির্ধারিত কক্ষপথ। কক্ষপথ নড়ানোর প্রয়োজন হয়। এ নড়ানোর কাজে এক দল ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। তারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশে কর্তব্য পালন করেন।

মোটকথা, এক কাজ অপর কাজের মাধ্যম হয়। আবার দ্বিতীয় কাজটি তৃতীয় কোনো কাজের মাধ্যম। এভাবে ক্রমান্বয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা অবধি পৌঁছে যায়।

আমাদের একথা বলার উদ্দেশ্য হলো দূরবর্তী মাধ্যমের প্রতি ইঙ্গিত করা। এই বলে আমরা উদ্ভিদের খোরাকের মাধ্যম নিয়ে আলোচনার ইতি টানছি।

মানুষ পর্যন্ত খাদ্য পৌঁছানোর মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামত

সব খাবার সব জায়গায় পাওয়া যায় না। বরং এর জন্য বিশেষ কিছু শর্ত আছে। এজন্যই তা কোনো স্থানে পাওয়া যায় আবার কোনো স্থানে পাওয়া যায় না। মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা খাবার থেকে অনেক দূরে। কখনো কখনো তাদের ও খাবারের মাঝে অনেক সাগর ও স্থলভাগ থাকে। আল্লাহ্ তাআলা যদি তাদের কাছে খাবার না পৌঁছাতেন তাহলে তারা না খেয়ে মারা যেত।

আল্লাহ্ তাআলা (তাদের কাছে) খাবার পৌঁছানোর জন্য ব্যবসায়ীদের নিয়োজিত করেছেন। মালের লোভ আর লাভের আশা তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যদিও তারা সেই সম্পদ থেকে বিশেষ কোনো উপকার পায় না। বরং শুধুই সম্পদ জমা করে চলে। হয় জাহাজ ডুবিতে তাদের সঞ্চিত সম্পদ ডুবে যায়। না-হয় দস্যুরা ছিনিয়ে নেয়। অথবা ভিন দেশে মারা যাওয়ায় সেসব সরকারী কোষাগারে জমা হয়ে যায়। সবচেয়ে ভালো অবস্থা যদি হয়, তাহলে তা উত্তরাধিকারীদের হাতে চলে যায়। দেখুন, আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তর অজ্ঞতা ও উদাসীনতা দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। লাভের আশায় বিপদের মুখোমুখি হয়। জান হাতে নিয়ে সাগর পাড়ি দেয়। খাদ্যসামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটে চলে।

আবার দেখুন, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে জাহাজ তৈরি এবং আরোহণের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। লক্ষ করুন, আল্লাহ্ তাআলা প্রাণীকে কীভাবে সৃষ্টি করেছেন। স্থলভাগে তাতে সওয়ার হওয়া এবং বোঝা বহন করার কাজে নিয়োজিত করেছেন। উটকে কীভাবে সৃষ্টি করেছেন দেখুন। ঘোড়া কীভাবে দ্রুত ছুটে চলে? গাধা কীভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে? উট কীভাবে ক্ষুৎপিপাসা নিয়ে মরুভূমিতে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলে? লক্ষ করে দেখুন, কত মানুষ কত পরিশ্রম করে নৌযান ও বাহনের মাধ্যমে জল ও স্থল পথে আপনার কাছে খাবার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে।

ভেবে দেখুন, বহন কার্যে নিয়োজিত প্রাণীর দানাপানির প্রয়োজন পড়ে, জাহাজের প্রয়োজন হয়। সব কিছুই আল্লাহ্ তাআলা প্রয়োজন পরিমাণ এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত তৈরি করে রেখেছেন। যা গুণে শেষ করা অসম্ভব। বিষয় সংক্ষেপনের জন্য আমরা এসব আলোচনা ছেড়ে দিলাম।

খাবার তৈরিতে আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামত

দুনিয়াতে যেসব উদ্ভিদ এবং প্রাণী খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলো যেভাবে ইচ্ছা খাওয়া যায় না। বরং খাওয়ার জন্য তাকে উপযোগী করতে হয় রান্না, কুটা বাছা ও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে। প্রতিটি খাদ্যের বিষয়ে আলাদা আলাদাভাবে বলতে গেলে কথা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। এজন্য আমরা কেবল একটি খাদ্য অর্থাৎ রুটির কথা জানব। এই রুটি শুরু থেকে আমাদের হাত পর্যন্ত পৌঁছতে কত স্তর পার হতে হয় আমরা তা নিয়ে আলোচনা করব।

রুটির প্রাথমিক দিকটা নিয়ে ভাবলে প্রথমেই আসে চাষির কথা। চাষিকে জমি কর্ষণ করে চাষের উপযোগী করতে হয়। তারপর বীজ ছিটিয়ে গরু দিয়ে হাল চাষ করতে হয়। তারপর পানি সিঞ্চণের কাজ। তারপর আগাছা পরিষ্কার করা। তারপর ফসল কাটা, তারপর শীষ থেকে শস্য পৃথক করা। তারপর পিষতে হয়। তারপর খামিরা তৈরি, তারপর রুটি তৈরি।

সুতরাং যে কাজগুলোর কথা আমরা আলোচনা করেছি আর যেগুলোর কথা আলোচনা করিনি সবগুলোর সংখ্যা, এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা এবং একাজে লোহা, কাঠ ও পাথরের যে সমস্ত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন সব সংখ্যা চিন্তা করে দেখুন।

চাষাবাদ, শস্য পিষা এবং রুটি তৈরির ক্ষেত্রে কাঠমিস্ত্রি, কামার এবং অন্যান্য কারিগরদের কাজ লক্ষ করুন। কামারের লোহা, সিসা এবং তামা প্রয়োজন পড়ে। লক্ষ করে দেখুন আল্লাহ তাআলা পাহাড়, পাথর এবং খনি তৈরি করেছেন। তাঁর কুদরত দেখুন পাশাপাশি দুটি জমিকে পৃথক পৃথক বানিয়েছেন।

অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন এই একটি রুটি আপনার খাওয়ার উপযোগী করতে এক হাজারেরও বেশি কারিগরের শ্রম দিতে হয়েছে। যেই ফেরেশতা বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য মেঘমালা হাঁকিয়ে নিয়ে যান তার থেকে শুরু। ফেরেশতার কাজ শেষ হলে শুরু হয় মানুষের কাজ। রুটিটি গোল হয়ে গেলে সাত হাজার কারিগর এর প্রতি আগ্রহী হয়। যাদের প্রত্যেকেই মৌলিক বস্তু তৈরি করে। যার মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন পূরণ হয়।

তারপর সেই সমস্ত উপকরণ নিয়ে মানুষের কাজের আধিক্যের ব্যাপারে চিন্তা করুন। সুঁই একটি ছোটো যন্ত্র। কাপড় সিলাই করার কাজেই এর

ব্যবহার হয়। সে কাপড় শীত থেকে বাঁচতে ব্যবহার করা হয়। যে ছোটো লোহার টুকরা থেকে সুঁই তৈরি হয় তা কমপক্ষে পঁচিশজন কারিগরের হাত বদল হয়। আবার প্রতি কারিগরই তার মধ্যে কাজ করে থাকে। আল্লাহ তাআলা যদি শহরের মধ্যে সমাজ সৃষ্টি না করতেন আর বান্দাদের নিয়োজিত না রাখতেন তাহলে মানবিক প্রয়োজন পূরণ হতো না। যেমন খেতে-খামারে কাজ করার জন্য কাস্তে প্রয়োজন। গোটা জীবন পার করে দিলেও কাস্তে বানানো সম্ভব হতো না।

কত মহান সেই সত্তা, যিনি এক ফোঁটা নাপাক পানি থেকে সৃষ্ট এই মানুষকে এমন শক্তি দিয়েছেন যে, সে এরকম বিস্ময়কর ও বিরল বস্তু তৈরি করতে সক্ষম হয়।

কাঁচির অবস্থা দেখুন। তা মূলত দুটি লোহার টুকরা। যা পরস্পর যুক্ত থাকে। প্রয়োজনের সময় তা এক সাথে ফাঁক করে আবার মিলিয়ে নিলে দ্রুত কাটা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে কাঁচি বানানোর পদ্ধতি শিখিয়ে না দিতেন তাহলে প্রয়োজনের সম্মুখীন হলে ভাবতে ভাবতেই আমাদের জীবন কেটে যেত। আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধিমত্তা আর নূহ (আ)-এর মতো দীর্ঘ আয়ু দিলেও আমরা এই যন্ত্র বানাতে পারতাম না। অন্য যন্ত্রপাতির কথা না হয় বাদই দিলাম।

সুমহান সেই সত্তা, যিনি অন্ধ ব্যক্তির সঙ্গী বানিয়ে দিয়েছেন চক্ষুষ্মানকে, যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অন্ধকে পথ চলতে সহায়তা করে।

এই সমস্ত যন্ত্রপাতি, এই সব কারিগর কতটা প্রয়োজনীয় তা সকলেরই জানা আছে। মনে করুন, আপনার শহর পেষণকারী, কামার, রক্ত মোক্ষণকারী এবং তাঁতি শূন্য হয়ে গেল অথবা কোনো এক কারিগরশূন্য হয়ে গেল, এমতাবস্থায় আপনি কেমন অবস্থার সম্মুখীন হবেন? আপনার যাবতীয় বিষয় কেমন ওলট পালট হয়ে যাবে? সুতরাং ভেবে দেখুন, কত মহান সেই সত্তা যিনি তার কিছু বান্দাকে অপর কিছু বান্দার কাজে নিয়োজিত করেছেন যাতে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় এবং রহস্য পূর্ণতা লাভ করে।

এ ব্যাপারেও আমরা দীর্ঘ আলোচনা করা থেকে বিরত থাকছি। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হলো নিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করা; সব ধরণের নিয়ামত উল্লেখ করা নয়।

খাবার প্রস্তুতকারীর মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত

যদি এসব খাবার প্রস্তুতকারক সহ অন্যান্য পেশাজীবির স্বভাব ও চিন্তা পৃথক হয়ে যেত তাহলে তারা বন্য পশুর মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত।

কেউ কারও উপকার করতো না। কোনো বিষয়ে একমত হতে পারতো না। আল্লাহ তাআলা মানুষের মনে জোড়মিল সঞ্চার করেছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ.

পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও আপনি তাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মাঝে প্রীতি স্থাপন করেছেন। (সূরা আনফাল : ৬৩)

সুতরাং এই জোড়মিল ও ঐক্য এবং স্বভাবের কারণে সবাই একত্র হয়। নগর ও দেশ আবাদ করে, কাছাকাছি ঘর নির্মাণ করে। বাজারে দোকানপাট কাছাকাছি হয় যাতে একে অপরের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে।

আবার মানুষের কিছু মন্দ স্বভাবের কারণে এই জোড়মিল এবং ঐক্য দূরীভূত হয়ে যায়। সেগুলো হলো লোভ, ক্রোধ, হিংসা। এসমস্ত মন্দ স্বভাবের কারণে মানুষ মারামারি ও ঘৃণ্য কাজের দিকে চলে যায়। যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহ তাআলা শাসকদেরকে নিয়োজিত করেছেন। তাদেরকে শক্তি, সামর্থ্য এবং উপকরণ দিয়েছেন। প্রজা এবং জনগণের মনে তাদের ভীতি সঞ্চার করেছেন, তাই তারা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় শাসককে ভয় করে। আবার শাসকদেরকে দেশ পরিচালনার ক্ষমতা দিয়েছেন। তারা দেশের বিভিন্ন অংশকে একটি দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মতো মনে করে। দেহের সব অংশ মিলে যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ দেহ তেমনি দেশের সব অংশ মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ দেশ। এক অংশ অপর অংশের জন্য সহায়ক এবং পরিপূরক। ফলে একজন সাধারণ জনতাও দেশের প্রধান থেকে উপকৃত হয় আবার একজন নেতা সাধারণ পেশার লোকদের থেকে উপকার গ্রহণ করে। এভাবে দেশ এবং সমাজে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য বজায় থাকে।

আবার আল্লাহ তাআলা নবীগণকে শাসকদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁরা শাসকদেরকে ন্যায়, ইনসাফ এবং শাসন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং ফিকহ শিক্ষা দান করেছেন যাতে শাসকগণ জনগণকে দুনিয়ার পাশাপাশি দীন শিক্ষা দিতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে নবীদেরকে সংশোধনের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আর ফেরেশতাদের এক দল আরেক দলকে সংশোধন করেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে একজন নিকটতম ফেরেশতা আছেন যার এবং আল্লাহ তাআলার মাঝে কোনো মাধ্যম নেই। এই শিক্ষা ও সংশোধন পদ্ধতি সৃষ্টিজগতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার এক চিরাচরিত ধারা।

রুটি প্রস্তুতকারী খামির থেকে রুটি তৈরি করে। পেষণকারী গম পিষে সংশোধন করে। কৃষক ফসল কাটার মাধ্যমে সংশোধন করে। কামার চাষাবাদের যন্ত্রপাতি তৈরি করে। কাঠমিস্ত্রি কামারের যন্ত্রপাতি তৈরি করে। তদ্রূপ সমস্ত পেশাজীবি ও কারিগররা অন্য পেশার উপকরণ তৈরি করে।

শাসক কারিগরদেরকে সংশোধন করেন। নবীগণ তাদের উত্তরাধিকারী আলেমদেরকে সংশোধন করেন। আলেমগণ শাসকদের সংশোধন করেন। ফেরেশতারা নবীদের জানিয়ে দেন, কীভাবে সংশোধন করতে হবে। এই ধারাবাহিকতা চলে সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক পর্যন্ত। যার থেকে উদ্ভাবন ঘটে সমস্ত রীতিনীতি। সমস্ত সৌন্দর্যের আধার কেবল তিনিই। এই সমস্ত কিছুই বিশ্ব জাহানের অধিপতি ও উপকরণের ব্যবস্থাকারী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিয়ামত। তাঁর অনুগ্রহ দান এবং নিম্নোক্ত আয়াত না হলে আমরা তাঁর অবারিত নিয়ামতের কিঞ্চিতও অবগত হতে পারতাম না। তিনি ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.

যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। (সূরা আনকাবুত : ৬৯)

আর তিনি যদি এই ঘোষণা না দিতেন যে তার নিয়ামত গুণে শুমার করা যাবে না, তাহলে আমরা গুণতে আগ্রহী হতাম। কিন্তু তিনি আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে গুণতে নিষেধ করে বলেছেন,

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا.

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। (সূরা নাহল : ১৮)

নিয়ামত গণনা করে কী লাভ? আমাদের ভাগ্যে নেই এমন নিয়ামত কি তাতে মিলবে? নাকি গণনা না করলে আমাদের ভাগ্যে যেসব নিয়ামত আছে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে? তিনি যা প্রদান করেন তাতে কেউ বাধা দিতে পারে না। আর যা তিনি না দেন তা কেউ দিতে পারে না। আমরা তো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষণে অন্তরের কান দিয়ে শুনতে পাই মহা প্রতাপশালী বাদশাহর ঘোষণা,

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

আজ কর্তৃত্ব কার? আল্লাহরই, যিনি এক, পরাক্রমশালী। (সূরা মুমিন : ১৬)

আল্লাহ তাআলার শোকর যে, তিনি আমাদেরকে কাফেরদের থেকে পৃথক বানিয়েছেন এবং জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই এই আওয়াজ শুনিয়ে দিয়েছেন।

ফেরেশতা সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত

আগে বলা হয়েছে, ফেরেশতার মাধ্যমে নবীগণ সংশোধনের পদ্ধতি জানতে পারতেন। এই ফেরেশতারাই তাঁদের কাছে ওহি নিয়ে আসতেন এবং হিদায়াতের পথ চিনিয়ে দিতেন। আপনি এটা মনে করবেন না, তাদের কাজ কেবল এতটুকুই; বরং সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও সমষ্টিগতভাবে ফেরেশতারা তিনভাগে বিভক্ত। জমিনের ফেরেশতা, আসমানের ফেরেশতা এবং আরশ বহনকারী ফেরেশতা।

খাদ্যের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব। হেদায়েত ও দিক নির্দেশনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা আমাদের আলোচনায় আসবে না।

মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ এবং উদ্ভিদের প্রতিটি অংশে খোরাক পৌঁছানোর জন্য সর্বনিম্ন সাত থেকে দশ এমনকি একশজন পর্যন্ত ফেরেশতা নির্ধারিত আছেন।

খোরাকের অর্থ হলো তার একটি অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়া কোনো অংশের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। এই খোরাক শেষে রক্ত হয়ে যায়। তারপর হাড় এবং

গোশতের আকৃতি ধারণ করে। হাড় এবং গোশতে পরিণত হওয়ার পর তা পরিপূর্ণ খোরাকে পরিণত হয়। রক্ত এবং গোশত এমন শরীর যার কোনো ক্ষমতা নেই। তা না নিজে নিজে নড়াচড়া করতে পারে, আর না নিজে পরিবর্তিত হতে পারে। শুধু মাত্র স্বভাবজাতভাবে খোরাক বিভিন্ন আকৃতিতে পরিবর্তিত হতে পারে না। গম যেমন কোনো কারিগরের সহায়তা ছাড়া আপনাআপনিই চূর্ণ হয়ে খামিরা এবং রুটির আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তদ্রূপ রক্তও কোনো কারিগরের সহায়তা ছাড়া গোশত, হাড়, শিরা এবং ধমনি হতে পারে না। অভ্যন্তরের কারিগর হলেন ফেরেশতা যেমন বাহ্যিক কারিগর হলো দেশের নাগরিক। এভাবেই আল্লাহ তাআলা ভিতরে ও বাহিরে নিয়ামত দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছেন। সুতরাং (বাহ্যিক নিয়ামতের পাশাপাশি) অভ্যন্তরীণ নিয়ামতের প্রতিও লক্ষ রাখা উচিত।

খোরাককে রক্ত এবং গোশতের দিকে টেনে নেওয়ার জন্য একজন ফেরেশতার প্রয়োজন। কারণ খোরাক নিজে নিজে নড়াচড়া করতে পারে না। দ্বিতীয় আরেকজন ফেরেশতা সেটাকে উক্ত স্থানে স্থির রাখেন। তৃতীয় ফেরেশতা খোরাক থেকে রক্তের আকৃতি দূর করেন। চতুর্থ এক ফেরেশতা উক্ত খোরাককে গোশত, হাড় এবং রগের আকৃতি দেন। পঞ্চম ফেরেশতা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খোরাককে শরীর থেকে বের করে দেন। ষষ্ঠ ফেরেশতা খোরাককে উপযুক্ত স্থানে পৌঁছে দেন। যেমন যেটা গোশত হওয়া সম্ভব সেটাকে গোশত আর যেটা হাড় হওয়া সম্ভব সেটাকে হাড় বানিয়ে দেন। যাতে আর পৃথক হতে না পারে। সপ্তম ফেরেশতার দায়িত্ব হলো এই সংযুক্তির মধ্যে মৌলিক পরিমাণের প্রতি লক্ষ রাখা। অর্থাৎ বৃত্তাকৃতির কোনো অঙ্গে এই পরিমাণ খোরাক সংযুক্ত করা, যাতে তার আকৃতির পরিবর্তন না ঘটে। আর চওড়া কোনো অঙ্গে সেটার আকৃতির পরিবর্তন সাধিত না হয় এমন পরিমাণ খোরাক সংযুক্ত করা। শূন্যগর্ভ কোনো অঙ্গের ভিতরগত ফাঁপা অংশ যেন ভরাট না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ রাখা।

মোটকথা, প্রতিটি অঙ্গ প্রয়োজন পরিমাণ সংরক্ষণ করা। যেমন নাকে যদি রানের পরিমাণ গোশত দেওয়া হয় তাহলে নাকের আকৃতি বড় এবং ভিতরের ফাঁপা অংশ ভরাট হয়ে চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে। বরং যে অংশে

যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু দেওয়া উচিত। যেমন চোখের পাতা নরম রাখা, চোখের তারা সচ্ছ রাখা, রান মোটা হওয়া, হাড় মজবুত হওয়া প্রভৃতি। এমন না হলে আকৃতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিছু অঙ্গ বেড়ে উঠবে আবার কিছু অঙ্গ দুর্বল হয়ে পড়বে। যদি এই ফেরেশতা বণ্টনের মাঝে ইনসাফ করার প্রতি দৃষ্টি না রাখেন তাহলে ব্যাপার কেমন ঘটবে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন সমস্ত খোরাক শরীরের এক পা ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ টেনে নিল। তাহলে এক সময় দেখা যাবে শরীরের সব অঙ্গ বড় হয়ে গেছে। কেবল ওই পা-টিই ছোটো রয়ে গেছে।

এই প্রকৌশলের বিষয়টি লক্ষ রাখা একজন ফেরেশতার দায়িত্ব। আপনি এটা মনে করবেন না যে, রক্ত স্বভাবজাতভাবে নিজের আকৃতি পরিবর্তন করে। যে ব্যক্তি এমনটি মনে করে সে অজ্ঞ বৈ কিছু নয়। সে কি বলছে সে নিজেই জানে না।

এই হলেন জমিনের ফেরেশতাগণ। আপনি যখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকেন তখন তারা আপনার ভিতরে খাদ্যকে পরিমার্জন করেন। এসব কাজ চলতে থাকে অথচ আপনি টের পান না। তারা আপনার প্রতিটি অঙ্গে প্রবেশ করে দায়িত্ব পালন করেন। চোখ এবং অন্তরের মতো ছোটো অঙ্গেও একশর অধিক ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন। সংক্ষেপনের কারণে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না।

জমিনের ফেরেশতাগণ আসমানের ফেরেশতাদের থেকে সহায়তা লাভ করেন। এই সহায়তা লাভের পদ্ধতি এবং নিয়ম কেবল আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। আসমানের ফেরেশতাগণ আবার আরশবহনকারী ফেরেশতাগণ থেকে সহায়তা লাভ করেন। তাদের সবাইকে তায়ীদ, হিদায়াত এবং তাসদীদের মাধ্যমে সহায়তা করেন সকলের রক্ষক চিরপবিত্র, সমগ্র জগত এবং যাবতীয় সম্মান ও ইজ্জতের একক অধিপতি, আকাশ ও পৃথিবীর মহাপরাক্রমশালী, গোটা জাহানের বাদশাহ, শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রতিপত্তির অধিকারী আল্লাহ তাআলা।

বর্ণনা দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায় যে, আসমান, জমিন, উদ্ভিদের অংশসমূহ প্রাণিজগত এমনকি বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যে মেঘ সরে যায় এসব কিছুর দায়িত্বে রয়েছেন অগণিত

ফেরেশতা। এসব প্রসিদ্ধ বিধায় আমরা দলিল হিসেবে সেগুলা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকছি।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, মানুষের অভ্যন্তরে খোরাকের দায়িত্ব সাতজন ফেরেশতাকে অর্পণ করার কী প্রয়োজন ছিল? একজন ফেরেশতাই তো সবদায়িত্ব পালন করতে পারেন। গম থেকে রুটি বানানোর পর্যায় পর্যন্ত অনেকগুলো স্তর রয়েছে। চাইলে এক ব্যক্তিই সবগুলো স্তর অতিক্রম করতে পারে। তাহলে একজন ফেরেশতাই খোরাক সংক্রান্ত সবগুলো কাজ করতে পারেন। সাতজন ফেরেশতার দরকার পড়ে না।

উত্তরে বলা হবে, মানুষ আর ফেরেশতার সৃষ্টিগত পার্থক্য আছে। এক একজন ফেরেশতা একেকটি গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন। মানুষের মতো একজন ফেরেশতা একাধিক গুণবিশিষ্ট হতে পারেন না। এদিকে ইশরা করেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ.

আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে। (সূরা সাফফাত : ১৬৪)

এজন্যই তাদের কেউ কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন না। তারা না হিংসা করেন আর না অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহ বোধ করেন। তাদের দৃষ্টান্ত হলো পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মতো। প্রতিটি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে। একটি অপরটির সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় না। চোখ শ্রবণের কাজ নিয়ে কানের সঙ্গে বিবাদ করে না। আবার কানও দেখার কাজ নিয়ে চোখের সঙ্গে বিবাদে জড়ায় না। ফেরেশতাদের কাজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটি অপরটির দায়িত্ব পালন করতে পারে। যেমন হাত দিয়ে কোনো কিছু ধরা যায় তদ্রূপ পা দিয়েও কোনো কিছু ধরা যায়। পার্থক্য কেবল এটুকুই যে হাত দিয়ে শক্তভাবে ধরা যায় আর পা দিয়ে অতটা শক্তভাবে ধরা যায় না। তবুও হাতের কাজে পাও অংশীদার হয়ে যায়। তদ্রূপ প্রহার করা হলো হাতের কাজ। কখনো কখনো এ কাজ মাথা দিয়েও করা যায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ মানুষের কাজের মতো নয়। মানুষ একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ করতে পারে। পেষণ করা, খামির তৈরি করা, রুটি তৈরি করা প্রভৃতি। আর ইন্দ্রিয় কেবল এক কাজ করতে পারে। যেমন চোখ কেবল দেখতে পারে; শুনতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের এই গুণ একপ্রকার বক্রতা এবং ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিচ্যুত করার নামান্তর। এর কারণ হলো, মানুষের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সবার বৈশিষ্ট্য এক রকম নয়, তাই সবার কাজও এক রকম নয়।

এজন্যই দেখা যায়, মানুষ কখনো আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মেনে চলে আবার কখনো অমান্য করে। কিন্তু ফেরেশতাদের দ্বারা এমনটা কল্পনাও করা যায় না। কারণ তারা কেবল আনুগত্যের জন্যই সৃষ্ট। অবাধ্য হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়। তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআন বলছে,

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ তাদের আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তা-ই করে। (সূরা তাহরিম : ৬)

অন্য আয়াতে এসেছে,

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ.

তারা দিন রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, কখনো শৈথিল্য করে না। (সূরা আম্বিয়া : ২০)

তাদের মধ্যে যে রুকু করেছে সে চিরকাল রুকুরত থাকবে। আর যে সিজদা করেছে সে চিরকাল সিজদারত থাকবে। দণ্ডায়মান ফেরেশতা চিরকাল দণ্ডায়মান থাকবে। তাদের কাজে কোনো রদবদল বা ক্লান্তি নেই। প্রত্যেকেরই এক নির্ধারিত অবস্থা আছে যার ব্যতয় ঘটে না।

তারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য এমনভাবে করেন যে, অবাধ্যতা করার কোনো সম্ভাবনাও নেই। তাদের আনুগত্যের উদাহরণ হলো দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো। যেমন আপনি চোখের পাতা খোলার দৃঢ় ইচ্ছা করলেন। তখন চোখ সুস্থ থাকলে আপনি চোখ খুলতে বাধা পাবেন না। এমন হবে না যে আপনি চোখ খুলতে চাইলে চোখ একবার আপনার নির্দেশ মান্য করবে, আবার নির্দেশ অমান্য করবে। বরং সে সর্বদা আপনার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করে। আদেশ দেওয়া জরুরি নয়; আপনি ইচ্ছা করলেই সে খুলে যায় আবার বন্ধ করতে চাইলেই সে বন্ধ হয়ে যায়। এদিক থেকে ফেরেশতাদের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। কিন্তু আরেক দিক

থেকে উভয়ের মধ্যে তফাত আছে। কারণ চোখের পাতা খোলা-বন্ধ হওয়ার কাজটি চোখ নিজে টের পায় না। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণ জীবিত, তারা যে কাজ করেন সে বিষয়ে তারা জ্ঞান রাখেন।

মোটকথা, আপনি জমিনের ফেরেশতা এবং আসমানের ফেরেশতাদের মাধ্যমে এই নিয়ামত প্রাপ্ত হোন। আর খোরাকের মাধ্যমে আপনার ওই সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করা হয় যা আমরা বর্ণনা করেছি। খোরাক ছাড়া আপনার যেসব প্রয়োজন এবং কাজ করবার রয়েছে সেগুলোর মধ্যে যেখানে ফেরেশতার প্রয়োজন হয় কিতাবের কলেবর বড় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমরা সেসব নিয়ে আলোচনা করছি না।

সেগুলো হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের নিয়ামত। আর এক পর্যায়ের নিয়ামতের আলোচনা করাই সম্ভব নয় সেখানে অন্যান্য পর্যায়ের আলোচনা করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

আল্লাহ তাআলা বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ সবধরনের নিয়ামত দিয়ে আমাদের ঢেকে রেখেছেন। কুরআনে এসেছে,

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً.

এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ পূর্ণরূপে বর্ষণ করেছেন। (সূরা লুকমান : ২০)

আবার ইরশাদ হয়েছে,

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ.

তোমরা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য গুনাহ বর্জন করো। (সূরা আনআম : ১২০)

গোপন গুনাহ বলে ওই সমস্ত গুনাহ উদ্দেশ্য যা মানুষ জানে না। যেমন হিংসা, কুধারণা, বিদআত, মানুষর ক্ষতি করার ইচ্ছাসহ যাবতীয় অন্তরের গুনাহ। এসমস্ত গুনাহ বর্জন করা মানে অন্তরের নিয়ামতের শোকর আদায় করা। আর প্রকাশ্য গুনাহ বর্জন করা প্রকাশ্য নিয়ামতের শোকর আদায় করা।

বরং আমি তো এটা বলব, কোনো ব্যক্তি যদি চোখের পলক ফেলার মধ্যে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করে অর্থাৎ যেখানে চোখ বন্ধ রাখা দরকার

ছিল সেখানে খুলে রাখে তাহলে সে যেন আসমান-জমিনের মধ্যে এবং এদুয়ের মধ্যবর্তী সব নিয়ামতের না-শোকরি করল। কারণ আসমান জমিন, ফেরেশতা, উদ্ভিদ এবং প্রাণীসহ যা কিছু আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন তা সামগ্রিকভাবে একেকজন বান্দার জন্য একেকটি নিয়ামত। কারণ এর দ্বারা সে পূর্ণ উপকার পায় যদিও অপর ব্যক্তি এসব থেকে উপকৃত হয়। এই পলক ফেলা বাহ্যত যদিও ছোটো কাজ। বাহ্যিকভাবে এর কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার অনেক নিয়ামত রয়েছে। এই চোখের পাতার মধ্যে যে সব রগ রয়েছে মস্তিষ্কের প্রধান রগের সাথে এগুলোর যোগাযোগ রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমেই উপরের পাতা নিচে নামে আর নিচের পাতা উপরে উঠে। আবার উভয় পাতাতেই কালো কালো চুল রয়েছে। এগুলো কালো হওয়ার কারণ হলো, কালো রঙ চোখের জ্যোতি একত্র করে। পক্ষান্তরে সাদা রং চোখের জ্যোতি বিক্ষিপ্ত করে দেয়। আল্লাহ তাআলার অপূর্ব নিয়ামত যে তিনি পালকগুলোকে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করেছেন। এর মাধ্যমে চোখ বাতাসে উড়তে থাকা ছোটো খাটো পোকা এবং ধুলোবালি থেকে সুরক্ষিত থাকে। চোখের পাতার প্রতিটি চুলে দুটি স্বতন্ত্র নিয়ামত রয়েছে।

১. এই চুলগুলোর গোড়া নরম।

২. এই চুলগুলোর গোড়া নরম হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। উপর এবং নিচের পালক সম্মিলিতভাবে জালের মতো হয়ে থাকা সবচেয়ে বড় নিয়ামত। কখনো কখনো বাতাসে থাকা ধুলোবালির কারণে চোখ খোলা যায় না এ অবস্থায় চোখ বন্ধ রাখলে কিছু দেখা যায় না। মানুষ নিজের চোখ এমনভাবে বন্ধ করবে যে, উপর নিচের পালক মিলিয়ে জালের মতো বানাবে। তার সেই জালের পিছন থেকে তাকাবে। চুলের তৈরি এই জাল চোখকে বাইরে থেকে আসা ময়লা থেকে রক্ষা করবে আবার ভিতর থেকে তাকাতে সহায়তা করে।

আবার যদি চোখের ভিতরে ধুলোবালি প্রবেশ করে তাহলে চোখ কয়েকবার খোলাবন্ধ করলে নিজে নিজেই পরিষ্কার হয়ে চোখের কোণ দিয়ে এবং চোখের পাতার সাথে বের হয়ে যাবে। চোখের পাপড়িকে আল্লাহ তাআলা গ্লাস পরিষ্কার করার যন্ত্র বিশেষ 'ওয়াইপার' (wiper)

বানিয়ে দিয়েছেন। মাছিকে আল্লাহ তাআলা চোখের পাপড়ি দেননি। তাই আপনি দেখবেন, মাছি সবসময় পায়ের সাহায্যে চোখ পরিষ্কার করে চলে। আল্লাহ তাআলার সমস্ত নিয়ামতের বিবরণ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তাহলে কিতাব দীর্ঘ হয়ে যাবে। সময় যদি সঙ্গ দেয় আর আল্লাহ তাআলার তাওফিক সহায়তা করে, তাহলে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র কিতাব লেখার ইচ্ছা আছে। যার নামকরণ করব, عَجَائِبُ صُنْعِ اللهِ تَعَالَى; সুতরাং আমরা এখন মূল বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।

যে ব্যক্তি হারাম বস্তুর দিকে তাকালো সে চোখের পাপড়িতে থাকা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের অবাধ্যতা করল। কারণ, পাপড়ি চোখের উপর, চোখ মাথার উপর, মাথা সমগ্র শরীরের উপর, শরীর খাদ্যের উপর আর খাদ্য পানি, বাতাস, মাটি, বৃষ্টি, মেঘ, সূর্য ও চন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। আর এসব কিছুই আসমানের মাধ্যমে, আর আসমান ফেরেশতাদের মাধ্যমে টিকে আছে। সুতরাং সবগুলো মিলে একটি বিষয় হলো। একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্ক দেহের অঙ্গসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের মতো। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সমগ্র অংশে তাঁর নাফরমানি করে তাহলে ঊর্ধ্বজগতের ফেরেশতা থেকে শুরু করে প্রাণী, উদ্ভিদ এমনকি জড়বস্তু পর্যন্ত তাকে অভিসম্পাত করে। যেমন হাদিসে এসেছে, 'কোনো স্থানে মানুষ একত্র হয়ে তারপর যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় উক্ত স্থান তখন ওই লোকদের জন্য ইস্তিগফার করে। অথবা তাদের অভিসম্পাত করে।[২]

আরেক হাদিসে এসেছে, আলেমের জন্য প্রতিটি বস্তু এমনকি সাগরের মাছ পর্যন্ত দুআ করে। (সুনানে আবি দাউদ : ৩৬৪১; জামে তিরমিযী : ২৬৮২; সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৩)

অন্য হাদিসে এসেছে, ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যকে অভিসম্পাত করে থাকেন। (সহিহ মুসলিম : ২৬১৬)

এরকম অসংখ্য রেওয়ায়াত রয়েছে। যেসব থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করা সমস্ত

---

২ হুবহু এই শব্দে বর্ণিত হাদিস পাওয়া যায়নি। তবে এর কাছাকাছি অর্থের বিভিন্ন হাদিস পাওয়া যায়।

সৃষ্টিজগতের সঙ্গে অপরাধ করার নামান্তর। এর মাধ্যমে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। তবে গুনাহ করার সাথে সাথে কোনো নেক কাজ করে ফেলা হলে অভিশাপটি ক্ষমাপ্রার্থনায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির তাওবা কবুল করে তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহ তাআলা আইয়ুব (আ)-এর কাছে ওহি পাঠালেন, আমার প্রতিটি বান্দার সাথে দুজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। বান্দা আমার নিয়ামতের শোকর আদায় করলে ফেরেশতা দুজন বলে, হে আল্লাহ! আপনি এই বান্দার প্রতি আপনার নিয়ামত আরও বৃদ্ধি করে দিন। প্রশংসা এবং শোকরের অধিকারী কেবল আপনি। অতএব হে আইয়ুব! আপনিও শোকরগুজার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। শোকরগুজার বান্দাদের শ্রেষ্ঠতম বদলা আমার নিকট এটাই যে, আমি শোকারগুজার বান্দাদের শোকর আদায় করি। আমার ফেরেশতারা শোকরগুজার বান্দাদের জন্য দুআ করে। যেখানে সে অবস্থান করে সে জায়গা তাকে পছন্দ করে। আর তার চিহ্নসমূহ তার বিচ্ছেদে অশ্রু বর্ষণ করে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১০)

চোখের মধ্যে যেমন আল্লাহ তাআলার অনেক নিয়ামত রয়েছে তেমনি শ্বাসের মধ্যেও আল্লাহ তাআলার দুটি নিয়ামত রয়েছে। শ্বাস ত্যাগ করার মাধ্যমে অন্তর থেকে উত্তপ্ত ধোঁয়া বের হয়। এটা বের হতে না পারলে মানুষ মারা যেতো। আবার শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে বাইরে থেকে তাজা বাতাস অন্তরে প্রবেশ করে। এই তাজা বাতাস অন্তরে প্রবেশ না করলে ভিতরটা তাজা ও শীতল বাতাসের অভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠত এবং মৃত্যু অনিবার্য হয়ে যেতো।

দিনরাত সর্বমোট চব্বিশ ঘণ্টা। প্রতি ঘণ্টায় প্রায় এক হাজার বার শ্বাস নেওয়া এবং ছাড়ার প্রয়োজন হয়। একেকবার শ্বাস গ্রহণ করতে এবং ছাড়তে প্রায় দশ সেকেন্ড ব্যায় হয়। তাহলে প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার নিয়ামত আপনার উপর বরং বলা ভালো গোটা জগতের উপর বর্ষিত হয়ে চলছে। ভেবে দেখুন, এসব কি গুণে শেষ করা সম্ভব?

আল্লাহ তাআলার নিয়ামত গুণে শুমার করা সম্ভব নয় এ কথা আল্লাহ তাআলার নবী মুসা (আ)-এর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলে তিনি আরজ

করলেন, হে আমার রব, আপনার শোকর আমি কীভাবে আদায় করতে পারি, অথচ আমার শরীরের প্রতিটি লোমে আপনার দুটি করে নিয়ামত বিদ্যমান। এগুলোর গোড়াকে আপনি নরম বানিয়েছেন আর মাথা উঁচু বানিয়েছেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২০৯)

এজন্যই হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি কেবল পানাহারকেই আল্লাহ তাআলার নিয়ামত মনে করবে তার ইলম কম। আর আজাব তার সন্নিকটে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১ : ২১০)

এ যাবত আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তা কোনো না কোনোভাবে আহারের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এর উপর বিবেচনা করে অন্যান্য নিয়ামতের কথা চিন্তা করুন। কারণ বিজ্ঞ মানুষ যা কিছু দেখে এবং ভাবে সব কিছুর মাঝে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত উপলব্ধি করে।

সুতরাং বিস্তারিত ও বিশদ বর্ণনা বর্জন করছি।

শোকরে উদাসীনতার কারণ

অজ্ঞতা ও অমনোযোগিতার কারণে মানুষ নিয়ামতের শোকর করে না। কেননা, সে অজ্ঞতাবশত নিয়ামত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এটা জানা কথা যে, শোকর আদায় করতে হলে নিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যারা নিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তাদের অনেকেরই ধারণা হলো, মুখেমুখে 'আলহামদুলিল্লাহ' অথবা 'আল্লাহর শোকর' বলাই হচ্ছে নিয়ামতের শোকর। যে নিয়ামত যে রহস্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে সেই নিয়ামত পূর্ণ করার কাজে ব্যবহার করাই যে শোকরের প্রকৃত অর্থ সে কথা তারা জানে না। আর নিয়ামতের উদ্দিষ্ট রহস্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। এ দুটি বিষয় জানার পর শোকরের বাধা প্রবৃত্তির প্রভাব এবং শয়তানের আধিপত্য ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

এখন নিয়ামত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণ কয়েকটি। এক, মানুষ অজ্ঞতাবশত যে বস্তু সকলের নিকট সর্বাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাকে নিয়ামত গণ্য করে না। ফলে, কেউ এর শোকর আদায় করে না। যেমন, আহার সম্পর্কিত যে সমস্ত নিয়ামত উপরে বর্ণিত হলো। কেউ এগুলোর শোকর করে না। কারণ, এগুলো ব্যাপক নিয়ামত। কারও সাথে এগুলোর

বিশেষত্ব নেই। এমনিভাবে নিশ্বাসের ক্ষেত্রে কেউ শোকর করে না। অথচ ক্ষণিকের জন্য গলা চেপে ধরলে শ্বাস বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়। অথবা যদি কাউকে এমন ঘরে আটকে রাখা হয়, যার বাতাস উত্তপ্ত কিংবা এমন কূপে আটকে রাখা হয়, যার বাতাস হিমশীতল, তবে সে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। হ্যাঁ, যদি আটক রাখার পর পুনরায় মরণাপন্ন অবস্থায় বের করা হয়, তাহলে সে বুঝবে বাতাস একটি বড় নিয়ামত। তাই কথায় বলে, (قدر نعمت بعد زوال می شود) অর্থাৎ, 'হাতছাড়া হওয়ার পরই নিয়ামতের মূল্য বুঝে আসে।' কিন্তু এটা অজ্ঞতা। কারণ, এতে নিয়ামত হাতছাড়া হওয়ার পর আবার হস্তগত হওয়ার ওপর শোকর নির্ভরশীল হবে। অথচ নিয়ামতের শোকর সর্বদাই হওয়া উচিত। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে কখনো চোখের শোকর করতে দেখা যায় না। অথচ অন্ধ হওয়ার পর সে চোখের মর্ম বুঝে। এরপর যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, তাহলে সে একে নিয়ামত মনে করে শোকর করে।

আল্লাহ তাআলার রহমত সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে বিস্তৃত এবং সর্বাবস্থায় সুলভ বিধায় অজ্ঞ লোকেরা একে নিয়ামত মনে করে না। এই ধরনের অজ্ঞ লোকেরা হলো বেআদব গোলামের মতো। যাদের সব সময় পিটুনি দিতে হয়। কিছু সময় পিটুনি দেওয়া বন্ধ করলে তারা সে সময়টাকে নিয়ামত মনে করে। আর পিটুনি দেওয়া বিলকুল বন্ধ করলে সে উদ্ধত হয়ে না-শোকরি করতে থাকে।

মানুষের বর্তমান অবস্থা হলো, তারা শুধু ধনসম্পদেরই শোকর করে—এতে করে তাদের কিছু বিশেষত্ব হয়ে যায়। চাই সম্পদ বেশি হোক বা কম। তাছাড়া অন্য সব নিয়ামত তারা ভুলে যায়। বর্ণিত আছে, এক গরিব ব্যক্তি কোনো এক বুযুর্গের নিকট তার দারিদ্র্যের অভিযোগ তুলে ধরে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করল। বুযুর্গ বললেন, তুমি কি দশ হাজার দিরহামের পরিবর্তে অন্ধ হয়ে যাওয়া পছন্দ করবে? লোকটি বলল, না। বুযুর্গ বললেন, তুমি কি দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে বোবা হয়ে যাওয়া কবুল করবে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, দশ হাজারের পরিবর্তে তুমি কি ল্যাংড়া হতে সম্মত হবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, দশ হাজারের বিনিময়ে তুমি পাগল হওয়া পছন্দ করবে? সে বলল, না। বুযুর্গ বললেন,

তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তোমার লজ্জা হয় না? তিনি পঞ্চাশ হাজার দিরহামেরও বেশি পরিমাণ সম্পদ তোমাকে দিয়ে রেখেছেন। এরপরও তুমি অভিযোগ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছ?

বর্ণিত আছে, এক হাফেজ সাহেব ভীষণ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, কেউ তাকে বলছে, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে কি তুমি সূরা আনআম ভুলে যেতে রাজি আছো? কারী সাহেব বললেন, না। বলা হলো, সূরা হুদ ভুলে যেতে রাজি আছো? কারী সাহেব অসম্মতি প্রকাশ করলেন। বলা হলো, তবে কি সূরা ইউসূফ ভুলে যেতে রাজি আছো? কারী সাহেব এবারও অসম্মতি জানালেন। এভাবে তাকে বিভিন্ন সূরা ভুলে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলো। হাফেজ সাহেব বরাবরই অস্বীকার করে চললেন। শেষে বলা হলো, এক লাখ দিনারের মূল্যবান সম্পদ তোমার সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তুমি অভিযোগ কর কীভাবে? পরবর্তী সকালে তাঁর দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১০)

একবার হযরত ইবনে সামমাক (র) তাঁর সময়ের খলিফার দরবারে গেলেন। খলিফা গ্লাস থেকে পানি পান করতে করতে বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, যদি আপনি পিপাসার্ত হন, আপনার যাবতীয় ধনসম্পদ দিয়ে আপনি এক গ্লাস পানি পেতে পারেন। এমতাবস্থায় আপনি কী করবেন? সমুদয় ধনসম্পদ দিয়ে পানি সংগ্রহ করবেন কি না? খলিফা বললেন, পানির জন্য অবশ্যই সকল অর্থ দিয়ে দেব। ইবনে সামমাক (র) বললেন, এর পরিবর্তে যদি পুরো রাজত্ব দিতে হয়, তবে তা-ও দিয়ে দেবেন? খলিফা বললেন, অবশ্যই। ইবনে সামমাক (র) বললেন, তা হলে এরূপ রাজত্বের জন্য আনন্দিত হওয়া উচিত নয়, যার মূল্য এক গ্লাস পানির সমানও নয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, পিপাসার সময় এক গ্লাস পানির মূল্য সমগ্র বিশ্বের রাজত্বের চেয়েও অধিক।

মানুষ সাধারণত বিশেষ নিয়ামতকেই শুধু নিয়ামত মনে করে, এ পর্যন্ত আমরা শুধু ব্যাপক নিয়ামতের কথা আলোচনা করেছি। তাই সংক্ষেপে কিছু বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে, তাহলে একটি অথবা কয়েকটি নিয়ামত এমন পাবে, যা বিশেষভাবে তারই জন্য নির্ধারিত।

কোনো মানুষই এতে তার সাথে অংশীদার নয়। তিনটি বিষয়ে যে কেউ একথা স্বীকার করে। প্রথম বিবেকবুদ্ধি, দ্বিতীয় চরিত্র এবং তৃতীয় জ্ঞান।

বিবেকবুদ্ধি সম্পর্কে তো এটা প্রসিদ্ধ যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিমত্তাকে পূর্ণ মনে করে। এমন কোনো মানুষ নেই, যে আপন বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট নয় এবং নিজেকে অন্যের তুলনায় অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন মনে না করে। এজন্যই কেউ আল্লাহ তাআলার নিকট বুদ্ধিমত্তার জন্য দুআ করে না। এটাও বুদ্ধিমত্তার অন্যতম গর্ব যে, যে ব্যক্তি এ গুণ থেকে মুক্ত, সে-ও এর জন্য সন্তুষ্ট এবং যে এ গুণে গুণান্বিত, সেও খুব আনন্দিত। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যখন স্বীয় বিশ্বাসে অপরের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান, প্রকৃতপক্ষে তা-ই হলে এ নিয়ামতের শোকর করা তার ওপর অপরিহার্য। পক্ষান্তরে বাস্তবে এরূপ না হলেও শোকর আদায় ওয়াজিব। কারণ, তার পক্ষে তো এই নিয়ামত বিদ্যমান আছে।

যেমন কেউ জমিনে ধনসম্পদ পুঁতে রেখে খুশি হলো এবং শোকর আদায় করল। এখন কেউ যদি তার অজান্তেই সেসব ধনসম্পদ তুলে নেয় তবুও প্রথম ব্যক্তির খুশি বহাল থাকবে তার বিশ্বাস অনুযায়ী এবং তার শোকরও অবশিষ্ট থাকবে। কারণ তার বিশ্বাসমতে তার ধনসম্পদ বহাল তবিয়তেই আছে।

চরিত্রের অবস্থাও এরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের মাঝে কিছু দোষ থাকা পছন্দ করে এবং অন্যের কিছু অভ্যাসকে খারাপ মনে করে। কিন্তু নিজেকে এগুলো থেকে মুক্ত মনে করে। সুতরাং তার শোকর করা কর্তব্য যে, আল্লাহ তাআলা তার অভ্যাস সুন্দর করেছেন এবং অপরকে খারাপ অভ্যাস দিয়েছেন।

ইলমের ক্ষেত্রেও অবস্থা এই যে, সকল মানুষই নিজের মধ্যে এমন কিছু গোপন বিষয়ে ইলম বা জ্ঞান রাখে, যা অন্য কেউ জানে না। যদি একজনও জেনে যায়, তবে সে অপমানিত ও ছোটো হয়ে যায়। তাই এসকল বিষয় জানার ব্যাপারে অন্য কোনো ব্যক্তি তার সঙ্গে শরিক থাকে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা যে তার বিষয়গুলো গোপন রেখেছেন, সেজন্য আল্লাহর শোকর করা কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ তার গোপন দোষগুলো মানুষের নিকট হতে গোপন রেখেছেন, উত্তম বিষয়গুলো প্রকাশ করেছেন এবং দোষসমূহের জ্ঞান তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেননি।

উল্লিখিত তিনটি বিশেষ নিয়ামত সকলেই মেনে নেয়। হয়তো স্বাভাবিকভাবে সকল বিষয়ে অথবা কিছু বিষয়ে আমাদের মতে, এখানে তিন বিষয়ে বিশিষ্ট করা ঠিক নয় বরং সাধারণ নিয়ামতের মধ্যেও বিশেষত্ব পাওয়া যায়। আমরা দুনিয়াতে এমন ব্যক্তিকেও দেখি আল্লাহ তাআলা যার আকৃতি, চরিত্র, গুণাবলি, পরিবার, সন্তানসন্ততি, বাসস্থান, দেশ, সঙ্গী, আত্মীয়, সম্মান, প্রতিপত্তি, পছন্দনীয় বিষয় এসবের কোনো একটা তাকে অবশ্যই দেওয়া হয়েছে। যদি এই নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং অন্য ব্যক্তিকে যা দিয়ে বিশিষ্ট করা হয়েছিল তা দেওয়া হয় তাহলে সে এতে সম্মত হয় না।

যেমন তাকে কাফির না বানিয়ে মুমিন বানানো হয়েছে। জড় পদার্থ না বানিয়ে প্রাণী বানানো হয়েছে। পশু না বানিয়ে মানুষ বানানো হয়েছে। মহিলা না বানিয়ে পুরুষ বানানো হয়েছে। অসুস্থ না বানিয়ে সুস্থ বানানো হয়েছে। খুঁতযুক্ত না করে, নিখুঁত বানানো হয়েছে। এই নিয়ামতগুলো যদিও ব্যাপক, অনেক লোকই তা অর্জন করেছে।

তথাপি তা এই বিবেচনায় বিশিষ্ট যে, যদি কাউকে তার নিয়ামত পরিবর্তন করে দিতে চাওয়া হয় সে তাতে সম্মত হবে না। যেমন সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থা, ঈমানের পরিবর্তে কুফুরি গ্রহণ করতে বলা হলে আদৌ সম্মত হবে না। বরং কিছু অবস্থা তো এমন যে কাউকে তার বর্তমান অবস্থার তুলনায় উত্তম অবস্থার প্রস্তাব দিলেও তা গ্রহণ করবে না। যেমন সন্তানসন্ততি, স্ত্রী, মা-বাপ, আত্মীয়স্বজন। কাউকে তার সন্তানের পরিবর্তে অধিক সুন্দর, ধী-শক্তিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান সন্তানের প্রস্তাব দেওয়া হলেও তা গ্রহণ করবে না। সুতরাং জানা গেল, যে নিয়ামত সুলভ তা অন্য কেউ পেয়ে থাকলেও প্রত্যেকেই নিজেরটাকে বিশেষ নিয়ামত মনে করে থাকে। এজন্যই অপরেরটাকে গ্রহণ করতে চায় না। যদি কেউ নিজের অবস্থা অপরের সামগ্রিক অবস্থার সাথে পরিবর্তন করতে না চায় অথবা নিঃশেষ অবস্থার সাথেও পরিবর্তন করতে সম্মত না হয় তাহলে এ কথাই বোঝা যাবে যে সে এমন এক নিয়ামত পেয়েছে যা সে ভিন্ন অন্য কেউ পায়নি। আর কেউ যদি নিজের অবস্থা পরিবর্তন করতে আগ্রহী হয় তাহলে দেখতে হবে পরিবর্তনে আগ্রহী এমন লোকদের সংখ্যা কেমন, এটা নিশ্চিত যে এমন লোকদের সংখ্যা কম হবে। সুতরাং

যারা অবস্থার দিক থেকে নিম্নমানের তারা সংখ্যায় তাদের থেকে অধিক, যারা অবস্থায় তার থেকে উন্নত। সুতরাং আল্লাহ তাআলার নিয়ামত তুচ্ছ মনে করার জন্য উপরের দিকে না তাকিয়ে নিচের দিকে তাকানো উচিত। তাহলে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত বড় মনে হবে। দুনিয়াকে দীনের সাথে তুলনা করা দরকার। কোনো গুনাহ হয়ে গেলে পাপীদের সংখ্যা অধিক মনে করে নিজেকে প্রবোধ দেওয়া হয়। দীনের ক্ষেত্রে সর্বদাই উপর দিকে না তাকিয়ে নিচের দিকে তাকানো হয়। তাহলে দুনিয়ার ক্ষেত্রে কেন বিপরীতটা করা হবে?

মোটকথা, দীনের ক্ষেত্রে অধিকাংশের অবস্থা ভালো, আর দুনিয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশের থেকে অবস্থা ভালো হলে কেন শোকর আদায় অপরিহার্য হবে না?

এজন্যই নবী কারীম (স) বলেছেন,

مَنْ نَظَرَ فِي الدُّنْيَا إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وَنَظَرَ فِي الدِّيْنِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ كَتَبَهُ اللهُ صَابِرًا وَشَاكِرًا، وَمَنْ نَظَرَ فِي الدُّنْيَا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ وَفِي الدِّيْنِ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ صَابِرًا وَلَا شَاكِرًا.

যে ব্যক্তি দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিজের অধঃস্তন ব্যক্তির দিকে আর দীনের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির দিকে নজর রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সবরকারী এবং শোকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের প্রতি এবং দীনের ক্ষেত্রে অধস্তন ব্যক্তির দিকে নজর দেবে আল্লাহ তাআলা তাকে সবরকারী ও শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। (জামে তিরমিযী : ২৫১২)

যদি প্রত্যেক মানুষ নিজের হিসাব নেয় এবং আল্লাহ তাআলা তাকে বিশেষভাবে যে নিয়ামত দান করেছেন তা অনুসন্ধান করে, তাহলে এমন অনেক নিয়ামত দেখতে পাবে। বিশেষত ওই লোকেরা পাবে যারা সুন্নাহ, ঈমান, ইলম, কুরআন, অবসর, সুস্থতা এবং নিরাপত্তা পেয়েছে। এক কবি উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

مَنْ شَاءَ عَيْشًا رَحِيْبًا يَسْتَطِيْبُ بِهِ * فِيْ دِيْنِهِ ثُمَّ فِيْ دُنْيَاهُ إِقْبَالًا.

فَلْيَنْظُرَنَّ اِلٰى مَنْ فَوْقَهٗ وَرِعًا * وَلْيَنْظُرَنَّ اِلٰى مَنْ دُوْنَهٗ مَالًا.

যে ব্যক্তি মনমতো জীবনযাপন করতে চায়, দীনের মধ্যে সম্মান আর দুনিয়ায় মাথা উঁচু করে চলার অভিলাষ রাখে, সে যেন তার চেয়ে অধিক মুত্তাকি এবং অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল ব্যক্তিদের দিকে লক্ষ করে। (দীওয়ানে আবুল ফাতাহ আল-বাস্তী : ২৮৪)

ইলমের মতো মহা নিয়ামত পেয়েও যে ব্যক্তি তুষ্ট হয় না তার সম্পর্কে নবী কারীম (স) বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَلَا اَغْنَاهُ اللّٰهُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহকে যথেষ্ট মনে করে না, আল্লাহ তাকে সচ্ছল করবেন না।[৩] (কূতুল কুলূব : ১ : ২১০)

আরেক হাদিসে এসেছে,

اِنَّ الْقُرْاٰنَ هُوَ الْغِنَى الَّذِىْ لَا غِنٰى بَعْدَهٗ وَلَا فَقْرَ مَعَهٗ.

নিশ্চয় কুরআন এমন সচ্ছলতা, যার পর আর কোনো সচ্ছলতা নেই। আর এর সঙ্গে কোনো দরিদ্রতা নেই। (মুসনাদে আবু ইয়ালা : ২৭৭৩; মুজামে কাবীর : ১ : ২৫৫)

অন্য এক হাদিসে নবী কারীম (স) বলেছেন,

مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَظَنَّ اَنَّ اَحَدًا اَغْنٰى مِنْهُ فَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ.

আল্লাহ তাআলা যাকে কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন, তথাপি সে অপরকে তার তুলনায় অধিক সচ্ছল মনে করে, সে আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ নিয়ে হাসি-তামাশা করল। (ইমাম বুখারী রচিত আত-তারীখুল কাবীর : ৩ : ২৬৫; কূতুল কুলূব : ১ : ২১০)

নবী কারীম (স) আরও বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ.

যে ব্যক্তি কুরআন পেয়েও সচ্ছলতা লাভ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (সহিহ বুখারী : ৭৫২৭)

---

৩ হাফেজ ইরাকী (র) বলেছেন, আমি এই শব্দে হাদিসটি পাইনি।

অন্যত্র তিনি বলেন,

كَفٰى بِالْيَقِيْنِ غِنًى.

সম্পদশালী হওয়ার জন্য ইয়াকীনই যথেষ্ট। (মুসনাদুশ শিহাব : ১৪১০; শুআবুল ঈমান : ১০০৭২)

এক বুযুর্গ বলেন, আল্লাহ তাআলা (আসমানি কিতাবে) বলেছেন, আমি আমার যে বান্দাকে এই তিনটি জিনিস থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিই তার ওপর আমার যাবতীয় নিয়ামত পূর্ণ করে দিই। (নিয়ামত তিনটি হলো) তার কোনো শাসকের প্রয়োজন পড়বে না। চিকিৎসকের দরকার হবে না। কারও সম্পদের প্রয়োজন হবে না। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১০)

একটি কবিতায় এই বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে,

اِذَا الْقُوْتُ تَأَتّٰى لَ * كَ وَالصِّحَّةُ وَالْأَمْنُ.

وَأَصْبَحْتَ أَخَا حُزْنٍ * فَلَا فَارَقَكَ الْحُزْنُ.

যদি তোমার খাদ্য জুটে এবং সুস্থতা ও নিরাপত্তা মিলে যায় তারপরও তুমি চিন্তিত থাকো তাহলে দুঃখ কখনোই তোমার পিছু ছাড়বে না।

এ কথাটিই বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সবচাইতে বিশুদ্ধভাষী নবী কারীম (স) বলেছেন,

مَنْ أَصْبَحَ اٰمِنًا فِيْ سِرْبِهٖ، مُعَافًى فِيْ بَدَنِهٖ، عِنْدَهٗ قُوْتُ يَوْمِهٖ فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا.

যে ব্যক্তি ঘরের মধ্যে নিরাপদ, তার শরীর সুস্থ এবং তার কাছে একদিন চলার মতো খাদ্য রয়েছে, সমস্ত দুনিয়াকে তার জন্য কেন্দ্রীভূত করে দেওয়া হয়েছে। (জামে তিরমিযী : ২৩৪৬; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৪১)

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, মানুষ এই তিনটি নিয়ামতের পরিবর্তে অন্য নিয়ামতের জন্য হা-হুতাশ করতে থাকে। অথচ এই নিয়ামত ভিন্ন অন্য সমস্ত নিয়ামত দুর্ভোগস্বরূপ হতে পারে। সবচেয়ে কষ্টের কথা, কেউ ঈমানের মতো মহা নিয়ামতের শোকর আদায় করে না, অথচ এই মহা নিয়ামতের বিনিময়ে চিরস্থায়ী মহা রাজত্ব জান্নাত মিলবে।

বরং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কেবল ইয়াকীন ও ঈমানের পচিয় লাভ করেই খুশি হতে পরে। আমরা তো এমন আলেমদের চিনি যাদের ধনসম্পদ সহচর এবং অনুসারী এমনকি যদি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বাদশাহী দিয়ে বলা হয়, আপনি এর পরিবর্তে আপনার সম্পূর্ণ ইলম কিংবা আপনার ইলমের এক দশমাংশ প্রদান করুন, তাহলে তিনি উক্ত বিনিময় গ্রহণ করবে না। কারণ তিনি আশা করেন যে, এই ইলমের মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করবেন। এমনকি তাকে যদি এ কথা বলা হয়, আখেরাতে আপনি যা পাওয়ার আশা করেন তা তো পাবেন। এই সমস্ত জিনিসের স্বাদ গ্রহণের বিনিময়ে দুনিয়াতে ইলম অর্জনের যে স্বাদ আপনি অনুভব করেন তা আমাদের প্রদান করুন। এতেও তিনি সম্মত হবেন না। কারণ তিনি জানেন, ইলমের স্বাদ স্থায়ী; কখনো শেষ হবার নয়। সবসময় সঙ্গে থাকে; কখনো চুরি করা বা ছিনিয়ে নেওয়া যায় না। এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব। এটা পঙ্কিলতাবিহীন এক সচ্ছ স্বাদ। দুনিয়ার অন্য সমস্ত স্বাদ অসম্পূর্ণ; ক্লেদাক্ত এবং অস্থিরতাযুক্ত। এর ভয় তার স্থিরতা অপেক্ষা বেশি। যে বস্তুর যন্ত্রণা তার স্বাদ থেকে বেশি। খুশির চেয়ে দুশ্চিন্তা বেশি। এ যাবত এমনটাই দেখা গেছে। এমন অবস্থাই চলবে চিরদিন। দুনিয়ার স্বাদ সৃষ্টির কারণ এটাই যাতে অসম্পূর্ণ বুদ্ধির অধিকারীরা এর জালে ফেঁসে যায় এবং এর ধোঁকায় নিপতিত হয়। ধোঁকা খেয়ে এর জালে আটকা পড়ামাত্রই তা দূরে সরে যাবে। যেমন বাহ্যিকভাবে রূপসী মহিলা সম্পদশালী নির্বোধ যুবকের জন্য সাজগোজ করে। যুবকের অন্তরকে মোহিত করে সে পালিয়ে বেড়ায়। যুবক তখন তার পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছুটতে থাকে। এসব কিছু হয় মাত্র এক মুহূর্তের চাহনির প্রতারণার কারণে। বুদ্ধি খাটিয়ে নজর হেফাজত করার মাধ্যমে যদি সেই স্বাদ তুচ্ছ মনে করতো, তাহলে গোটা জীবন নিরাপদ থাকত। এভাবেই দুনিয়াদাররা দুনিয়ার ফাঁদ ও জালের শিকার হয়।

এটা বলা ঠিক নয় যে, যারা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে যারা দুনিয়া অভিমুখী তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। কখনো কখনো দেখা যায়, তারা দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী কিন্তু দুনিয়া তাদের থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আবার কখনো দুনিয়ার নাগাল পেতে তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। কিন্তু এর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে তাকে

উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। দুনিয়া থেকে বিমুখ থাকার জন্য যে কষ্ট এবং পরিশ্রম করতে হয় এরপর সে আখেরাতে শান্তি ভোগ করবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ামুখী মানুষ আখেরাতে কষ্ট ভোগ করবে। সুতরাং যারা দুনিয়াবিমুখ তারা নিচের আয়াত পাঠ করে আত্মপ্রশান্তি অনুভব করতে পারেন।

إِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ.

যদি তোমরা কষ্ট পাও তবে তো তারাও তোমাদের মতই কষ্ট-যন্ত্রণায় ভোগে এবং আল্লাহর কাছে তোমরা যা আশা কর তারা তা আশা করে না। (সূরা নিসা : ১০৪)

মোটকথা, সকল মানুষের সামনে শোকরের পথ বন্ধ হওয়ার কারণ এটাই যে, তারা প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, বিশেষ ও ব্যাপক নিয়ামত সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। সে জন্য এ পর্যায়ে উদাসীন অন্তরসমূহের প্রতিকার আলোচনা করা হচ্ছে এই আশায় যে, হয়তো তারা অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হবে এবং শোকর আদায়ে সচেষ্ট হবে।

সতর্ক ও বিজ্ঞ অন্তরসমূহের প্রতিকার এই যে, ইঙ্গিতে আমরা ব্যাপক নিয়ামতের যেসব প্রকার আলোচনা করেছি, সেগুলো নিয়ে তারা গভীর চিন্তাভাবনা করবে।

আর যারা বিশেষ নিয়ামত ব্যতীত অন্য কিছুকে নিয়ামতই মনে করে না অথবা বিপদে পড়ে নিয়ামতকে উপলব্ধি করে, তাদের প্রতিকার এই যে, তারা নিজের চেয়ে কম সচ্ছল ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখবে। জনৈক সূফি যা করতেন, তা করবে।

তিনি প্রতিদিন একবার হাসপাতালে, একবার কবরস্থানে এবং একবার বধ্যভূমিতে যাতায়াত করতেন। হাসপাতালে গিয়ে মানুষকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত দেখে নিজের সুস্থতার কথা ভাবতেন যে, সুস্বাস্থ্য একটি বড় নিয়ামত। এ কথা ভেবে শোকর আদায় করতেন।

নিহত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারানো অপরাধীদের দেখে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতেন, একথা ভেবে যে, আল্লাহ তাকে এসব অপরাধ থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

কবরস্থানে গিয়ে চিন্তা করতেন যে, মৃত ব্যক্তিরা একদিনের জন্য হলেও দুনিয়াতে ফিরে আসাকে সর্বাধিক পছন্দ করে। গুনাহগার বিগত দিনের

ক্ষতিপূরণের জন্য, আর নেককার আরও বেশি নেকি অর্জনের জন্যে। কারণ, কেয়ামত হচ্ছে লাভ-লোকসানের দিবস। সুতরাং সে ভাববে, আমি বিগত দিনের কাফফারা এবং অধিক নেকি অর্জন করতে পারি। অতএব জীবনের বাকি দিনগুলো আমি এ পথে ব্যয় করবো। এ দিনগুলোকেই আমি আল্লাহ তাআলার নিয়ামত মনে করব। অতএব, উক্ত ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে, এই জীবন; বরং প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহর নিয়ামত, তখন সে শোকর আদায় করবে। এই জীবনকে সে পথেই পরিচালিত করবে যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ চিকিৎসায় আশা করা যায়, অমনোযোগী ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে শোকরে সচেষ্ট হবে।

হযরত রবী ইবনে খুসাইম (র) পরিপূর্ণ আধ্যাত্মের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই রীতির অনুসারী ছিলেন। তিনি তার ঘরে একটি কবর খনন করেছিলেন এবং গলায় বেড়ি পরে তিনি উক্ত কবরে শয়ন করতেন এবং বলতেন—

رَبِّ ارْجِعُوْنِ. لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি। (সূরা মুমিনুন : ৯৯-১০০)

এরপর তিনি দণ্ডয়মান হয়ে বলতেন, হে রবী! তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে। তুমি ওই সময়ের আগে কিছু করে নাও, যখন পুনরায় প্রেরণের আবেদন করবে কিন্তু তোমাকে প্রেরণ করা হবে না। (আনসাবুল আশরাফ : ১১ : ৩১১)

যেসব অন্তর শোকর থেকে উদাসীন, একথা জানাও তাদের এক প্রকার চিকিৎসা যে, যে নিয়ামতের শোকর আদায় করা হয় না, সে নিয়ামত বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তা পুনরায় পাওয়া যায় না। এ কারণেই হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায (র) বলেন, হে লোকেরা! তোমরা নিয়ামতসমূহের শোকর অবশ্যই করো। এটা দুর্লভ বিষয় যে, নিয়ামত একবার হারিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে এসেছে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২০৯)

এক মনীষী বলেন, নিয়ামতসমূহ বন্য পশুর মতো। এগুলোকে শোকরের মাধ্যমে আটক করে রাখো। (কূতুল কুলূব : ১ : ২০৯)

হাদিসে আছে, কারও প্রতি যখন আল্লাহ তাআলার নিয়ামত অধিক হয়, তখন তার প্রতি মানুষের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। যদি সে এসব প্রয়োজন পূরণে অমনোযোগী হয়, তাহলে সে যেন নিয়ামত হারিয়ে ফেলার চেষ্টা করল। (কূতুল কুলূব : ১/২০৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

নিশ্চয় আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (সূরা রাদ : ১১)

সবর ও শোকর যেখানে একত্র

উল্লিখিত আলোচনা পর্যালোচনা থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক জিনিসেই আল্লাহ তাআলার নিয়ামত বিদ্যমান। এতে বিপদের অস্তিত্ব না থাকাই জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু বিপদাপদ না থাকলে ধৈর্য কীসের ওপর হবে? আর বিপদ থাকলে শোকর হবে কীরূপে? কেননা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করার মধ্যে দুঃখ ও কষ্ট রয়েছে। আর শোকর হলো আনন্দজ্ঞাপক। অতএব, ধৈর্য ও শোকর পরস্পরবিরোধী। এ প্রশ্নের জবাব এই যে, নিয়ামত যেমন বিদ্যমান তেমনি বিপদও বিদ্যমান। বিপদ দূর হওয়াকে নিয়ামত এবং নিয়ামত দূর হওয়াকে বিপদ বলা হয়। অতএব, উভয়টির অস্তিত্ব থাকতে হবে।

ইতঃপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, নিয়ামত দু'প্রকার। একটি সর্বাবস্থায় নিয়ামত। যেমন, আল্লাহর নৈকট্যের সৌভাগ্য, ঈমান ও সচ্চরিত্র। দ্বিতীয় প্রকার যা একদিক থেকে নিয়ামত ও অপরদিক থেকে বিপদ। যেমন ধনসম্পদ। দীনি কল্যাণ লাভের দিক থেকে এটি নিয়ামত এবং দীনের ক্ষতি হলে এটি বিপদ। ঠিক এভাবে মুসিবতও দু'প্রকার। এক, যা সর্বদিক দিয়ে মুসিবত, যেমন— পরকালে আল্লাহ থেকে দূরে থাকা, দুনিয়াতে কুফর ও চরিত্রহীনতা। এগুলোর পরিণতি ভয়াবহ। দুই, যা একদিক থেকে মুসিবত ও অপরদিক থেকে মুসিবত নয়। যেমন ভয়ভীতি, দারিদ্র্য ও রোগাক্রান্ত হওয়া।

সুতরাং সর্বাবস্থায় যা নিয়ামত, তার জন্য সর্বাবস্থায় শোকর করতে হবে। যা দুনিয়াতে সর্বদিক দিয়ে মুসিবত, তার জন্য ধৈর্য ধারণ করার হুকুম করা হয়নি। যেমন, কুফরের জন্য ধৈর্য ধরার কোনো অর্থ হয় না। এমনিভাবে গুনাহের ক্ষেত্রেও; বরং কাফেরের জন্য কুফর বর্জন করা অপরিহার্য। এ থেকে বোঝা গেল যে, দুনিয়াতে যা সর্বদিক থেকে মুসিবত, তা ধৈর্য ধারণ করার উপযুক্ত নয়। সুতরাং, একই স্থানে ধৈর্য ও শোকর একত্রিত হতে পারে যদি সেটা একদিক থেকে মুসিবত কিন্তু অন্যদিক থেকে নিয়ামত হয়। যেমন, ধনাঢ্যতা নিয়ামত হলেও মাঝে মধ্যে এর কারণে ধনী ব্যক্তি ও তার সন্তানসন্ততিকে জীবন দিতে হয়। এমনিভাবে অন্যান্য জাগতিক নিয়ামতও নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য বিপদ হতে পারে এবং জাগতিক মুসিবতও মুসিবতে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য নিয়ামত হতে পারে। যেমন অনেক মানুষ অসচ্ছলতা ও রোগব্যাধিকেই পছন্দ করে। অতএব, এগুলো মুসিবত হলেও তাদের ক্ষেত্রে নিয়ামত। কারণ, ধনসম্পদ অধিক হলে এবং শরীর সুস্থ থাকলে মানুষ অবাধ্যতায় পা বাড়ায়। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ.

আল্লাহ তাঁর সব বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে নিশ্চয় তারা পৃথিবীতে তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হতো। (সূরা শুরা : ২৭)

আরও বলা হয়েছে—

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى. اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى.

বস্তুত মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে। কারণ, সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে। (সূরা আলাক : ৬-৭)

হাদিস শরিফে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَيَحْمِىْ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهٗ كَمَا يَحْمِىْ اَحَدُكُمْ مَرِيْضَهٗ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় মুমিন বান্দাকে জাগতিক বিলাসিতা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, যেভাবে রোগীকে মানুষ পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। (জামে তিরমিযী : ২০৩৬; মুসতাদরাকে হাকিম : ৪ : ৩০৯)

তেমনি জাগতিক নিয়ামতসমূহের মধ্যে স্ত্রী সন্তান ও আত্মীয়স্বজন এবং পূর্বে উল্লেখিত ষোল প্রকার নিয়ামতের অবস্থাও একই রকম। ঈমান ও উত্তম চরিত্র এর ব্যতিক্রম। এদুটি সবার ক্ষেত্রেই নিয়ামত। অন্য নিয়ামতের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা আছে, তা কারও ক্ষেত্রে মুসিবত হবে। তখন এর বিপরীত বস্তুটিই তার জন্য নিয়ামত। যেমন পূর্বে গিয়েছে, ইলম (জ্ঞান) একটি গুণ ও নিয়ামত। কিন্তু অনেক অবস্থায় এটাই দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে যায়। তখন এই মুর্খতাকেই নিয়ামত বলতে হয়। যেমন, মানুষ নিজের মৃত্যু সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। সকল জিনিসের জ্ঞান যদিও নিয়ামত, কিন্তু মৃত্যুর ব্যাপারে না জানাই নিয়ামত। কারণ, মৃত্যুর দিন ক্ষণ জানতে পারলে মানুষের জীবন বিস্বাদ হয়ে যাবে এবং তার দুশ্চিন্তা বেড়ে যাবে। এমনিভাবে নিজের সম্পর্কে এবং আত্মীয়স্বজনদের সম্পর্কে মানুষের অন্তরের বিশ্বাস না জানাটাও নিয়ামত। কেননা, এই বিশ্বাস জেনে গেলে কষ্ট পেতে হতো এবং হিংসাবিদ্বেষ সৃষ্টি হতো।

এমনিভাবে কারও মন্দ গুণাবলি না জানাও নিয়ামত। যদি সে তা জানতে পারতো তাহলে হিংসাবিদ্বেষ সৃষ্টি হতো এবং তাকে কষ্টের শিকার হতে হতো। তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে বিপদের কারণ হতো।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারও ভালো গুণাবলি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাও মানুষের জন্য নিয়ামত। কেননা, অনেক সময় মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই অন্যকে কষ্ট দেয়। সে ব্যক্তি যদি আল্লাহ তাআলার অলী হয়, তার সম্মান ও অবস্থান জেনে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে না জেনে কষ্ট দেওয়ার গুনাহ তুলনামূলক কম হবে। কারণ, নবী বা অলীকে জেনে কষ্ট দেওয়া আর না জেনে কষ্ট দেওয়া সমান নয়।

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনক্ষণ, শবে কদর ও জুমআর দিনের দুআ কবুলের বিশেষ মুহূর্তটি গোপন রেখেছেন। এটাও নিয়ামত। কারণ, এটা গোপন থাকার কারণে তালাশ করতে চেষ্টা ও সাধনা প্রচুর করতে হয়। ফলে, সওয়াবও বেশি হয়। অজ্ঞতার মাঝে যদি আল্লাহ তাআলার এতো নিয়ামত থাকে, জানার মাঝে কতো নিয়ামত থাকতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

প্রতিটি বস্তুতেই আল্লাহ তাআলার নিয়ামত রয়েছে

যেমনটি আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, প্রতিটি বস্তুতেই আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে। এটি প্রমাণিত সত্য এবং সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেউ এর ব্যতিক্রম নয়। তবে এতে আল্লাহ তাআলা কারও কারও জন্য যে কষ্ট রেখেছেন, তা ব্যতিক্রম। এটা তার জন্য নিয়ামত না হলেও অন্যের জন্য তা নিয়ামত। যেমন কেউ নিজের হাত কেটে ফেললো কিংবা চেহারায় ক্ষত সৃষ্টি করল। এর ফলে সে গুনাহগারও হবে, কষ্টও ভোগ করবে। তবে তার কষ্ট দেখে অন্যরা শিক্ষা নেবে। এ হিসেবে এ কষ্ট অন্যের জন্য নিয়ামত হলো। তেমনি কাফেরদের দোযখে শাস্তি দেওয়া হবে। এটা তার জন্য নিয়ামত না হলেও অন্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই নিয়ামত। এটা আল্লাহ তাআলার বিধান, তিনি এক জাতির মুসিবত দ্বারা অপর জাতিকে উপকৃত করেন। ধরে নিই, যদি আল্লাহ তাআলা আযাব সৃষ্টি না করতেন, কাউকে আযাব না দিতেন, নিয়ামত উপভোগকারীরা নিয়ামতের মূল্য বুঝতো না, নিয়ামত পেয়ে খুশি হতো না। জান্নাতিদের খুশি দ্বিগুণ হয়ে যায়, যখন তারা জাহান্নামিদের কষ্ট সম্পর্কে ভাবে। লক্ষ করুন! সূর্যের আলো পেয়ে আমরা খুব বেশি খুশি হই না। ভাবি এটা তো সবাই না চেয়েই পাচ্ছে। অথচ সূর্যের আলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তেমনি তারাভরা সুনীল আকাশ দেখে আমরা তেমন পুলকিত হই না। অথচ তা বছরের পর বছর পরিশ্রম করে সাজানো ফুলবাগান হতে শতগুণ সুন্দর ও নয়নাভিরাম। যেহেতু এটা বিনে পয়সায় এবং না চেয়েই সবাই উপভোগ করতে পারছে, তাই এর মূল্য কেউ অনুভব করছে না, এ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য দেখেও কেউ পুলকিত হচ্ছে না। আমরা বলেছিলাম, আল্লাহ তাআলা হিকমত ছাড়া কিছুই সৃষ্টি করেননি এবং এমন কিছুই সৃষ্টি করেননি, যাতে নিয়ামত নেই। সে নিয়ামত সবার জন্য ব্যাপকও হতে পারে, আবার এমনও হতে পারে, তা কারও জন্য নিয়ামত, কারও জন্য নয়। এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট বিপদ ও মুসিবতও নিয়ামত; বিপদগ্রস্তের জন্য, কিংবা অন্য কারও জন্য।

সুতরাং, যে অবস্থাকে সর্বদিক থেকে মুসিবত এবং সকল অবস্থায় নিয়ামত বলা যায় না, তাতে ধৈর্য ও শোকর উভয়টি করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, ধৈর্য ও শোকর তো পরস্পর বিপরীত। এগুলো কীভাবে একত্র

হবে? এর উত্তর হচ্ছে, মানুষ একই কারণে কখনো দুঃখিত হয় এবং কখনো খুশি হয়। সুতরাং দুঃখের জন্য ধৈর্য ধারণ করবে এবং আনন্দের জন্য শোকর করবে। দুনিয়াবি বিপদ ও রোগব্যাধি এবং দারিদ্র্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাঁচটি কারণে বুদ্ধিমান লোকের উচিত হলো এগুলোতে খুশি হওয়া ও শোকর করা।

এক. মনে রাখতে হবে, মারাত্মক যে মুসিবত ও রোগব্যাধি এখন রয়েছে, এরচেয়েও মারাত্মক কোনো রোগ ও বিপদ হতে পারে। যদি আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে এই রোগ ও বিপদকে দ্বিগুণ করে দেন, তাহলে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই? সুতরাং প্রতিটি রোগ ও বিপদে মানুষের শোকর করা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা এর চেয়ে বড় অসুখ ও মুসিবত তাকে দেননি।

দুই. দুনিয়াবি বিষয়ে বিপদ এসেছে দীনদারীতে নয়, এজন্য শোকর করতে হবে।

এক ব্যক্তি হযরত সাহল তস্তরী (র)-এর নিকট অভিযোগ করল, আমার ঘরে এক চোর ঢুকে সবকিছু নিয়ে গেছে। তিনি বললেন, আল্লাহর শোকর কর যে, শয়তান তোমার অন্তরে ঢুকে তোমার ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়নি। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা : ৩১৩)

একারণেই হযরত ঈসা (আ) এই বলে দুআ করতেন যে,

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتِيْ فِيْ دِيْنِيْ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার মুসিবত আমার দীনদারীতে দিবেন না। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ১১ : ৩৮; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩৫৭৭; শুআবুল ঈমান : ২৩৭)

আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ইরশাদ করেন, আমার উপর এমন কোনো মুসিবত আসেনি, যাতে আল্লাহ তাআলা আমাকে চারটি নিয়ামত দান করেননি; ১. এ মুসিবত আমার দীনের ক্ষেত্রে হয়নি। ২. আল্লাহ তাআলা চাইলে এর চেয়ে বড় কোনো মুসিবত দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। ৩. সে মুসিবতের ওপর সন্তুষ্ট থাকার নিয়ামত হতে আমাকে বঞ্চিত করেননি এবং ৪. এ থেকে আমি সওয়াবের আশা রাখি। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১১)

এক বুযুর্গের এক বন্ধু ছিলো। একদিন কোনো কারণে বাদশাহ তাকে বন্দি করলে সে তার বুযুর্গ বন্ধুকে বন্দিত্বের সংবাদ জানাল। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করো। এরপর বাদশাহ তাকে বেত্রাঘাত করলে সে বুযুর্গকে তা জানালো ও অভিযোগ করলো। তিনি আবার উত্তর দিলেন, আল্লাহর শোকর করো। একদিন এক অগ্নিপূজককে বন্দি করে তার সাথে একই শিকলে বেঁধে রাখা হলো। সে বুযুর্গকে এ অবস্থাও অবহিত করলো। তিনি যথারীতি উত্তর দিলেন, আল্লাহর শোকর করো। ঘটনাক্রমে অগ্নিপূজক বন্দির পেটের পীড়া ছিলো। সে বারবার পায়খানায় যেতো। একই শিকলে বাঁধা থাকায় বুযুর্গের বন্ধুকেও তার সাথে যেতে হতো এবং দাঁড়িয়ে তার প্রয়োজন সারা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। লোকটি বুযুর্গকে একথাও জানিয়ে অভিযোগ করলো। তিনি আবার বললেন, আল্লাহর শোকর করো। এবার লোকটি চটে গিয়ে বলল, আর কতো সহ্য করবো? এর চেয়ে বড় আপদ আর কী হতে পারে? এবার বুযুর্গ বললেন, ভেবে দেখো, অগ্নিপূজকের কোমরে যে ফিতা আছে, যদি তোমার কোমরেও থাকতো, তোমার কী হাল হতো? (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা : ৩১৩)

এ থেকে বোঝা গেল, কারও উপর যদি কোনো মুসিবত আসে, তার চিন্তা করা উচিত, আমার কোন বদআমলের কারণে এ মুসিবত এসেছে? ভালোভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, তার বদআমলের তুলনায় এ মুসিবত খুবই সামান্য। কেউ যদি একশ বেত্রাঘাতের অপরাধ করে, তাকে মাত্র দশটি বেত্রাঘাত করা হয়, কিংবা কেউ দুহাত কেটে ফেলার অপরাধ করে, তার কেবল এক হাত কাটা হয়, এমতাবস্থায় অবশ্যই আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা উচিত।

এক বুযুর্গ গলিপথে হাঁটছিলেন। উপর থেকে কেউ ছাইয়ের ঝুড়ি তার উপর ছেড়ে দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে শোকরের সিজদা করলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এহেন অবস্থায় সিজদা কেন? তিনি বললেন, আমি নিজের উপর আগুন পতিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু শুধু ছাই পড়েছে। এটা তো আমার জন্য নিয়ামত।[৪]

---

৪ এ বুযুর্গের নাম আবু ওসমান। দেখুন— আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা : ৪১৪।

কেউ এক বুযুর্গকে বলল, বৃষ্টি হচ্ছে না, চলুন, ইসতেসকার নামায পড়ে আসি। তিনি উত্তর দিলেন, তোমরা ভাবছো, বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্ব হচ্ছে। আমি ভাবছি পাথর বর্ষণে বিলম্ব হচ্ছে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ২ : ৩৭৩)

প্রশ্ন হলো, বিপদে আমরা আনন্দিত হব কীভাবে, অথচ দেখা যায়, কোনো কোনো ব্যক্তি আমাদের চেয়ে অধিক গুনাহ করে। কিন্তু তাদের ওপর আমাদের মতো বিপদ আসে না। এমনকি কাফেররাও আমাদের মতো বিপদে পড়ে না। এর উত্তর হলো, কাফেরের ওপর অনেক বেশি বিপদ আসবে। দুনিয়াতে তাকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, যেন সে অনেক গুনাহ করে নেয় এবং শাস্তি দীর্ঘ হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمًا.

বরং আমি সুযোগ দিয়ে থাকি, যাতে তারা গুনাহ বাড়িয়ে নেয়। (সূরা আলে ইমরান : ১৭৮)

হ্যাঁ, এখন কথা হলো, কোনো ব্যক্তি আমাদের চেয়েও বেশি গুনাহগার, তা কী করে বোঝা গেল ? আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে অনেকের অন্তরের স্পর্ধা এত ভয়ানক থাকে যে, এর সামনে মদ পান ও ব্যভিচার কিছুই নয়। এরূপ গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ.

তোমরা এটাকে তুচ্ছ মনে করেছিলে; যদিও আল্লাহর নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয়। (সূরা নূর : ১৫)

বাহ্যিকভাবে যদি কারও গুনাহ বেশিও হয়, তাহলে এটা ঠিক যে, তার শাস্তি পরকালে বেশি হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিপদে রয়েছে, তার তো শোকর করা প্রয়োজন যে, তাকে পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

তিন. যার শাস্তি হয়ে যায়, তাকে পরকালে পুনরায় আযাব দেওয়া হবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَأَصَابَتْهُ شِدَّةٌ أَوْ بَلَاءٌ فِي الدُّنْيَا فَاللّٰهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعَذِّبَهُ ثَانِيًا.

যখন কেউ গুনাহ করে এবং দুনিয়াতে তার ওপর কোনো মুসিবত নেমে আসে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে পুনরায় আযাব দেওয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে যান। (জামে তিরমিযী : ২৬২৬)

চার. বিপদটি তার উপর সংঘটিত হওয়ার কথা লওহে মাহফুযে লেখা ছিল। এটা সংঘটিত হওয়া আবশ্যক ছিল। এখন যেহেতু কম মাত্রায় কিংবা সবটুকু ঘটে গেল, তখন এটাই নিয়ামত।

পাঁচ. বিপদের সওয়াব বিপদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে। কেননা, দুনিয়ার বিপদ দু'কারণে পরকাল লাভের পথ।

১. যে কারণে তিক্ত ওষুধ রোগীর জন্য নিয়ামত।

এবং বাচ্চাকে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখা তার জন্য নিয়ামত। কেননা, বাচ্চাকে যদি তার খেলাধুলার স্বভাবের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সে তাতেই সর্বদা থাকে তাহলে সে লেখাপড়া, আদব-কায়দা কীভাবে শিখবে। বরং তার জীবনটা নষ্ট হবে।

ঠিক তেমনি অর্থসম্পদ, পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদি মানুষের খুব প্রিয়। কিন্তু কখনো কখনো এগুলোও তার ধ্বংসের কারণ হয়; বরং মানুষের বিবেক, যা সবচেয়ে অমূল্য ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু, এর কারণেও সে কখনো ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। কিয়ামতের দিন নাস্তিকরা বলবে, হায়! আমরা যদি বিবেক-বুদ্ধিহীন পাগল কিংবা শিশু হতাম। তাহলে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে উলটাপালটা বুদ্ধি খাটাতে পারতাম না। এসকল বস্তুতে বান্দার জন্য কোনো না কোনো দীনি উপকার রয়েছে। তাই তার উচিত আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সুধারণা রাখা। একথা মনে করা, আল্লাহ তাআলা এতেই আমার কল্যাণ রেখেছেন। এর জন্য তাঁর শোকর আদায় করা। কেননা, আল্লাহ তাআলার হিকমত সুবিস্তৃত ও ব্যাপক। বান্দার কল্যাণ সম্পর্কে তিনি বান্দার চেয়ে অধিক জ্ঞাত।

সুতরাং কিয়ামতের দিন যখন বান্দা দেখবে, বিপদের কারণে সওয়াব পাওয়া যায়, তখন সে এই নিয়ামতের শোকর করবে। যেমন শিশুরা বয়প্রাপ্ত এবং বুদ্ধিমান হওয়ার পর পিতা ও শিক্ষকের বেত্রাঘাতের শোকর আদায় করে। কারণ, তারা পরবর্তীতে শাসনের মর্ম বুঝতে পারে।

বর্ণিত আছে, এক সাহাবি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার উপর যে ফয়সালা করেছেন, সে ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করো না। (মুসনাদে আহমদ : ৪ : ২০৪; শুআবুল ঈমান : ৯২৬৩; কূতুল কুলূব : ১ : ২১৭)

একদিন আসমানের দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (স) হাসতে লাগলেন। সাহাবায়ে কেরাম কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, মুমিনদের জন্য আল্লাহ তাআলার ফয়সালা দেখে অবাক হই। যদি তাদের জন্য সচ্ছলতার ফয়সালা করেন এবং তারা এতে সন্তুষ্ট থাকে, এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি অভাবের ফয়সালা করেন এবং তারা সন্তুষ্ট থাকে, এটাও তাদের জন্য মঙ্গলজনক। (সহিহ মুসলিম : ২৯৯৯; কূতুল কুলূব : ১ : ২১৭; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন : ৯ : ১৪১)

২. সকল পাপের মূল হচ্ছে দুনিয়ার ভালোবাসা। পক্ষান্তরে মুক্তির মূল হচ্ছে দুনিয়া থেকে অন্তরের বিচ্ছিন্নতা। বলার অপেক্ষা রাখে না, যদি দুনিয়াবি উদ্দেশ্য মোতাবেক নিয়ামতসমূহ মুসিবত ব্যতীতই পাওয়া যায়, তাহলে এতে দুনিয়ার প্রতি অন্তরের টান আরও বৃদ্ধি পায়। এমনকি, মানুষের জন্য দুনিয়া জান্নাতের ন্যায় হয়ে যায়। আর যদি বিপদ আসতে থাকে, তাহলে দুনিয়ার প্রতি অন্তরে ঘৃণা জন্মে। বরং দুনিয়া জেলখানার মতো মনে হয়। সেজন্যই হাদিসে বলা হয়েছে,

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ.

দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত। (মুসলিম : ২৯৫৬)

কাফের ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলা থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু দুনিয়াবি জীবনই আশা করে। আর মুমিন বলা হয়, যে আন্তরিকভাবে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী এবং এখান থেকে পালাতে আগ্রহী।

কুফরি প্রকাশ্যও হয়, গোপনও হয়। অন্তরে যে পরিমাণ দুনিয়ার ভালোবাসা থাকে, সে পরিমাণ গোপন শিরিকও থাকে। একনিষ্ঠ একত্ববাদী সে-ই, যে কেবল এক আল্লাহকে ভালোবাসে। উল্লিখিত কারণে বিপদেও সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বিপদে উদ্বিগ্ন হওয়া তো স্বভাবজাত বিষয়। যেমন, কোনো অসুস্থ ব্যক্তির হিজামা করা তথা শিঙা লাগানোর প্রয়োজন দেখা দিলে কেউ তা বিনামূল্যে করে দিলো, কিংবা ওষুধের প্রয়োজন হলে

কোনো ডাক্তার তাকে বিনামূল্যে কড়া স্বাদের তিতা ওষুধ খাইয়ে দিলো, তাহলে কষ্ট হলেও সে খুশি হবে এবং কষ্ট সহ্য করবে। হিজামাকারী ও ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানাবে। দীনের ক্ষেত্রে যত কষ্ট-মুসিবত আসে, তার উদাহরণ কড়া স্বাদের তিতা ওষুধের ন্যায়। যদিও এখন খেতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু পরবর্তীতে এর সুফল পাওয়া যাবে।

দুনিয়াপ্রেমীর উদাহরণ

দুনিয়াপ্রেমীর উদাহরণ হলো, যেমন কোনো ব্যক্তি ঘুরে দেখার জন্য কোনো শাহী মহলে ঢুকলো। সেখানে কোনো সুন্দরী মহিলার প্রেমে পড়ে গেলো, যে কখনো মহল ছেড়ে তার সাথে বেরিয়ে আসতে পারবে না। ওই ব্যক্তিরও মহলে থেকে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বাদশাহ জানতে পারলে তার ওপর ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবে। এমতাবস্থায় খুব কষ্ট হলেও মহল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াতেই তার জন্য কল্যাণ রয়েছে। এ কষ্টই তার জন্য নিয়ামতস্বরূপ।

এ দুনিয়াও সাময়িক ঠিকানা। মানুষ এখানে মাতৃগর্ভের পথে ঢুকে, কবরের পথে বেরিয়ে যায়। যে ব্যক্তি এ অস্থায়ী ঠিকানার ভালোবাসায় জড়াবে, বিপদে পড়বে। যে এর ভালোবাসায় নিজেকে জড়াবে না, দূরত্ব বজায় রাখবে, এ দূরত্বই তার জন্য নিয়ামত হবে। যে ব্যক্তি এ বিষয়টি বুঝে, সে বিপদেও শোকর করবে। আর যে এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে, তার পক্ষে শোকর করা সম্ভব নয়।

কেননা, নিয়ামত সম্পর্কে জানার পরই শোকার আদায় সম্ভব। নতুবা যে ব্যক্তি জানে না, মুসিবতের সওয়াবের তুলনায় এর কষ্ট খুবই নগণ্য, মুসিবতের সময় তার থেকে শোকরের কল্পনাই করা যায় না।

বর্ণিত আছে, আব্বাস (রা)-এর ইনতেকালের পর এক বেদুইন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে সমবেদনা জানাতে গিয়ে বলেছিলো,

اِصْبِرْ نَكُنْ بِكَ صَابِرِيْنَ فَإِنَّمَا * صَبْرُ الرَّعِيَّةِ بَعْدَ صَبْرِ الرَّأْسِ.

خَيْرٌ مِنَ الْعَبَّاسِ أَجْرُكَ بَعْدَهُ * وَاللّٰهُ خَيْرٌ مِّنْكَ لِلْعَبَّاسِ.

অর্থাৎ, ধৈর্য ধরুন! আপনাকে দেখে আমরাও ধৈর্য ধারণ করবো। কেননা, সাধারণ প্রজার ধৈর্যধারণ নেতার পর হয়ে থাকে। আব্বাস (রা)-এর

ইনতেকালের পর আপনার ধৈর্যের সওয়াব আব্বাস (রা)-এর চেয়ে উত্তম এবং আব্বাস (রা)-এর জন্য আপনার চেয়ে আল্লাহ তাআলা উত্তম। (আত-তাযকিরাতুল হামদুনিয়া : ৪ : ২৪৭)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমাকে কেউ তার চেয়ে উত্তম সমবেদনা জানায়নি। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১১)

মুসিবতেও ধৈর্য ধারণ করা সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত রয়েছে। এক হাদিসে আছে,

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّصِبْ مِنْهُ.

আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন, সে মুসিবতে পতিত হয়। (সহিহ বুখারী : ৫৬৪৫)

হাদিসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন আমি আমার বান্দার শরীরের, ধনসম্পদের অথবা সন্তানসন্ততির ওপর বিপদ দিই। তখন সে যদি 'সবরে জামীল' উত্তম ধৈর্য ধারণ করে, তবে কিয়ামতের দিন তার জন্য মিযানের পাল্লা স্থাপন করতে ও তার আমলনামা খুলতে আমি লজ্জাবোধ করি। (নাওয়াদিরুল উসূল : ২২২; আল কামিল : ৭ : ১৫০; মুসনাদুশ শিহাব : ১৪৬২)

এক হাদিসে বলা হয়েছে, কোনো বান্দা যখন বিপদে পতিত হয় আর সে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে এই দুআ পড়ে—

اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاَعْقِبْنِيْ خَيْرًا مِّنْهَا.

(অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুসিবতের পুরস্কার দিন এবং এর পরে আমাকে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু দান করুন।) তখন আল্লাহ তাআলা তা-ই করেন। (সহিহ মুসলিম : ৯১৮)

এক হাদিসে আছে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি যার দুচোখের জ্যোতি কেড়ে নিয়েছি, আমার পক্ষ থেকে তার প্রতিদান হলো, সে চিরদিন আমার ঘর জান্নাতে থাকবে এবং আমার দীদার লাভে ধন্য হবে। (আল-মুজামুল আওসাত : ৮৮৫০; সহিহ বুখারী : ৫৬৫৩)

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ধনসম্পদ বরবাদ হয়ে গেছে এবং আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তিনি বললেন, যে বান্দার সম্পদ বরবাদ হয় না এবং রোগব্যাধি হয় না, তার মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে নিজের করে নেন, তখন তাকে বিপদে ফেলেন এবং যখন মুসিবতে ফেলেন, তখন ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান করেন। (সহিহ মুসলিম : ৯১৮)

হাদিস শরিফে ইরশাদ করা হয়েছে— মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট এমন একটি মর্যাদা থাকে, আমলের দ্বারা যেখানে সে পৌঁছতে পারে না। তাই আল্লাহ তাআলা তার শরীরের উপর কোনো মুসিবত প্রেরণ করেন। যার কারণে সে সেই মর্যাদা লাভ করে। (সহিহ ইবনে হিব্বান : ২৯০৮; মুস্তাদরাকে হাকেম : ১ : ৩৪৪)

খাব্বাব ইবনে আরাত (রা) রেওয়ায়েত করেন— একদা আমি যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম, রাসূলুল্লাহ (স) তখন চাদর বিছিয়ে কাবা ঘরের ছায়াতে বসে ছিলেন। আমি অভিযোগের ভঙ্গিতে তাঁকে বললাম, আপনি আল্লাহ তাআলার নিকট আমাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে দুআ করেন না কেন ? কাফেররা আমাদের উপর অমানুষিক জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। একথা শুনে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে কোনো কোনো ঈমানদারকে মাটি খনন করে কবর দেওয়া হতো এবং করাত দিয়ে তাদের মাথা চিরে দেওয়া হতো। কিন্তু তারপরও তারা তাদের দীন ত্যাগ করতো না। (সহিহ বুখারী : ৩৬১২)

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তিকে বাদশাহ অন্যায়ভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করে, এরপর সেখানেই সে মারা যায়, সে শহিদ। আর যদি প্রহার করার ফলে সে মারা যায়, তবুও সে শহিদ।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলার সম্মান ও মর্যাদার দাবি হলো, তুমি তাঁর কাছে তোমার ব্যথা বেদনার অভিযোগ করবে না এবং তোমার কোনো কষ্ট বা মুসিবতের আলোচনাও তাঁর কাছে করবে না।[৫]

---

৫ হাফেয ইরাকী (র) বলেন, "আমি এ রেওয়ায়াতের কোনো মারফূ সূত্র পাইনি। তবে 'আল-মারাযু ওয়াল কাফফারাত' (২২৩)-এ ইবনে আবিদ দুনয়া জনৈক ফকিহ হতে সুফিয়ানের এ রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।" দেখুন-আল ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন : ৯ : ২৯।

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী কারীম (স) ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার মঙ্গল চান এবং তাকে বন্ধু বানাতে চান, তখন তার উপর বিপদ ঢেলে দেন এবং বৃষ্টির ন্যায় বিপর্যয় নাযিল করেন। যখন সেই বান্দা আল্লাহকে ডাকে, তখন ফেরেশতা বলে, এই কণ্ঠস্বর চেনা চেনা মনে হচ্ছে। যখন আবার ডাকে এবং 'হে প্রভু' বলে, তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— বান্দা! কী বলতে চাও, বলো। আমি তোমার কাছেই আছি। তুমি যা চাইবে তা-ই দেব। যদি দুনিয়াতে কোনো উৎকৃষ্ট বস্তু তোমার নিকট থেকে সরিয়ে দিই, তাহলে তোমার জন্য তদপেক্ষা উত্তম বস্তু আমার নিকট রেখে দিই। যখন কিয়ামত হবে, তখন আমলকারীরা উপস্থিত হবে। তাদের নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি আমল দাঁড়িপাল্লায় মাপা হবে এবং পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। কিন্তু যখন বিপদগ্রস্ত হওয়া ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তখন তার জন্য দাঁড়িপাল্লাও স্থাপন করা হবে না এবং আমলনামাও উন্মুক্ত করা হবে না। তাদের উপর সওয়াব এমনভাবে ঢেলে দেওয়া হবে, যেমন বিপদ ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। তখন দুনিয়াতে যারা বিপদমুক্ত ছিল, তারা কামনা করবে— কতইনা ভালো হতো যদি আমাদের শরীরও কাঁচি দিয়ে কাটা হতো এবং বিপদগ্রস্তদের অনুরূপ সওয়াব আমরাও পেতাম। এ জন্যেই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

ধৈর্যশীলদের (পরকালে) অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। (সূরা যুমার : ১০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, কোনো এক নবী আল্লাহ তাআলার দরবারে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করলেন— হে প্রভু! মুমিন বান্দা আপনার আনুগত্য করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, কিন্তু আপনি দুনিয়াকে তার নিকট থেকে সরিয়ে রাখেন এবং বিপদ নাযিল করেন। অপরদিকে কাফের আপনার নাফরমানি করে এবং গুনাহের ধৃষ্টতা দেখায়, অথচ আপনি তার নিকট থেকে মুসিবত দূরে রাখেন এবং দুনিয়ার সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন। এমন হয় কেন? আল্লাহ তাআলা নবীর কাছে ওহি পাঠালেন, বান্দা আমার, বিপদও আমার। সকলেই আমার প্রশংসা করে। মূল ব্যাপার হলো, মুমিন বান্দার গুনাহ হয়ে যায়। তাই তার নিকট

থেকে দুনিয়াকে দূরে রাখি এবং মুসিবত পাঠাই, যাতে পাপের কাফফারা হয়ে যায়। সে যখন আমার নিকট আসবে, তখন আমি তার নেক কর্মের প্রতিদান দেব। অপরদিকে কাফেরের কিছু সওয়াব থাকে। তাই আমি তাকে প্রচুর রিযিক দান করি এবং মুসিবতকে দূরে রাখি, যার ফলে সে তার সওয়াবের প্রতিদান দুনিয়াতে পেয়ে যায় এবং যখন সে আমার নিকট আসে, তখন পাপ কাজের শাস্তি দিই। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ১২৩)

বর্ণিত আছে, যখন مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ (কেউ মন্দ আচরণ করলে তার প্রতিফল সে পাবে। [সূরা নিসা : ১২৩]) আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আয়াতের পর আনন্দ কী করে হবে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আবু বকর! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, তুমি কি অসুস্থ হও না, তুমি কি কোনো কষ্ট পাও না, যে কারণে দুঃখিত হও? এটাই তোমার মন্দ কাজের প্রতিদান। অর্থাৎ মানুষ যে কষ্টে পতিত হয় এটাই তার গুনাহের কাফফারা হয়। (মুসনাদে আহমদ : ১ : ১১; ইবনে হিব্বান : ২৯১০)

হযরত উকবা ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যখন তুমি কাউকে দেখ, আল্লাহ তাআলা তার সকল আশাই পূরণ করে যাচ্ছেন এবং সে নিজের পাপে অটল রয়েছে, তখন জেনে নিও, এটা তাকে সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) এই আয়াত পাঠ করলেন,

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ.

তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হলো, তখন আমি তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার খুলে দিলাম। অবশেষে তাদের যা দেওয়া হয়েছিল যখন তারা তাতে উল্লসিত হলো, তখন অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম, ফলে তারা নিরাশ হলো। (সূরা আনআম : ৪৪) (মুসনাদে আহমদ : ৪ : ১৪৫; মুজামে আওসাত : ৯২৬৮)

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, কোনো এক সাহাবি পথে জাহেলি যুগের পরিচিতা এক মহিলাকে দেখলেন। তিনি তার সাথে কিছু কথাবার্তা বলে

চলে গেলেন। কিন্তু চলতে চলতে পেছন ফিরে মহিলার দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি একটি দেয়ালের সাথে সজোরে ধাক্কা খেলেন। ফলে, তার চেহারা আঘাতপ্রাপ্ত হলো। অতঃপর রাসূলে কারীম (স)-এর দরবারে হাজির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন,

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ عُقُوْبَةَ ذَنْبِهِ فِي الدُّنْيَا.

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে গুনাহের শাস্তি পৃথিবীতেই দিয়ে দেন। (মুসনাদে আহমদ : ৪ : ৮৭)

হযরত আলী (রা) বলেন, আমি তোমাদেরকে কুরআন মাজীদের এমন একটি আয়াত শোনাচ্ছি, যা সকল আয়াতের চেয়ে অধিক আশাব্যঞ্জক। লোকেরা আরজ করল, বলুন। যখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

وَ مَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ.

তোমাদের ওপর যেসব বিপদাপদ আসে, সবই তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং তিনি তোমাদের বহু গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (সূরা শুরা : ৩০)

মোটকথা, পার্থিব বিপদাপদ গুনাহের কারণেই হয়ে থাকে। যখন আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়ে দেন, তখন পুনরায় শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন তাঁর নেই। আর যদি দুনিয়াতে ক্ষমা করে দেন, তবে তাঁর দয়া চায় না যে, কিয়ামতে শাস্তি দেওয়া হোক। (মুস্তাদরাকে হাকিম : ৪ : ৩৮৮; মুসনাদে আহমদ : ১ : ৮৫)

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী কারীম (স) বলেন, বান্দার দুটি ঢোক আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়— এক, ক্রোধের ঢোক, যা সহনশীলতার কারণে বান্দা গিলে ফেলে। দুই, বিপদের ঢোক, যা ধৈর্যের কারণে গিলে ফেলে। বান্দার দুটি বিন্দুও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়— এক, রক্তবিন্দু, যা তাঁর রাহে জিহাদে প্রবাহিত হয়। দুই, অশ্রুবিন্দু, যা আঁধার রাতে বান্দার চোখ থেকে সিজদাবস্থায় পতিত হয়। আল্লাহ ব্যতীত কেউ তাকে দেখে না। বান্দার দুটি পদক্ষেপও আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয়। এক, ফরয নামাযের জন্য পা বাড়ানো এবং দুই, আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ানো। (আল-ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন : ৯ : ১৪৫)

হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত সোলাইমান (আ)-এর এক ছেলের ইন্তিকালে তিনি খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এসময় তাঁর নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে হাঁটু গেড়ে বসে গেল। যেন তারা বাদী ও বিবাদী। তাদের একজন বলল, আমি শস্যখেত করেছিলাম। যখন শস্য হয়ে গেল, তখন এই ব্যক্তি জমিটি নষ্ট করে দিয়েছে। হযরত সুলাইমান (আ) দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বক্তব্য কী? সে বলল, আমি রাস্তা ধরে যেতে যেতে এক খেতের কাছে পৌঁছলাম। ডানে-বামে লক্ষ করে দেখলাম রাস্তা খেতের মধ্যেই ছিল। (তারপর আমি সেখান দিয়েই গিয়েছি।) হযরত সোলাইমান (আ) বললেন, তুমি রাস্তার উপর বীজ বপন করলে কেন? তোমার কি জানা নেই, মানুষের চলাচলের জন্য রাস্তা অবশ্যই প্রয়োজন? সে বলল, তাহলে আপনি ছেলের জন্য এত ব্যথিত কেন? আপনি কি জানেন না, মৃত্যু হচ্ছে পরকালের পথ? এরপর হযরত সুলাইমান (আ) তাওবা করলেন এবং ছেলের জন্য আর অনুতাপ করলেন না। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩৫৪১৩)

বর্ণিত আছে, ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তার এক অসুস্থ পুত্রের কাছে গেলেন এবং বললেন, বৎস! আমি তোমার আমলের পাল্লায় হওয়ার চেয়ে তুমি আমার আমলের পাল্লায় হবে এটা আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়। পুত্র উত্তর দিলো, আমার পছন্দের তুলনায় আপনার পছন্দই আমার কাছে বেশি প্রিয়। (আল-মুহতাযারীন : ১৫৫; আল মুজালাসাহ ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ৩৮১)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে তাঁর এক কন্যার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হলে তিনি 'ইন্না নিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ে বললেন, আল্লাহ এক আবৃত বস্তু (নারী)-কে আরও আবৃত করে দিলেন। (অর্থাৎ, কবরে শায়িত করে দিলেন।) কষ্ট দূর করলেন এবং সওয়াব দান করলেন। এরপর তিনি দুরাকাত নামায আদায় করে বললেন, এক্ষেত্রে আল্লাহ যে আদেশ করেছেন, আমি তা পালন করেছি, আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন,

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ.

তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। (সূরা বাকারা : ৪৫)

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)-এর এক পুত্রের ইনতেকাল হলে এক অগ্নিপূজক সমবেদনা জানাতে গিয়ে বলল, বুদ্ধিমানের জন্য আজ তা করা উচিত, নির্বোধ পাঁচদিন পর যা করবে। (অর্থাৎ কেউ চাক বা না চাক, মৃত্যুর ওপর ধৈর্য ধারণ করতেই হবে। আজ না হোক কাল প্রিয়জনের মৃত্যু মেনে নিতেই হবে। তার চেয়ে বরং আজই মেনে নেওয়া ভালো।) আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) বললেন, সে যথার্থই বলেছে। তার কথাটি লিখে রাখো। (মুহাযারাতুল উদাবা : ৪ : ৩৩৮)

এক আলেম বলেন, আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর একের পর এক মুসিবত দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে জমিনে সে এমন অবস্থায় চলাফেরা করে, তার আর কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। (মুসতাদরাকে হাকিম : ১ : ৩৪৭; আল-মুজামুল কাবীর : ২ : ১২৯)

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (র) বলেন, মানুষ যেমন তার পরিবার পরিজনের কল্যাণের দেখাশোনা করে, আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দার মুসিবতের দেখাশোনা করেন। (যা বান্দার উন্নতি ও সফলতায় রূপ নেয়।) (শুআবুল ঈমান : ৯৬৪৮)

হাতেম আল-আসাম্ম (র) বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা চার ব্যক্তিকে চার শ্রেণির বিপক্ষে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করবেন; ১. সুলায়মান (আ)-কে ধনীদের বিপক্ষে। ২. ঈসা (আ)-কে গরিবদের বিপক্ষে। ৩. ইউসুফ (আ)-কে ক্রীতদাসদের বিপক্ষে এবং ৪. আইয়ূব (আ)-কে অসুস্থদের বিপক্ষে।

বর্ণিত আছে, যাকারিয়া (আ) বনি ইসরাঈলের কাফেরদের থেকে পালিয়ে গাছের ভেতর আত্মগোপন করলে তারা তা টের পেয়ে যায়। তারা করাত এনে গাছ ফাড়তে থাকে। করাত যখন যাকারিয়া (আ)-এর মাথার কাছে পৌঁছে, তাঁর মুখ দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহি আসে— হে যাকারিয়া! দ্বিতীয়বার আওয়াজ হলে নবীদের তালিকা থেকে তোমার নাম মুছে দেওয়া হবে। এরপর যাকারিয়া (আ) দাঁত কামড়ে সহ্য করলেন। এমনকি তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হলো। (আল মুজালাসাহ ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ১৫)

হযরত মাসউদ বালখী (র) বলেন, বিপদ এলে যে ব্যক্তি হা-হুতাশ করে, পরিধেয় কাপড় ছিঁড়ে ফেলে অথবা বুকে আঘাত করে, সে যেন বল্লম দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়। (মুহাযারাতুল উদাবা : ৪ : ৩৫৭)

হযরত লুকমান (আ) তাঁর পুত্রকে বলেন, হে পুত্র! আগুন দিয়ে স্বর্ণ যাচাই করা হয়। আর ঈমানদার বান্দাকে যাচাই হয় বিপদ দিয়ে। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে পছন্দ করেন, তখন তাদেরকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করেন। তখন যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি রাজি থাকে, আল্লাহ তার প্রতি রাজি থাকেন। আর যে অসন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। (মুজামে কাবীর : ৮ : ১৬৫; মুস্তাদরাকে হাকিম : ৪ : ৩১৪)

আহনাফ ইবনে কায়েস বলেন, একবার আমার দাঁতের মাড়িতে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো। আমি আমার চাচাকে বললাম, দাঁতের ব্যথার জন্য সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। এ কথাটি আমি তিনবার তার নিকট বললাম। তিনি বললেন, তুমি এক রাতের ব্যথায় এত অভিযোগ করছো। আমি ত্রিশ বছর যাবত অন্ধ। কিন্তু কেউ তা জানতেও পারেনি। (শুআবুল ঈমান : ৯৫৮৩)

আল্লাহ তাআলা উযাইর (আ)-এর কাছে ওহি পাঠালেন, তোমার ওপর কোনো মুসিবত আসলে আমার বান্দাদের কাছে আমার ব্যাপারে অভিযোগ করো না। আমার কাছে অভিযোগ করো। কেননা, তোমার থেকে যখন কোনো ভুলত্রুটি প্রকাশ পায়, আমি তো ফেরেশতাদের কাছে তোমার ব্যাপারে অভিযোগ করি না। (শুআবুল ঈমান : ৯৫৮৩; আনসাবুল আশরাফ : ১২ : ৩২৯)

আল্লাহ তাআলার মহান দয়া ও অনুগ্রহের দরবারে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর কুদরতি চাদর দ্বারা আমাদের দোষত্রুটি ঢেকে রাখেন।

মুসিবত হতে নিয়ামত উত্তম

উপরিউক্ত হাদিস ও রেওয়ায়াত থেকে মুসিবতের ফযিলত জানা যায়। এ আলোচনা শুনে লোকেরা হয়তো বলতে পারে যে, তাহলে তো পৃথিবীতে নিয়ামাতের তুলনায় বিপদ আসাই উত্তম। সুতরাং মানুষ কি আল্লাহ তাআলার নিকট মুসিবতের দুআ করবে? এর জবাব এই যে, মুসিবতের প্রার্থনা করা না-জায়েয এবং এটা জায়েয হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং বিপদ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা শরিয়তসম্মত। হাদিসে আছে, নবী কারীম (স) দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের বিপদ থেকে আশ্রয় চাইতেন। তাঁর এবং অন্যান্য নবীদের দুআও এটাই ছিল—

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً.

হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। (সূরা বাকারা : ২০১)

নবীগণ শত্রুর বিদ্বেষ থেকেও আল্লাহ আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (সুনানে নাসায়ী : ৮ : ২৬৫; মুস্তাদরাকে হাকিম : ১ : ৫৩১)

একদিন আলী (রা) দুআয় আল্লাহ তাআলার কাছে সবর প্রার্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে মুসিবত চেয়েছো। তাঁর কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা চাও। (জামে তিরমিযী : ৩৫২৭, ৩৫৬৪)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

سَلُوْا اللهَ الْعَافِيَةَ فَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ إِلَّا الْيَقِيْنَ.

আল্লাহ তাআলার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। কেননা, নিরাপত্তার চেয়ে উত্তম বস্তু ইয়াকীন ব্যতীত কেউ পায়নি। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮৪৯)

এখানে ইয়াকীন অর্থ অন্তরের সুস্থতা, যাতে সন্দেহ ও অজ্ঞতার রোগ নেই। কেননা, অন্তরের সুস্থতা শারীরিক সুস্থতার চেয়ে উত্তম।

হাসান বসরী (র) বলেন, শুকরিয়াসহ সুস্থতা এমন কল্যাণ যাতে কোনো অকল্যাণ বা অনিষ্ট নেই। এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে, যারা সুস্থতার নিয়ামত পেয়েও শোকর আদায় করে না। (কূতুলু কুলূব : ১ : ২০৬; হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪ : ২৫৪)

মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ (র) বলেন, মুসিবতে পতিত হয়ে সবর করার চেয়ে সুস্থ থেকে শোকর আদায় করা আমার কাছে বেশি প্রিয়। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ১১ : ২৫৩; হিলয়াতুল আউলিয়া : ২ : ২০০)

রাসূলুল্লাহ (স) দুআ করেছেন, হে আল্লাহ! আপনার সুস্থতার নিয়ামত আমার কাছে বেশি প্রিয়। (কূতুল কুলূব : ১ : ২০৬; সীরাতে ইবনে হিশাম : ১ : ৪২০)

এটি সুস্পষ্ট বিষয়। এটি প্রমাণের জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। মুসিবত বা বিপদ নিয়ামত হয় দুই হিসেবে; ১. দীন বা দুনিয়ার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় মুসিবতের তুলনায়। ২. এর বিনিময়ে প্রত্যাশিত সওয়াবের দিক থেকে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়াতে পূর্ণ নিয়ামত, বিপদাপদ থেকে আশ্রয় এবং নিয়ামতের শুকরিয়ার জন্য সওয়াব প্রার্থনা করা উচিত। কেননা, তিনি সবরের ফলে যে প্রতিদান দেবেন, নিয়ামতের শুকরিয়ার জন্যও সে প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

কেউ যদি বলে, অনেকের কথা থেকে বোঝা যায়, তারা মুসিবত ও বিপদাপদ কামনা করেন। যেমন এক বুযুর্গ বলেন, আমার মনের বাসনা, আমি জাহান্নামের সেতু হবো। পুরো সৃষ্টিজীব আমার উপর দিয়ে পার হয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। আমি একা জাহান্নামে থেকে যাবো।

সামনূন (র) বলেন,

وَلَيْسَ لِيْ فِيْ سِوَاكَ حَظٌّ * فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِيْ.

তুমি ছাড়া আমার আর কিছু চাই না। তুমি যেভাবে চাও পরীক্ষা করে নাও।

এগুলো সব মুসিবতের প্রার্থনা। অথচ হাদিসে এ ধরনের প্রার্থনা করতে বারণ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা কী? (উকালাউল মাজানীন : ৩৩৯; আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া : ৮৮)

এর উত্তর হলো, বর্ণিত আছে, এ কবিতা পাঠের পর সামনূন (র) কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। তিনি মক্তবে ঘুরে ঘুরে বাচ্চাদের বলতেন, তোমাদের এ মিথ্যাবাদী চাচার জন্য দুআ করো। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। আর প্রথম বক্তব্যের উত্তর হলো, কারও মহব্বত এমন হওয়া যে, সে একা জাহান্নামে থেকে যাবে, অন্য সবাই নাজাত পেয়ে যাবে, এটা অসম্ভব।

তবে কারও কারও অন্তরে মহব্বত এতো প্রবল হয়, সে নিজেকে এটারই যোগ্য মনে করে। ইশকের মদিরা যে পান করে, সে নেশায় মাতাল হয়ে যায়। তখন এমন অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে ফেলে, নেশা কেটে গেলে যদি তাকে বলা হয়, তুমি এই এই বলছিলে, সে বলবে, এটা আমার স্বাভাবিক অবস্থা নয়; এ ছিলো ক্ষণিকের পাগলামি। সুতরাং আশেকদের কথাকে বাস্তবতা ভেবো না। আশেকদের কথা শুনতে ভালো লাগলেও তা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। বর্ণিত আছে, এক কপোত তার কপোতীর সাথে সম্ভোগ করতে চাইলে কপোতী তার ডাকে সাড়া দিলো না। তখন কপোতটি বলল, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে? তুমি বললে তোমার জন্য আমি সুলায়মান (আ)-এর রাজত্বকে উলটে দিতে পারি! সুলায়মান (আ) কপোতের এ কথা শুনে ফেলেন এবং ডেকে এহেন মন্তব্যের জন্য তাকে তিরস্কার করেন। তখন কপোতটি বলল, হে আল্লাহর নবী! প্রেমিকদের কথাকে গুরুত্ব দিতে নেই। তাদের কথাবার্তা গ্রহণযোগ্য নয়। (আর রিসালাতুল কুশায়রিয়া : ৫৩০)

এটি বাস্তব সত্য। প্রেমের নেশায় মাতাল প্রেমিকরা অনেক সময় এমন কথা বলে ফেলে, স্বাভাবিক অবস্থায় যা সে কখনো বলবে না।

কবি বলেন,

أُرِيْدُ وِصَالَهُ وَيُرِيْدُ هَجْرِىْ * فَأَتْرُكُ مَا أُرِيْدُ لِمَا يُرِيْدُ.

আমি চাই মিলন, সে চায় বিচ্ছেদ। তাই তার চাওয়ার কারণে আমি আমার চাওয়াকে বিসর্জন দিলাম। (ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত : ২ : ৩০১; আল ওয়াফী বিল ওয়াফায়াত : ১৮ : ২৬৮)

কবিতার অর্থ দাঁড়ায়— আমি যা চাই না, আমি তা চাই। কেননা, যে মিলন চায়, সে বিচ্ছেদ চায় না। সুতরাং যে বিচ্ছেদ চায় না, সে কীভাবে বিচ্ছেদ চাইবে? অর্থাৎ যে মিলন চায়, সে কীভাবে বিচ্ছেদ চাইবে? বোঝা গেল, এটিও অসম্ভব! তবে দুটি ব্যাখ্যায় কথাটিকে শুদ্ধ বলা যায়। ১. কখনো এমনটি হতে পারে। তখন উদ্দেশ্য হয়, প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি অর্জন করা, যা ভবিষ্যতে প্রেমাস্পদের সাথে তার মিলন ঘটাতে পারে। এ সূরতে বিচ্ছেদ সন্তুষ্টির কারণ এবং সন্তুষ্টি প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের মাধ্যম

হচ্ছে। আর যে বস্তু প্রিয় মানুষের কাছে যাওয়ার মাধ্যম হয়, তা-ও প্রিয় হয়। যেমন কেউ দুই দিরহাম পাওয়ার আশায় এক দিরহাম বিসর্জন দিলো। অথচ সে এক দিরহামেরও কামনা করে। কিন্তু ভবিষ্যতের লাভের আশায় সে এখন খুশিমনে এক দিরহামের মায়া ত্যাগ করছে। ২. দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, প্রেমিকের কাছে কেবল প্রেমাষ্পদের সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য। মিলন-বিচ্ছেদে তার কিছু আসে যায় না। যদি সে জানতে পারে, তার প্রেমাষ্পদ তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে এতো স্বাদ অনুভব করে, তার দর্শনেও এতো স্বাদ অনুভব করে না। অনেক খোদাপ্রেমিক এমন আছেন, যারা মুসিবত ও বিপদে থেকেও সন্তুষ্ট থাকেন। কষ্টেও তারা স্বাদ অনুভব করেন। তারা মনে করেন, এ কষ্ট, এ মুসিবত তাঁর সন্তুষ্টিরই আলামত। ইশকের এ হালতে পৌঁছা অসম্ভব কিছু না। তবে এ হালত খুবই সংক্ষিপ্ত হয়, দীর্ঘ সময় থাকে না। যদি দীর্ঘ সময় থাকে, স্বাভাবিক অবস্থা থেকে আলাদা করা কঠিন হয়ে যায়। এটা বোঝাও কঠিন হয়ে পড়ে, এ হালতের কারণে তার অন্তর স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল কি না। থাক! এটা ভিন্ন বিষয়। এ নিয়ে এখানে আলোচনার সুযোগ নেই। এখানে আলোচনার বিষয় হলো, মুসিবত হতে সুস্থতা উত্তম। আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা দান করুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সবর উত্তম না শোকর?

এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কেউ বলেন, সবর শোকরের চেয়ে উত্তম। কারও মতে সবরের চেয়ে শোকর উত্তম। আবার অনেকে বলেন, দু'টোই সমান। অনেকের অভিমত এই যে, কোনো কোনো অবস্থায় সবর উত্তম এবং কোনো কোনো অবস্থায় শোকর উত্তম। এ সকল মতের প্রবক্তারা নিজ নিজ মতের পক্ষে বিরোধপূর্ণ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। সে জন্য প্রকৃত সত্য প্রকাশ করাই ভালো।

এ বিষয়ক আলোচনার দুটি পদ্ধতি হতে পারে

প্রথম পদ্ধতি : আলোচনায় সহজতা অবলম্বন। অর্থাৎ শুধু বাহ্যিক বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করা এবং বেশি ঘাঁটাঘাঁটিতে লিপ্ত না হওয়া। এ ধরনের বক্তব্যই সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য উত্তম। কারণ, তাদের বোধশক্তি সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে পারে না।

বক্তা বা ওয়ায়েজগণও এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। কেননা, সাধারণ মানুষকে ওয়াজ নসিহতের উদ্দেশ্য হলো, তাদের সংশোধন। স্নেহময়ী মা যেমন তার শিশুকে নানারকম সুস্বাদু ও চর্বিযুক্ত খাবার থেকে

দূরে রাখেন। তাকে কেবল কোমল দুধ দ্বারা লালনপালন করেন। যাতে তার পাকস্থলি নানারকম মজাদার খাবার গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে ওঠে এবং তার দুর্বলতা কেটে যায়। তেমনি সাধারণ মানুষকেও এ ধরনের গভীর আলোচনা থেকে দূরে রাখা উচিত। তারা এর উপযুক্ত না। তাদের কেবল সে সব বিষয় জানানো উচিত, শরিয়তের দলিল দ্বারা যা স্পষ্ট বোঝা যায়।

বাহ্যিক বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সবর উত্তম। যদিও শোকরের ফযিলত সম্পর্কিত অনেক হাদিস রয়েছে। কিন্তু সবরের ফযিলত সম্পর্কিত হাদিসের প্রতি লক্ষ করলে সবরের ফযিলত শোকরের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

যেমন এক হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, আল্লাহ প্রদত্ত উত্তম বস্তুগুলোর অন্যতম হলো ইয়াকিন ও ধৈর্যের দৃঢ়তা। (কূতুল কুলূব : ১ : ১৯৪)

হাদিসে এসেছে, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে, যে দুনিয়াতে সর্বাধিক শোকরকারী ছিল। এরপর তাকে শোকরকারীদের সওয়াব দেওয়া হবে। এরপর সর্বাধিক সবরকারীকে ডেকে বলা হবে— আমি এই শোকরকারীকে যতটুকু সওয়াব দান করেছি, সেই পরিমাণ তোমাকে দিলে তুমি খুশি হবে কি? সে বলবে, হে প্রভু! অবশ্যই খুশি হব। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তা হবে না। আমি তোমাকে নিয়ামত দান করেছি। তুমি শোকর করেছ। তোমাকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করেছি। তুমি ধৈর্য ধারণ করেছ। কাজেই আমি আজ তোমাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেব। সুতরাং তাকে শোকরকারীর চেয়ে দ্বিগুণ সওয়াব দান করা হবে। কুরআনে আছে,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

ধৈর্যশীলদের (পরকালে) অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। (সূরা যুমার : ১০)

হাদিস শরিফে রয়েছে,

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ.

অর্থাৎ, আহার করে শোকরকারী, সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে রোযা রাখে এবং ধৈর্য ধারণ করে।

এ হাদিস থেকেও সবরের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যায়। কেননা, শোকরের ফযিলত বৃদ্ধির জন্য সবরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সবর উত্তম না হলে শোকরকে এর সাথে তুলনা করা হতো না।

এ তুলনা হলো এমন, যেমন এ রেওয়ায়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে,

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, জুমা হলো গরিবের হজস্বরূপ। (তারীখে আসবাহান : ২ : ১৬০; মুসনাদুশ শিহাব : ৭৮; তারীখে দিমাশক : ৩৮ : ৪৩০)

স্বামীর হক আদায় ও স্বামীর সাথে উত্তম আচরণ নারীদের জন্য জিহাদতুল্য। (শুআবুল ঈমান : ১১৫২; আল-ইয়ালা : ৫২৮)

মদপান মূর্তিপূজাতুল্য। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৩৭৫)

এক হাদিসে আছে, সবর ঈমানের অর্ধেক। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫ : ৩৪; তারীখে বাগদাদ : ১৩ : ২২৮; আল মুজামুল কাবীর : ৯ : ১০৪)

কিন্তু এর উদ্দেশ্য এই নয়, শোকরকেও সবরের মতো ঈমানের অর্ধেক বলা হবে। বরং এটা এ হাদিসের মতো— রোযা সবরের অর্ধেক। (জামে তিরমিযী : ৩৫১৯; সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৭৪৫)

কেননা, কোনো বস্তুর দুটি অংশ থাকলে দুটির একটিকে 'অর্ধাংশ' বলা হয়, দুঅংশের মাঝে যদিও তফাৎ থাকে। যেমন বলা হয়, ঈমানের দুটি অংশ; ইলম ও আমল। সে হিসেবে আমল ঈমানের অর্ধেক হলো। তার মানে এই নয়, আমল ও ইলম সমপর্যায়ের।

অন্য এক হাদিসে নবী কারীম (স) ইরশাদ করেন, হযরত সুলাইমান (আ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কারণে নবীদের মধ্যে সবারশেষে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। আর আমার সাহাবিগণের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আওফ ধনী হওয়ার কারণে সকলের শেষে বেহেশতে যাবে। অন্য রেওয়ায়াতে এ শব্দে রয়েছে, সুলায়মান (আ) সকল নবীর চল্লিশ বছর পর জান্নাতে যাবেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২০৩; আল মুজামুল আওসাত : ৪১২৫; মুসনাদুল ফিরদাউস : ৮৯০৯; মুসনাদুল বাযযার : ৭০০৩)

এর বিপরীতে দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, বেহেশতের সকল দরজারই দুটি করে কপাট রয়েছে। কিন্তু সবর নামক দরজার কপাট একটিই। সর্বপ্রথম যে এই দরজা দিয়ে দাখিল হবে, সে হবে

বিপদগ্রস্ত। তাদের নেতা হবেন হযরত আইয়ুব (আ)। দারিদ্র সম্পর্কিত হাদিসসমূহ সবরের ফযিলত প্রমাণ করে। কেননা, সবর হচ্ছে দরিদ্র ব্যক্তির অবস্থা। আর শোকর হচ্ছে ধনী ব্যক্তির অবস্থা। আর এটা এমন বক্তব্য, যাতে সাধারণ মানুষ তুষ্ট হয়ে যায় এবং এতেই তাদের দীনি উপযোগিতা নিহিত।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : আলেম ও বোদ্ধা ব্যক্তিদের সামনে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর স্বরূপ তুলে ধরা। তাই আমরা বলি, দুটি অস্পষ্ট বিষয়ের মধ্যে কোনোরকম তুলনা চলে না, যে পর্যন্ত প্রতিটির স্বরূপ সুস্পষ্ট না হয়ে যায়। সুস্পষ্ট হওয়ার পর যদি সে বিষয় দুটির প্রকার বিভিন্ন থাকে, তাহলে তাদের মধ্যেও যৌথভাবে তুলনা চলে না। বরং প্রত্যেকটি প্রকারকে পৃথক পৃথক করে তুলনা করা জরুরি। এতে করে পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি বুঝে আসবে। সবর ও শোকরেরও বিভিন্ন প্রকার ও শাখা রয়েছে। তাই অস্পষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হতে পারে না। বরং উভয়ের প্রত্যেক শাখাকে একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে যাচাই করে দেখতে হবে।

সবর ও শোকর উভয়টি তিন ভাগে বিভক্ত— মারেফাত (জ্ঞান), হালত ও আমল। এখন একটির মারেফাতকে অপরটির হালত ও আমলের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। বরং একটির হালতকে অপরটির হালতের সঙ্গে, একটির মারেফাতকে অপরটির মারেফাতের সঙ্গে এবং একটির আমলকে অপরটির আমলের সঙ্গে তুলনা করা যাবে। এতে পারস্পরিক সামঞ্জস্য প্রকাশ পাবে এবং এজন্য একটির শ্রেষ্ঠত্ব অপরটির ওপর জানা যাবে।

সর্বশ্রেষ্ঠ ইলম হলো ইলমে মুকাশাফা। এটি ইলমে মুয়ামালা হতেও শ্রেষ্ঠ। বরং ইলমে মুয়ামালা তো মুয়ামালা হতেও নীচু স্তরের। কেননা, ইলমে মুয়ামালা মুয়ামালার জন্য উদ্দিষ্ট হয় এবং এর উপকারিতা হলো, আমল সংশোধন। হাদিসে আলেমকে আবেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ওই আলেম, যার ইলমের উপকারিতা ব্যাপক। এ ধরনের আলেম কোনো নির্দিষ্ট আমলকারী আবেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অন্যথায় আমলহীন ইলম নিছক আমল হতে উত্তম নয়। আমল সংশোধনের উপকারিতা হলো এর দ্বারা অন্তরের হালতসমূহের সংশোধন হয়। আর অন্তরের হালত সংশোধনের ফায়দা হলো, এর ফলে বান্দার কাছে আল্লাহ তাআলার সত্তা, গুণাবলি এবং তাঁর কাজের মহত্ব ও সৌন্দর্য উন্মোচিত হয়। এ থেকে

বোঝা যায়, উলূমে মুকাশাফার মধ্য হতে আল্লাহ তাআলার মারেফাত শ্রেষ্ঠ। আর আল্লাহ তাআলার মারেফাতই অভীষ্ট লক্ষ্য। এর দ্বারাই পরকালের সৌভাগ্য অর্জন হয়; বরং স্বয়ং এটিই সৌভাগ্য। দুনিয়াতে থাকতে তা বুঝে আসে না। তবে পরকালে অবশ্যই বুঝে আসবে। সকল ইলম ও জ্ঞান বিজ্ঞানের মাঝে আল্লাহর মারেফাত তথা তাঁর পরিচয় সম্পর্কিত ইলম সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান। এ ইলমের ধরাবাঁধা কোনো সীমা নেই; স্বাধীন, উন্মুক্ত। এটি অন্য কিছুর সাথে সম্পৃক্ত বা শর্তযুক্তও নয়। বরং অন্য সকল ইলম এর অনুগামী ও সহায়ক। অন্য সকল ইলম এজন্য কাম্য হয়, সেগুলো দ্বারা আল্লাহর মারেফাত অর্জন করা হয়। সুতরাং যে ইলম আল্লাহ তাআলার মারেফাত অর্জনে যত উপকারী ও সহায়ক হবে, অন্য ইলমের সঙ্গে তার মর্যাদার তারতম্য তত বেশি হবে। আল্লাহ তাআলার মারেফাত পর্যন্ত পৌঁছতে কোনো কোনো ইলমের এক বা একাধিক মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। তাই যে ইলমের মাধ্যম যত কম হবে, তার মর্যাদা তত বেশি হবে।

অন্তরের হালত দ্বারা উদ্দেশ্য এমন হালত, যা সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ততা ও দুনিয়ার পঙ্কিলতা থেকে অন্তরকে পবিত্র করে। যখন অন্তর একেবারে পবিত্র ও পরিষ্কার হয়ে যায়, তার সামনে সত্যের বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ থেকে বোঝা গেল, অন্তরের পরিশুদ্ধি, পবিত্রতা ও সংশোধনের ক্ষেত্রে অন্তরের হালত যত কার্যকর হবে, অন্তরকে ইলমে মুকাশাফা অর্জনের যতটা যোগ্য করে তুলবে, সে হালতের মর্যাদা তত বেশি হবে। অন্তরের উপমা আয়নার মতো। আয়নাকে ঘষে চকচকে ও স্বচ্ছ করা পর্যন্ত তার বিভিন্ন হালত থাকে। কোনো হালতে আয়না বেশি চকচকে থাকে, কোনো হালতে কম। একই হালত অন্তরের। যে হালত অন্তর পবিত্র হওয়ার বেশি নিকটবর্তী হবে, অন্য হালতের তুলনায় তার মর্যাদা বেশি হবে। কেননা, তা মূল লক্ষ্যের অধিক নিকটবর্তী। আমলের ক্ষেত্রেও একই বিন্যাস প্রযোজ্য। আমল দ্বারাই অন্তরের পরিশুদ্ধি নিশ্চিত হয়। এর ফলেই অন্তরে বিভিন্ন হালত আবর্তিত হয়।

আমলের দুটি অবস্থা : ১. অন্তরে এমন হালত তথা অবস্থা সৃষ্টি হবে, যা ইলমে মুকাশাফার প্রতিবন্ধক। যার কারণে অন্তরে অন্ধকার ছেয়ে যায়, দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

২. অথবা অন্তরে এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে, যা ইলমে মুকাশাফা গ্রহণের উপযোগী। যার কারণে অন্তর পরিষ্কার হয়, দুনিয়ার পাপ পঙ্কিলতা ও মাখলুক হতে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রথম অবস্থার নাম মাসিয়াত (مَعْصِيَةٌ) তথা অবাধ্যতা। দ্বিতীয় অবস্থার নাম ত্বাআত (طَاعَةٌ) তথা আনুগত্য। একেক মাসিয়াতের প্রতিক্রিয়া একেক রকম। কোনোটা অন্তরকে বেশি কলুষিত করে, কোনোটা কম। তেমনি কোনো ত্বাআতে অন্তর বেশি আলোকিত হয়, কোনোটাতে কম। প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী ত্বাআত বা মাসিয়াতের স্তরে তারতম্য হবে। আর এটি হয় অন্তরের হালতের তারতম্যের কারণে। যেমন সাধারণত আমরা বলি, নফল নামায অন্য সকল নফল আমল হতে উত্তম, হজ পালন সদকা হতে উত্তম, কিংবা তাহাজ্জুদের নামায অন্য সকল নফল নামায হতে উত্তম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধানমূলক বক্তব্য হলো, দুনিয়াপ্রেমী কৃপণ ধনীর জন্য আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে এক টাকা খরচ করা অসংখ্য রোযা ও রাত্রি জাগরণ হতে উত্তম।

রোযা তার জন্য উপকারী, যার পেটের চাহিদা অনেক এবং সে তা দূর করতে চায়, কিংবা পেট পুরে আহার যাকে ইলমে মুকাশাফার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ চিন্তায় বাঁধা দেয় এবং সে ক্ষুধার মাধ্যমে অন্তরকে স্বচ্ছ করতে চায়। কৃপণের অবস্থা ভিন্ন; সে পেটের চাহিদার রোগে আক্রান্ত নয়, কিংবা সে এমন বিশেষ কোনো চিন্তা-ফিকিরে মগ্ন নয়, পেট পুরে আহার যাতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তার রোযা রাখার মানে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় স্থানান্তর হওয়া। তার উপমা এমন রোগীর মতো, যার পেটে সমস্যা, কিন্তু ওষুধ খাচ্ছে মাথা ব্যাথার। এ ওষুধ তার কোনো কাজে আসবে না। তার জন্য উচিত তার উপর চেপে বসা ধ্বংসাত্মক রোগের দিকে মনযোগ দেওয়া।

কৃপণতা একটি মারাত্মক ধ্বংসাত্মক রোগ। টানা একশ বছর রোযা এবং এক হাজার রাতের তাহাজ্জুদেও এর এক বিন্দু কমবে না। এর একমাত্র চিকিৎসা সম্পদ খরচ করা। সুতরাং কৃপণের উচিত তার কাছে যা আছে, সদকা করে দেওয়া। আমরা পূর্বে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইহয়াউ উলূমিদ্দীন একাদশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

যেহেতু হালতের পরিবর্তনের কারণে ত্বাআতের প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন আসে, জ্ঞানীরা জানেন, এসব ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে এক কথায় উত্তর দেওয়া ঠিক নয়; মারাত্মক ভুল। যেমন কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, পানি উত্তম নাকি রুটি? আমরা এককথায় এর কী উত্তর দেবো? কারণ, ক্ষুধার্তের জন্য রুটি উত্তম, তৃষ্ণার্তের জন্য পানি। কারও যদি ক্ষুধা, তৃষ্ণা দুটোই পায়, যেটা প্রবল সেটা প্রাধান্য পাবে। যদি তৃষ্ণা বেশি হয়, পানি উত্তম। ক্ষুধা বেশি হলে রুটি উত্তম। উভয়টি সমান হলে তার বিধানও সমান হবে। সে হিসেবে কৃপণের জন্য মাল সদকা করা উত্তম। কেননা, মাল খরচ করার দ্বারা অন্তরে একটি হালত সৃষ্টি হয়। যার ফলে অন্তর থেকে কৃপণতা ও দুনিয়ার ভালোবাসা দূর হয়ে যায়। দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তর থেকে বের হয়ে যাওয়ার ফলে অন্তর আল্লাহ তাআলার মারেফাত ও ভালোবাসার উপযোগী হয়ে ওঠে। অতএব মারেফাত সর্বোত্তম। এরপর অন্তরের হালত, তারপর আমল। কেউ যদি বলে, আপনারা আমলকে সবার শেষে রেখেছেন, অথচ কুরআন-সুন্নাহতে আমলের প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যেমন কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا.

এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান করবে? (সূরা বাকারা : ২৪৫)

অন্য আয়াতে এসেছে,

وَيَأْخُذُ الصَّدَقٰتِ.

এবং 'সদকা' গ্রহণ করেন। (সূরা তাওবা : ১০৪) এরপরও আমল করা ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা উত্তম হবে না কেন?

এর উত্তর হলো, ডাক্তার যদি কোনো ওষুধের প্রশংসা করে এর অর্থ এই নয়, এটা সব রোগের ওষুধ অথবা এটা সেবনের ফলে যে সুস্থতা অর্জিত হয়, এটা তার চেয়েও উত্তম। আমল হলো অন্তরের রোগের ওষুধ। অন্তরের রোগ সাধারণত টের পাওয়া যায় না। এর উপমা হলো, কারও মুখমণ্ডল কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হলো, যার কাছে আয়ানা নেই দেখার জন্য। তাহলে সে কুষ্ঠ অনুভবও করতে পারবে না। এখন কেউ যদি বলে, তোমার মুখে কুষ্ঠ রোগ হয়েছে, সে তা বিশ্বাস করবে না। এ ক্ষেত্রে

করণীয় হলো, উদাহরণস্বরূপ গোলাপজল যদি কুষ্ঠ দূর করে, তাহলে তার কাছে গোলাপজল দিয়ে মুখ ধোয়ার খুব প্রশংসা করা, এর বহুবিধ উপকারিতা বর্ণনা করা। যাতে সে নিয়মিত গোলাপজল দিয়ে মুখ ধুতে উৎসাহী হয় এবং তার কুষ্ঠ রোগ ভালো হয়ে যায়। যদি শুরুতেই তাকে বলা হতো, গোলাপজল কুষ্ঠ রোগ ভালো করে। তোমার মুখে যে দাগ আছে, এটা ব্যবহারের ফলে তা দূর হয়ে যাবে। তাহলে হয়তো তার মুখে কোনো দাগ নেই ভেবে সে চিকিৎসাই ছেড়ে দিতো।

বিষয়টি আমরা আরেকটি উদাহরণ থেকে বুঝতে পারি। এক ব্যক্তি তার ছেলেকে কুরআন ও ইলম শিক্ষা দিলো এবং সে চাইলো ছেলে যেন তার শিক্ষা ভুলে না যায়। অন্তরে যেন তা স্থায়ীভাবে বসে যায়। সে এও জানে, যদি ছেলেকে তাকরার মুতাআলা ইত্যাদির জন্য তাগিদ দেওয়া হয়, সে বলবে, আমার এসবের প্রয়োজন নেই। আমার সব মনে থাকবে।

কারণ, সে মনে করে, আমি যা মুখস্থ করেছি, তা সবসময় এমনই থাকবে। কখনো ভুলবো না। তাই পিতা কৌশল করে ছেলেকে তার চাকর-নওকরদের ইলম শিক্ষা দিতে বললো। যাতে তাদের শিক্ষা দেওয়ার সময় বারবার আলোচনার ফলে ইলম তার অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে যায়। পিতা এর জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারও ঘোষণা করলো। ছেলে যদি বোকা হয়, সে ভাবতে পারে, আমার পিতা আমার দ্বারা চাকরদের খেদমত করাচ্ছেন! আমাকে দিয়ে চাকরদের খেদমত করানোর কী দরকার? অথচ আমি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পিতার অধিক প্রিয়! পিতা চাইলে আমাকে কষ্ট না দিয়েও তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। তাছাড়া এসব চাকর-নওকররা কুরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলে আমার পিতার তো কোনো লোকসান নেই! কখনো অতিচালাক ছেলে তাদের শিক্ষাদান ছেড়ে দেয় এই ভেবে, তাদের শিক্ষাদানের প্রতি আমার পিতা মুখাপেক্ষী নন এবং আমি তাদের ইলম শিক্ষা না দিলে তিনি কিছু বলবেন না; ক্ষমা করে দেবেন। এভাবেই সে ইলম ও কুরআন ভুলে যায়। নিজের অজান্তেই ইলম থেকে বঞ্চিত ও পশ্চাদপদ থেকে যায়। একদল এমনটি ভেবে প্রবঞ্চিত হচ্ছে। তারা বলে, আল্লাহ তাআলা আমাদের ইবাদত ও দান সদকার মুখাপেক্ষী নন। আমাদের থেকে কর্জ নেওয়ার তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا.

এমন কে আছে, যে আল্লাহ তাআলাকে করযে হাসানা প্রদান করবে? (সূরা বাকারা : ২৪৫)

এ আয়াতের অর্থ কী? অথচ আল্লাহ তাআলা গরিব-মিসকিনদের খাওয়াতে চাইলে এমনিতেই খাওয়াতে পারেন। তাদের খাওয়ানোর জন্য আমাদের অর্থ খরচ করার প্রয়োজন কী? যেমন কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ তোমাদের যে রিজিক দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করো' তখন কাফেররা মুমিনদের বলে, 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাকে খাওয়াতে পারেন, আমরা কি তাকে খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ।' (সূরা ইয়াসীন : ৪৭)

কাফেররা আরও বলে,

لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا.

যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা শিরিক করতাম না। (সূরা আনআম : ১৪৮)

তাদের কথা সত্য। সবকিছুই আল্লাহ তাআলার মর্জির উপর নির্ভরশীল। অথচ তারা তাদের সত্যের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার শান অনন্য! তিনি যাকে চান সত্যের কারণে ধ্বংস করে দেন। যাকে চান অজ্ঞতার কারণে মাফ করে দেন। কুরআনুল কারীমে আছে,

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا.

তা দিয়ে অনেককেই তিনি বিপথগামী করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারা : ২৬)

তারা যদি মনে করে, আমাদের দ্বারা গরিব-মিসকিনদের খেদমত নেওয়া হচ্ছে কিংবা আল্লাহ তাআলার জন্য দান-সদকা করতে আদেশ করা হয়েছে। অথচ না মিসকিনদের সাথে আমাদের কোনো কাজ আছে, না

আমাদের কিংবা আমাদের সম্পদ আল্লাহ তাআলার প্রয়োজন আছে! আমাদের খরচ করা ও না করা দুটোই সমান কথা! তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে গেলো। যেমন অতিচালাক ছেলে ধ্বংস হয়েছে। যে মনে করেছে, পিতার উদ্দেশ্য, আমার দ্বারা চাকরদের খেদমত করানো। সে বুঝতে পারেনি, পিতার উদ্দেশ্য ছিলো, তার মধে ইলমের সিফত স্থায়ী হোক, ইলম তার অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে যাক। যার মাধ্যমে সে দীন ও দুনিয়ার সফলতা অর্জন করতে পরে। এটা হলো পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ মমতার বহিঃপ্রকাশ। এ উদাহরণ দ্বারা পথভ্রষ্টদের অসারতা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো।

গরিব মিসকিনরা তোমাদের সম্পদের যাকাত, দান-সদকা গ্রহণ করে। এভাবে তারা তোমাদের অন্তর হতে কৃপণতা ও দুনিয়ার ভালোবাসা দূর করে, যা তোমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকারক ছিলো। তারা তোমাদের জন্য হিজামাকারীর মতো। হিজামাকারী শরীর থেকে রক্ত বের করে, যাতে রক্তের সাথে শরীরের গোপন রোগগুলোও বের হয়ে আসে। এ হিসেবে তোমরা তার না; বরং সে তোমাদের উপকার করছে। রক্ত বের করার পেছনে হিজামাকারীর যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্য থেকেও থাকে, তবু সে তোমাদের উপকারীর তালিকা হতে বাদ যাবে না। তদ্রূপ গরিব মিসকিনরা যদিও তোমাদের অর্থসম্পদ দ্বারা উপকৃত হয়, তবু তারা তোমাদের উপকারী হিসেবেই গণ্য হবে। কেননা, তারা তোমাদের সদকা গ্রহণ করে তোমাদের অন্তরকে পঙ্কিলতা ও ক্ষতিকর স্বভাব হতে পবিত্র করছে। তাই রাসূলুল্লাহ (স) সদকা গ্রহণ করেননি। আহলে বাইতকেও এ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। (সহিহ মুসলিম : ১০৭২)

তিনি সদকাকে মানুষের সম্পদের ময়লা বলেছেন। তেমনি হিজামাকারীর পারিশ্রমিক গ্রহণেও বারণ করেছেন। (সুনানে নাসায়ী : ৭ : ৩১০; সুনানে ইবনে মাজাহ : ২১৬৫)

সারকথা, আমল অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্তরে আমলের যতটুকু প্রতিক্রিয়া হবে, অন্তর হেদায়াত গ্রহণের এবং মারেফাতের নূর ধারণের ততটুকু উপযুক্ত হবে। আমল, হালত এবং মারেফাতের ফযিলতের ব্যাপারে এটি একটি মূলনীতি। কোনো আমল, হালত অথবা মারেফাতের ফযিলত জানার জন্য এ মুলনীতিকে সামনে রাখা উচিত। এখন আমরা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় 'সবর ও শোকার'-এ ফিরে যাচ্ছি।

সবর ও শোকরের প্রত্যেকটিতে মারেফাত, হালত ও আমল বিদ্যমান। একটির মারেফাতের সাথে অপরটির হালত বা আমলের তুলনা ঠিক নয়। বরং একটির মারেফাতের সাথে অপরটির মারেফাত, হালতের সাথে হালত এবং আমলের সাথে আমলের তুলনা হতে পারে। যাতে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য প্রমাণিত হয়। সামঞ্জস্য প্রমাণিত হলে একটির বিপরীতে অপরটির শ্রেষ্ঠত্বও স্পষ্ট হয়ে যাবে। যদি সাবের তথা সবরকারীর মারেফাতের সাথে শাকের তথা শোকরকারীর মারেফাতের তুলনা করা হয়, ফলাফল একই হবে। চোখের ক্ষেত্রে শাকেরের মারেফাত হলো, সে দৃষ্টিশক্তিকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নিয়ামত মনে করবে। সাবেরের মারেফাত হলো সে দৃষ্টিহীনতাকেও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জানবে। এভাবে উভয় মারেফাত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও সমপর্যায়ের হবে। এটি তখন হবে, যখন সবর মুসিবতের ক্ষেত্রে হবে। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, সবর ত্বাআত ও মাসিয়াতের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে সবর ও শোকর একই বস্তু হয়। কেননা, ত্বাআতের উপর সবর করা এবং ত্বাআতের জন্য শোকর আদায় করা একই জিনিস। উভয়টি একই জিনিস হওয়ার কারণ, শোকর হলো আল্লাহ তাআলার নিয়ামত উদ্দিষ্ট হেকমতে খরচ করা। আর সবর হলো প্রবৃত্তির প্রেরণার বিপরীতে দীনি প্রেরণা স্থির থাকা। এ হিসেবে সবর ও শোকর একই বস্তুর দুটি নাম হলো। শুধু ক্ষেত্র ও শব্দের পার্থক্য। প্রবৃত্তির প্রেরণার বিপরীতে দীনি প্রেরণার স্থিরতার নাম সবর, যদি প্রবৃত্তির প্রেরণার দিকে সম্পৃক্ত হয়। দীনি প্রেরণার দিকে সম্পৃক্ত হলে তার নাম শোকর। দীনি প্রেরণাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ হেকমতে, তা প্রবৃত্তির প্রেরণাকে পরাজিত করে। শোকরের ক্ষেত্রে তো এ হেকমত বাস্তবায়ন হয়ে যায়, সবরের ক্ষেত্রেও তা উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যেন এ দুটি একই অর্থের দুটি বর্ণনাভঙ্গি। সুতরাং একটি বস্তু নিজের উপরই কীভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে? যেমনটি আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, সবরের ক্ষেত্র তিনটি; ত্বাআত, মাসিয়াত ও মুসিবত। ত্বাআত ও মাসিয়াতের ক্ষেত্রে সবর ও শোকরের বিধান আমরা পূর্বে জেনেছি। মুসিবত হলো নিয়ামত হারানোর নাম। নিয়ামত হয়তো অনিবার্য হবে, যা ছাড়া চলে না। যেমন দুচোখ। অথবা এমন হবে, যা অনিবার্য নয়; কিন্তু প্রয়োজন হয়। যেমন সম্পদ জীবনধারণ পরিমাণের চেয়ে বেশি হওয়া।

চক্ষু একটি অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামত। এর বিলুপ্তিতে ধৈর্যের উদ্দেশ্য, এর অভিযোগ না করে আল্লাহর কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং অন্ধত্বের কারণে অনেক গুনাহের অনুমতি না চাওয়া। অন্যদিকে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির শোকর আমলের দিক দিয়ে এই যে, একে পাপের কাজে ব্যবহার করবে না; বরং আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করবে। এই উভয় প্রকার শোকর সবর থেকে পৃথক নয়। যেমন— অন্ধ ব্যক্তির সুন্দরী মহিলাদের ব্যাপারে সবর ধরার প্রয়োজনই নেই। কারণ, সে তো দেখতেই পায় না। কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দৃষ্টি সুন্দরী মহিলার ওপর পড়লে সে যদি ধৈর্য ধারণ করে, তবে সে চোখের নিয়ামতের শোকরকারী হবে। আর পুনরায় দেখলে এই নিয়ামতের নাশোকরি হবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, সবর শোকরের অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে আনুগত্যের কাজে চোখকে ব্যবহার করলে আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ করা হবে।

মানুষ অনেক সময় চোখের নিয়ামতের শোকর এভাবে আদায় করে যে, সে আল্লাহ তাআলার আশ্চর্যজনক সৃষ্টি কৌশল দেখে, যাতে এর মাধ্যমে মারেফাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এ ধরনের শোকর সবর অপেক্ষা উত্তম। আমরা জানি হযরত শুয়াইব (আ) যিনি নবীদের মধ্যে চক্ষুষ্মান ছিলেন না। তাঁর মর্যাদা হযরত মূসা (আ) ও অন্যান্য নবীদের মর্যাদার চেয়ে বেশি হওয়া জরুরি হবে। কারণ, তিনি দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার পর সবর করেছিলেন, যা মূসা (আ) করেননি। অথচ হযরত শুয়াইব (আ)-এর মর্যাদা সমান।

আর মানুষ তখন পরিপূর্ণতায় পৌঁছবে, যখন তার সকল অঙ্গ বিকল হয়ে গোশতের দলায় পরিণত হবে। অথচ ত্রুটি একটি অস্বাভাবিক বিষয়। কারণ মানুষের প্রতিটি অঙ্গ দীনের একেকটি যন্ত্র বা উপকরণ। যখন কোনো অঙ্গ বিকল হয়ে যায়, দীনের একটি যন্ত্র বিকল হয়ে যায়। প্রত্যেক অঙ্গের শোকর হলো, যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজে তাকে ব্যবহার করা। এটা সবর ছাড়া সম্ভব নয়। আর যে নিয়ামত প্রয়োজনের পর্যায়ে, যেমন জীবনধারণ পরিমাণের চেয়ে বেশি সম্পদ হওয়া, এর অবস্থা হলো, যখন প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও জীবনধারণ পরিমাণের চেয়ে বেশি সম্পদ না দেওয়া হয়, তখন এর উপর সবর করাকে মুজাহাদা বলে। এটা হলো গরিবের জন্য জিহাদস্বরূপ।

মানুষ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসম্পদ অর্জন করে, তবে অতিরিক্তকে নিয়ামত বলা হবে। আর এর শোকর হলো, তা দান-খয়রাতে খরচ করা; অবাধ্যতায় ব্যয় না করা। সবরের সাথে এই শোকরকে তুলনা করলে শোকর হবে উত্তম। কেননা, এই শোকর সবরকেও নিজের মধ্যে শামিল রাখে। কেননা, এখানে সবরের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামতে সন্তুষ্ট হয়ে গরিবদের জন্য ব্যয় করার কষ্ট সহ্য করা এবং বিলাসিতায় খরচ না করা। এ ধরনের শোকরের মধ্যে দুটি বিষয় রয়েছে। তার একটি হচ্ছে সবর। সুতরাং, সবর হচ্ছে শোকরের অংশ। এজন্য শোকর বড় এবং সবর তার ছোট অংশ। আর ছোটো ও বড় অংশের মাঝে তুলনা শুদ্ধ নয়। কিন্তু যদি এই নিয়ামতকে পাপের কাজে ব্যয় না করে বৈধ ভোগবিলাসে ব্যয় করে শোকর করা হয়, তাহলে সবর শোকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবে এবং ধৈর্যশীল ফকির এই ধনী ব্যক্তির তুলনায় উত্তম হবে।

তবে সে ধনীর তুলনায় উত্তম নয়, যে সৎকাজে সম্পদ খরচ করে। কারণ, গরিব নফসের সাথে মুজাহাদা করেছে, প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত মুসিবতের সময় অটল থেকেছে। এর জন্য অবশ্যই আত্মিক শক্তির প্রয়োজন। অপরদিকে ধনীরা সাধারণত প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে, তথাপি এ ধনী ব্যক্তি শুধু মুবাহ বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, হারাম থেকে বাঁচে। এর জন্যও আত্মিক শক্তির প্রয়োজন। তবে গরিবের মুসিবতের সময় সবরের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, সে তুলনায় ধনীর হারাম থেকে বেঁচে থাকার শক্তির মর্যাদা ও মূল্য অনেক বেশি। মর্যাদা সে শক্তির বেশি হবে, আমল যার প্রমাণ বহন করে। কেননা, আমল কেবল অন্তরের হালত অর্জনের জন্য কাম্য হয়। এ শক্তি হলো, অন্তরের একটি হালত, যা ঈমান ও একিনের পরিমাণ অনুযায়ী কমবেশি হয়। সুতরাং যে বস্তু ঈমান অধিক শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ বহন করে, নিঃসন্দেহে তা অন্য বস্তুর তুলনায় উত্তম হবে।

কুরআন ও হাদিসে সবরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় এই বিশেষ স্তরের সবরই উদ্দেশ্য। কারণ, মানুষ মনে করে নিয়ামতের অর্থ হলো ধনসম্পদ ভোগ করা, শোকরের অর্থ মুখে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা এবং নিয়ামতের মাধ্যমে গুনাহে সাহায্য না নেওয়া। কোনো মানুষ একথা বুঝে না যে, নিয়ামতকে শুধু ইবাদতের কাজেই ব্যয় করতে হবে।

মোটকথা, সাধারণত মানুষ যাকে সবর বলে, তা সেই শোকর অপেক্ষা উত্তম। হযরত জুনায়েদ (র) এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, সবর ও শোকরের মধ্যে কোনটি উত্তম? তিনি বললেন, ধনীর প্রশংসা সম্পদের কারণে নয়। তেমনি ফকিরের প্রশংসা সম্পদ না থাকার জন্য নয়; বরং তাদের নিজ নিজ অবস্থার জন্য যে সকল শর্ত বিদ্যমান, সেগুলো যথাযথ পালন করলেই তারা প্রশংসার যোগ্য হয়। কিন্তু ধনী ব্যক্তির অবস্থার শর্তগুলো মনের অনুকূলে। এতে আনন্দ, ভোগ ইত্যাদি রয়েছে। অপরদিকে ফকির ব্যক্তির অবস্থার শর্তগুলো তার মনকে কষ্ট দেয়। তারা উভয়েই যখন আল্লাহর জন্য নিজ নিজ অবস্থার শর্ত পূর্ণ করবে, তখন যে ব্যক্তি নিজেকে কষ্টে রাখবে, সে ওই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবে, যে নিজেকে ভোগ-বিলাসে রাখবে। হযরত জুনাইদের এই বর্ণনাই বাস্তবসম্মত। (কূতুল কুলূব : ১ : ২০১)

আবুল আব্বাস ইবনে আতা এ বিষয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেছিলেন, যে ধনী ব্যক্তি শোকর করে, সে সবরকারী ফকিরের চেয়ে উত্তম। এতে হযরত জুনাইদ (র) তাকে বদদুআ করেন। ফলে তিনি অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হন। ধনসম্পদ বরবাদ হয়ে যায় এবং পুত্ররা মৃত্যুবরণ করে। চৌদ্দ বছর পর্যন্ত তিনি উম্মাদের ন্যায় জীবনযাপন করেন। তিনি নিজেই বলতেন, জুনাইদের বদদুআ আমার ওপর পড়েছে। এরপর তিনি তার বক্তব্য ফিরিয়ে নেন এবং সবরকারী ফকিরকে ধনী শোকরকারীর ওপর প্রাধান্য দিতে থাকেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২০১)

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয় বক্তব্যই সঠিক। অর্থাৎ, অনেক সবরকারী ফকির শোকরকারী ধনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কখনো এর বিপরীতও হয়। তবে সেই শোকরকারী ধনী শ্রেষ্ঠ হয়, যে নিজেকে ফকিরের মতো মনে করে এবং নিজের জন্য যতটুকু ধনসম্পদ দরকার, ততটুকু রেখে অবশিষ্ট সম্পদ হয় দান করে দেয়, না হয় অভাবগ্রস্ত ও মিসকিনদের জন্য রেখে দেয়। এরপর তাদের অবস্থার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখে এবং যখনই সুযোগ পায়, তাদের জন্য খরচ করে দেয়। এতে সে নাম-যশের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না; বরং আল্লাহর ওয়াস্তে গরিব-অসহায়ের হক আদায় করাই তার লক্ষ্য থাকে। এরূপ ধনী নিঃসন্দেহে সবরকারী ফকির থেকেও শ্রেষ্ঠ।

কেউ যদি বলে, ধনীর জন্য সম্পদ খরচ করা ততটা কষ্টকর নয়, গরিবের জন্য সবর করা যতটা কষ্টকর। কেননা, ধনী এতে সক্ষমতার স্বাদ অনুভব করে ও গরিব ভোগ করে কেবল সবরের কষ্ট। ধনীর যদিও সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার কষ্ট হয়, কিন্তু সে খরচ করতে সক্ষম এ অনুভূতি সেই কষ্টকে ভুলিয়ে দেয়।

এর উত্তর হলো, আমরা মনে করি, যে ব্যক্তি মনে কার্পণ্য নিয়ে দান করে, তার চেয়ে সে ব্যক্তির হালত উত্তম, যে খুশি মনে আগ্রহ ভরে দান করে। কৃপণ মনের ওপর জোর খাটিয়ে পকেট থেকে অর্থ বের করে। তাওবা পর্বে এ নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। মূলত নফসকে কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং নফসকে আদবকায়দা শেখানোর খাতিরে এমনটি হয়ে থাকে। যেমন শিকারী কুকুরকে প্রশিক্ষণের সময় প্রয়োজনে প্রহার করা হয়। কিন্তু এর তুলনায় শিষ্টাচার সম্পন্ন কুকুর উত্তম, যাকে প্রহারের প্রয়োজনই পড়ে না। যদিও প্রথম কুকুর প্রহার সহ্য করে। তাই প্রথম অবস্থায় কষ্ট ও মুজাহাদা করতে হয়। পরবর্তীতে এর আর প্রয়োজন পড়ে না; বরং কষ্টকর কাজগুলোতে সে স্বাদ অনুভব করে। যেমন বুদ্ধিমান শিশুর কাছে পড়ালেখা খুব প্রিয় হয়, যদিও প্রাথমিক অবস্থায় তার কাছে কষ্টকর মনে হতো। যেহেতু প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ মানুষের অবস্থাও শিশুর মতোই হয়ে থাকে, তাই জুনাইদ বাগদাদী (র)-এর উক্তিটি খুবই যুক্তিযুক্ত। তুমি যদি ব্যাখ্যায় না যাও, সাধারণ মানুষকে সামনে রেখে উত্তর দাও, তাহলে বলা উচিত, শোকরের চেয়ে সবর উত্তম। কেননা, জন-সাধারণের মনে সবর ও শোকরের যে চিত্র অঙ্কিত রয়েছে, সে হিসেবে এ উত্তর ঠিক আছে। যদি অনুসন্ধান কাম্য হয়, তবে তা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কেননা, সবরের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো, মুসিবতকে অপছন্দ করলেও কোনো অভিযোগ-অভিমান না করা। সবরের স্তরগুলোর পর 'রিজা' (তথা সন্তুষ্টি)-এর স্থান। এর পর 'মুসিবতের জন্য শোকার আদায়'-এর স্থান। কারণ, সবরের ক্ষেত্রে কষ্টের অনুভূতি থাকে। রেজা এমন ক্ষেত্রেও হতে পারে, যেখানে কষ্টও নেই, আনন্দও নেই। তবে শোকর কেবল প্রিয় ও আনন্দদায়ক বস্তুর ক্ষেত্রেই হয়।

সবর ও শোকর শব্দদ্বয়ের মধ্যে অসংখ্য হালত বিদ্যমান। যেমন— আল্লাহর নিয়ামতসমূহ অবিরত আসার কারণে বান্দার লজ্জিত হওয়া, নিজেকে শোকর আদায়ে অক্ষম মনে করা, আল্লাহর মহান সহনশীলতাকে

অনুভব করা, এ কথা স্বীকার করা যে, কোনোরূপ অধিকার ব্যতীত নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনিতেই আসে। নিয়ামত পেয়ে বিনয় প্রকাশ করা। যে ব্যক্তি নিয়ামতের মাধ্যম হয়, তার শোকর করা ইত্যাদি আল্লাহর শোকরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাদিসে আছে—

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ.

অর্থাৎ, যে মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহর শোকর করে না। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৮১১; জামে তিরমিযী : ১৯৫৪)

একইভাবে নিয়ামতদাতার সম্মুখে আদবসহকারে থাকাও শোকর। নিয়ামতকে উত্তমরূপে গ্রহণ করা এবং নিয়ামত ছোটো হলেও তাকে বড় মনে করাও শোকরের অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, যে সমস্ত আমল ও হালত সবর ও শোকর নামের অন্তর্ভুক্ত, তা অসংখ্য ও অগণিত এবং প্রতিটির স্তর ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং বিশেষ প্রকারের শোকর ও সবর উদ্দেশ্য না হওয়া পর্যন্ত এগুলোর একটিকে অন্যটির ওপর মোটামুটিভাবে প্রাধান্য দেওয়া যাবে কেমন করে ?

এক বুযুর্গ বর্ণনা করেন— আমি এক সফরে এক বৃদ্ধকে দেখতে পেয়ে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, যৌবনের প্রারম্ভে আমি আমার চাচাত বোনের প্রতি খুব আসক্ত ছিলাম। সেও আমাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসত। অবশেষে তার বিবাহ আমার সাথেই সম্পন্ন হলো। বাসর রাতে আমি তাকে বললাম, এসো, এ রাত্রি আমরা শোকর আদায়ে কাটিয়ে দিই। কারণ, আল্লাহ আমাদের মিলন ঘটিয়েছেন। সেমতে আমরা উভয়েই সে রাত নামাযে কাটিয়ে দিলাম। একে অপরের নিকট যাইনি। দ্বিতীয় রাতেও আমরা আগের রাতের মতো কথাবার্তা বললাম এবং সারারাত শোকরগুযারিতে কাটিয়ে দিলাম। এরপর আমার বয়সের আশি বছর পার হয়ে গেছে; কিন্তু আমরা এখনো সেই শোকরগুযারির হালতেই আছি। (আমাদের মিলন হয়নি।) আমি ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বৃদ্ধাকেও জিজ্ঞাসা করলাম। বৃদ্ধা বলল, বাস্তব ঘটনা তাই, যা আমার স্বামী বলেছেন।

এখন লক্ষণীয় যে, যদি আল্লাহ তাদেরকে বিবাহের মাধ্যমে একত্রিত না করতেন এবং তাদের বিচ্ছেদ বিরহে সবর করতে হতো, তবে তাদের সবরকে তাদের এই শোকরের সাথে তুলনা করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে, এই শোকর সবরের চেয়ে উত্তম। মোটকথা, জটিল বিষয়াদির স্বরূপ সবিস্তারে বর্ণনা ছাড়া উদঘাটিত হয় না।

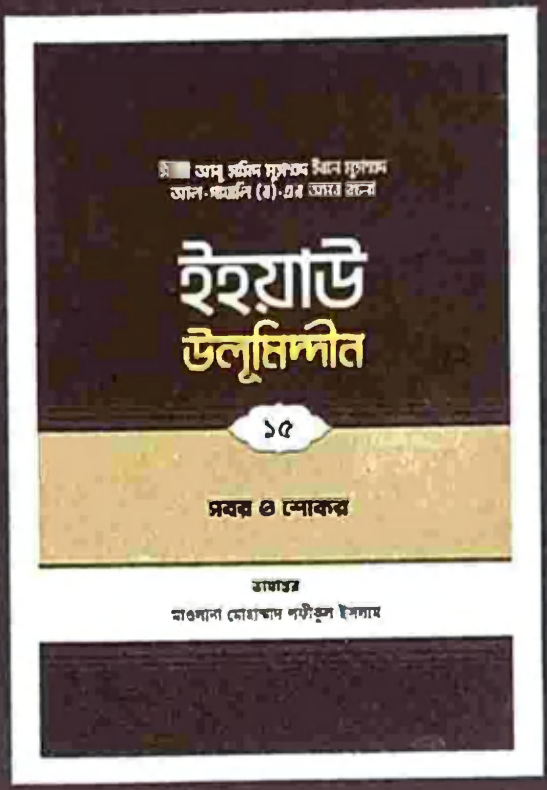

ISBN : 978-984-558-030-4

দারুত তাকবীর

কর্পোরেট অফিস : ৩৩/এ, সাত্তারা সেন্টার (১৪ তলা) ডি আই পি রোড
নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ০৯৬১০৬৬৬০০৬, ০১৯৯১-১৮১২০৪
বিক্রয় : বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মার্কিন যোগাযোগ : ০১৯৩৮-৮৫৫৯৯২, ০১৯৩৮-৮৫৫৯৭৯, ০১৯৩৯-৯১৯৩২১
ই- মেইল : info@daruttakbeer.com

10114012910140200-7939

পরিবেশক : বাংলাবাজার
৩৮/২-খ, তাজমহল মার্কেট (নিচ তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইনে পরিবেশক : BOIBAZAR.com

BOOKS

রকমারি.com